Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 10	Place of Publication: Katyayani Book Stall; No. 203, Cornwallis Street, Calcutta
Collection: Sharmadip Basu	Publisher: Girindrachandra Som
Title: *Prem o Kaam Bigyan*	Year of Publication: *Bhadra*, 1345 B.S. (2nd edition) **1938**
	Size: 18.5 c.m. x 13 c.m.
Author: Nripendrakumar Basu (1898 – 1979)	Condition: Good.
	Remarks: Hard bound copy. Total pages: 208; Title page, content list, full page picture are not included in numbered pages.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

প্রেম ও কাম বিজ্ঞান

শ্রী নৃপেন্দ্র কুমার বসু

শৈলুকাদের বিচার করুন।
হস্তান্তর করা চলিবে না।

শ্রী নৃপেন্দ্রকুমার বসু

প্রেম ও কাম-বিজ্ঞান

[redacted]

'জন্ম-শাসন,' 'নরনারীর যৌনবোধ,' 'দুর্নীতির ইতিহাস,' 'যৌবনের যাদুপুরী',
'History of Prostitution in India' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীমন্মথেন্দ্রকুমার বসু

[redacted]

কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৬, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীগিরীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ
বাণীমালী বুক স্টল
২০৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৪৫

Translation, reproduction & copy rights
reserved by the author.

প্রিণ্টার—শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপক্রমণিকা

বড় বিবাহের গাত্রহরিদ্রার তত্ত্ব বড়, বড় বইয়ের ভূমিকাও বড়। আমার বইখানি নাতিকায়, সুতরাং তদনুপাতে ইহার ভূমিকার কলেবর ক্ষুদ্র করাই বোধহয় সমীচীন হইবে। ইতঃপূর্বে "নরনারী যৌনবোধে"র ভূমিকায় আমাদের দেশে যৌনজ্ঞান বিস্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছিলাম এবং ভূমিকায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, পুরাকালে প্রাসাদে ও পর্ণকুটিরে কামশাস্ত্র কিরূপ শ্রদ্ধার সহিত অধীত হইত; এমন কি, মায়াবাদী মহামতি শঙ্করকেও উভয়ভারতীর চাপে পড়িয়া এই অধুনা-অনাদৃত শাস্ত্রটিকে সযত্নে হাতে-কলমে আয়ত্ব করিতে হইয়াছিল।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তি সম্প্রতি যৌনতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেছেন। আর এক শ্রেণীর লোক যৌনবিদ্যা সংগ্রহের জন্য এত সমুৎসুক ও কৌতূহলী হইয়া পড়িয়াছেন যে, স্বদেশী ও বিদেশী ভাষায় যে সকল গ্রন্থ শুধু পাঠক-পাঠিকার স্থূল কামবৃত্তিকে শাণিত করিবার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য লইয়া প্রকাশিত হইতেছে, সেগুলিও সাগ্রহে টানিয়া পাঠ করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অভ্রান্ত তথ্যসমন্বিত, সুষ্ঠুভাবে লিখিত পুস্তক আমাদের দেশে—বিশেষভাবে বাংলা ভাষায় অতি অল্প সংখ্যকই বাহির হইয়াছে। অধিকাংশ পুস্তকেই দেখি বিজ্ঞানের নামে চির-প্রচলিত লোকমতেরই প্রতিধ্বনি জাগানো রহিয়াছে, আয়ুর্বেদ ও কামসূত্রের কতকগুলি বিসম্বাদিত উপাদানে একটা দুষ্পাচ্য জগা-খিচুড়ি পাকানো হইয়াছে, নচেৎ সুলভ সংস্করণের কোনো চটি ইংরাজী বইয়ের যেন-তেন-প্রকারেন তর্জমা করিয়া দিবার প্রয়াস করা হইয়াছে।

এই সকল ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি যথাসম্ভব এড়াইবার চেষ্টা আমি বরাবরই করিয়া আসিয়াছি, এবং আমার প্রত্যেক পুস্তকেই পাঠকপাঠিকাগণকে যথাসাধ্য নূতনতর তত্ত্ব পরিবেশন করিয়াছি, জগতের প্রাচীন ও অর্বাচীন মনীষীদের মতবাদের মূল তথ্যগুলি গ্রথিত করিয়া দিবার

চেষ্টা করিয়াছি, নিজের ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ও বহুদর্শনলব্ধ জ্ঞানের আভাস দিয়া সমাজের কিছু শিক্ষা ও চিন্তার খোরাক্ যোগাইয়া দিয়াছি। ইহাতে যে কিছু সুফল ফলিয়াছে, তাহার পরিচয় একাধিক প্রণালী হইতে পাই। চিঠিপত্রাদি ও সাক্ষাৎকার হইতে বুঝিতে পারি যে, যে-শ্রেণীর পাঠকপাঠিকা এই উচ্চতর ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানলাভের পক্ষপাতী, তাঁহারা আমাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহের চক্ষে দেখিতেছেন। ইহা আমার পক্ষে ভরসা ও সান্ত্বনার কথা, সন্দেহ নাই। গুণগ্রাহী পাঠকমণ্ডলীকে এজন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

বক্ষ্যমান পুস্তকখানিতে যৌনবিজ্ঞানের ব্যবহারিক মনোবিদ্যার দিক্‌টিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং ফ্রয়েড্ ও তাঁহার চিন্তা-চতুষ্পাঠীর কতকগুলি মৌলিক মতবাদের মোটামুটি আলোচনা করা হইয়াছে। লৌকিক প্রেম ও প্রাকৃত কামের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু, প্রেমের পাত্রপাত্রী নির্বাচনে এত বৈচিত্র্য পাওয়া যায় কেন, কামস্পৃহা দেহের কোথায় জন্মে ও কি করিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়, কিভাবে কামচর্যা করিলে আমরা আশাতিরিক্ত সুখ অর্জন করিতে পারি, দাম্পত্য প্রেম বিফল হয় কেন ও অবিচলিত হয় কিসে, তাহারই যোগ্য ও যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছি এই গ্রন্থখানিতে।

বিষয়টি এত বৃহৎ ও ব্যাপ্তিমান যে, সামান্য পউনে দুইশত পৃষ্ঠার মধ্যে মোটামুটি সকল কথা গুছাইয়া বলা সম্ভবপর নয়। যে-সকল দুস্তোষণীয় পাঠকপাঠিকা ইহাতে 'গরু হারাইলে গরু খুঁজিয়া পাইবার' আশা করিবেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব হইতেই কিন্তু সতর্ক করিয়া দিতে চাই।...যৌনজ্ঞানে যাঁহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং আরো কিছুদূর অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক, এইরূপ দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল পাঠকপাঠিকার জন্যই এই পুস্তকের অবতারণা।

তিন বৎসরাধিক কাল পূর্বে 'কাম ও প্রেম' নাম দিয়া একখানি বিরাট গ্রন্থ খণ্ড-খণ্ডাকারে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম এবং তজ্জন্য কিছুকাল প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া কতক মাল-মশলাও সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে ও কর্ম-বিপাকে সে সঙ্কল্পানুযায়ী কার্যারম্ভের তারিখ আমাকে ক্রমাগত পিছাইয়া দিতে হইতেছিল। অথচ ইতোমধ্যে পাঠকপাঠিকাদের তাগিদে ও উৎকণ্ঠার বিরাম ছিল না। এক্ষণে

একপ্রকার নিশ্চিত হইয়াই ব্যক্ত করিতে পারি যে, আগামী কয় মাসের মধ্যেই 'যৌন-বিশ্বকোষ' অভিধায় আমার বিরাট পরিকল্পনার প্রথম অর্ঘ লোকসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিবে। বর্তমান পুস্তক আমার অসহিষ্ণু পাঠকগণকে আপাতত শান্ত করিবার একটা বাস্তব প্রয়াস বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহা বহু-বিলম্বিত ভোজের অল্পকাল পূর্বে যৎসামান্য জলযোগের মতো আর কি!

নিন্দা-স্তুতি আমি চিরকালই সমভাবে গ্রহণ ও বরণ করি। সত্য-প্রচারের আন্তরিক সাধনার মধ্যেও ভ্রান্তি ও বিচ্যুতির কলঙ্ক লুকাইয়া থাকা আশ্চর্য নয়। তাহা দেখাইয়া দিলে, আমি লজ্জিত হইতে পারি, রুষ্ট হই না। আমার ব্রত সকলের নিকট প্রিয় না হইতে পারে, কিন্তু উহা যেমন কৃচ্ছসাধ্য, তেমনি বহুবিঘ্নমণ্ডিত ও বিপুল। যৌনজীবনের নানারূপ তথ্য, সংবাদ ও দৃষ্টান্তাদির বিষয় লিখিয়া অনুকম্পাশীল পাঠকপাঠিকা আমার এই দুরূহ কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। নিষেধ থাকিলে, আমি সাহায্যকারীর নাম ধাম প্রকাশ করি না। গোপনীয় পত্রে আমার স্ত্রীরও উঁকি মারিবার অধিকার নাই।

পরিশেষে পাঠকপাঠিকার নিকট সবিনয় অনুরোধ, যাঁহারা কোন একটী যৌনপ্রশ্ন করিয়া, আমার নিকট হইতে উহার সদুত্তর প্রত্যাশা করিয়া চিঠি লিখিবেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া প্রতি প্রশ্নের জন্য ॥০ হিসাবে ডাকটিকিট পাঠান্। পরামর্শপ্রার্থী সাক্ষাৎকারীর নিকট হইতেও যৎসামান্য দক্ষিণা লইতে সম্প্রতি বাধ্য হইতেছি,—উপায় নাই। অলমতিবিস্তারেন। ইতি।

৯, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা, মাঘী সংক্রান্তি, ১৩৪৪ সাল।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

১। **প্রেম সর্বশক্তিশালী**

প্রেমের প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত, প্রেমের সৃষ্টি-বিকীরণ, প্রেমের প্রভাব ও ধ্বংসশক্তি, নারীর প্রেম ... ... ১—৯

২। **প্রেমে ও কামে পার্থক্য**

কাম ও ঈশ্বরপ্রীতি, পার্থিব ও ভগবৎ প্রেমে মৌলিক সাদৃশ্য, কাম ও কান্তপ্রেম ... ... ১০—১৮

৩। **প্রেমের প্রকৃতি ও বিকাশ-ধারা**

বাল্যপ্রেমের প্রকৃতি, বাল্যপ্রেমের দুরন্ত স্মৃতি, কৈশোরে প্রেমের ধারা, যৌবনে প্রেমের লক্ষণ, গতি ও রীতি, প্রেমিকের স্বভাব, প্রেমে মাদকতা, প্রেমের আদর্শ ও হিন্দুবিবাহ, আধুনিক হিন্দু বিবাহের বৈশিষ্ট্য, বিবাহ কি মানুষকে চিরতৃপ্তিদান করে, প্রেমামৃতে অবসাদ ও অরুচি, প্রেমে অনন্যপ্রাণতা ও আজীবন বীতস্পৃহা, আশৈশব স্থির প্রেমিক, সংশয়ী ও অসিদ্ধ প্রেমিক, প্রেমের আসল ধর্ম ও লক্ষ্য ১৯—৪১

৪। **প্রেম-নিয়ামক যন্ত্রাবলী**

মস্তিষ্ক ও অনুমস্তিষ্ক, গার্হস্থ্য প্রবৃত্তিনিচয়, নাড়ী ও তাহার কার্যাবলী, সুষুম্নারজ্জু ও কামোদ্দীপক কেন্দ্র, অন্তঃস্রাবী ও বহিঃস্রাবী গ্রন্থিনিচয়, অবটুগ্রন্থি, পার্থতীর্থক গ্রন্থি, অধিবৃক্কীয় গ্রন্থিদ্বয়, যৌনগ্রন্থিদ্বয় ৪২—৫৭

৫। **প্রেমের আদ্য আদর্শ ও পরিণতি**

নির্জ্জাত মন, অন্তর্জ্জাত মন, সংজ্ঞাত মন, শিশুর মন, পুত্রকন্যার একদেশদর্শী আদ্য প্রেম, শিশুর ভেদবুদ্ধিহীন ভালবাসা, বাহ্যজগতের প্রভাব, শৈশবানুবন্ধ, স-বাবুর উদাহরণ, বিবাহিতা কন্যাদের পিতৃ-অনুরাগ, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা কি বিশ্বস্তা হয়? ... ৫৮—৭৮

৬। **পুংস্ত্ব ও স্ত্রীত্ব, সাদন ও মর্ষণকাম**

পুরুষ ও নারীতত্ত্বের সংমিশ্রণ, উভলিঙ্গ বা স্ত্রীপুংস, স্ত্রীত্বপ্রধান পুরুষ, কবি ক্লাইস্টের শোচনীয় পরিণাম, স্ত্রীভাবশালী পুরুষের আচার-ব্যবহার, দস্যি বা গেছো মেয়ে, পুরুষভাবাপন্ন নারীর আচার ও অভ্যাস, সাদনকামিতা ও মর্ষণকামিতা, মর্ষণকামী নারী, প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর উভকামী, প্রকৃতির অভিপ্রায়, উগ্র মর্ষণকামিতার দৃষ্টান্ত, উগ্র সাদন ও মর্ষণকামের উদাহরণ ... ... ৭৯—৯৬

৭। **রুচি-বৈচিত্র্যের নিদানতত্ত্ব**

দ্বিমেরুত্ব বিধি, প্রেম ও ঘৃণা—একই পত্রের এ পিঠ আর ও পিঠ, অত্যন্তের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত, নিম্নগ প্রেম, আত্মকাহিনী, ধনীকন্যাদের রুচি-বিকার, দৃষ্টান্ত, মোটর ড্রাইভারের প্রতি আসক্তির কারণ, পতিতার প্রতি উৎকট প্রেম-প্রবণতা, অভিজ্ঞ-প্রেমিক-প্রিয়া নারী ৯৭—১১৭

৮। **বহুরূপী প্রেমের অন্তরোদ্‌ঘাটন**

ব্রহ্মচারী ও চিরকুমারীর মনস্তত্ত্ব, প্রেমের উদ্গতি, শৈশব সংসক্তির স্বপ্নভঙ্গ, নারীর প্রেমে সংবৃত প্রভুত্ব স্পৃহা, দৃষ্টান্ত, দূরত প্রেমের প্রকারভেদ ... ... ১১৮—১২৮

৯। **পুং ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের পরিচয়**

অণ্ডকোষ ও মুষ্ক, শুক্রাণুনালিকা, শুক্রের উপাদান, শুক্রবাহী নালীদ্বয়—শুক্রকুল্যা ও শুক্রপ্রবা, মূত্র-স্থালী ও শুক্রাধার, পৌরুষগ্রন্থি, শুক্রের গতি ও ক্ষরণ, শিশ্ন ও তাহার অংশসমূহ, অগ্রচ্ছদাহীনতার সুবিধা-অসুবিধা, স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়, ভগাধর গুরু ও লঘু, ভগাঙ্কুর, যোনি-দ্বার ও সতীচ্ছদ, স্যন্দনী গ্রন্থিনিচয়, যোনিনালী, জরায়ু বা গর্ভাশয়, গর্ভদেহ, গর্ভগ্রীবা ও গর্ভমুখ, বিসৃষ্টি রস, অণ্ডানুপ্রবা, অণ্ডাশয় ও অণ্ডাণু, শুক্রকীট, অণ্ডাণু ও ঋতুস্রাব, গর্ভাধান-পদ্ধতি···১২৯—১৪৯

১০। বিবাহ ও প্রেমের উৎকর্ষ

মনুষ্যেতর প্রাণীর নিস্প্রেম কামবৃত্তি, আদিম যুগে বিবাহের সূত্রপাত, বিবাহের ক্রমবিকাশ, বিবাহ-নিয়ন্ত্রণে পিতামাতার হাত, আগে প্রেম পরে বিবাহ, বিবাহ-বন্ধনে বিরাগ কেন, বিবাহ-জীবনে বৈচিত্র্যপ্রিয়তা ও অবিশ্বস্ততা, বিবাহের কয়েকটি সুফল, বিবাহ-জীবনে কিভাবে প্রেম অটুট্ থাকে, পরস্পরকে জানা ও বুঝার অভাব, ত্যাগশীলতা, সহিষ্ণুতা ও প্রশ্রয়-গুণের অভাব বা অতিরিক্ততা, পরস্পরের সাহচর্যের অভাব, দৃষ্টান্ত, একের উপর অন্যের আধিপত্যের প্রয়াস, শ্রদ্ধা, কর্মিষ্ঠতা, বিশ্বাস, উদারতা, মিতব্যয়িতা, বুদ্ধিকৌশল ও রোমান্সের অভাব···১৫০—১৭২

১১। যৌনসম্মিলন

রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাস, নরনারীর নিকট রতিক্রিয়ার বিশিষ্ট মূল্য, যৌবন-প্রেমের প্রথম উদ্দিষ্ট, যৌন-পূজার প্রথম অঞ্জলি, সুপ্রতিষ্ঠিত প্রেমে আসঙ্গলিপ্সা, রমণ-ক্ষমতা ও সন্তান-জনন, কাম-পরায়ণ বেশি কে—স্ত্রী না পুরুষ, রমণীর কামকেন্দ্রের ব্যাপকতা, আদ্যক্রম—পূর্বরাগ, চুম্বনের স্থান, মধ্যক্রম—রত্যারম্ভ, সহবাসে অঙ্গ-বিন্যাসের বিভিন্ন মুদ্রা, রমণী কি নিষ্ক্রিয়, মূক অংশীদার, অকাল-স্খলন ও নিস্খলন, অন্তক্রম—রত্যবসান, কতবার ও কতদিন অন্তর, নিতুই-নব নিরবসন্ন দাম্পত্য প্রেম, প্রেম কখন্ হয় সার্থক ও সংসিদ্ধ ··· ··· ··· ১৭৩—১৯২

প্রেম ও কাম-বিজ্ঞান

═প্রথম পটল═

প্রেম সর্বশক্তিশালী

জ্ঞানোন্মেষের উষাকাল হইতে মানুষ প্রেমের স্বরূপ নির্ধারণ করিবার—তাহাকে চুল চিরিয়া বিশ্লেষণ করিবার কত না চেষ্টাই করিতেছে। শিল্পী, কবি ও দার্শনিক তাহাকে আপন-আপন বুদ্ধিবৃত্তি, অন্তর্দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধি করিয়া বিভিন্ন বর্ণ-সুষমায় আজো চিত্রিত করিতেছেন। তবুও প্রেম আবহমানকাল মানব-মনের তেমনি শাশ্বত প্রহেলিকা হইয়া রহিয়াছে। সীমাহীন সমুদ্রের মতোই উহা অনন্তকাল ধরিয়া মানব-জ্ঞানের পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। উপনিষদের ভূমা-পরিকল্পনার মতোই প্রেম সম্বন্ধে বলিতে হয়—'যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'···জগতে এত বড় প্রেমিক এখনো কেহ জন্মান নাই, যিনি প্রেমের সম্পূর্ণ রূপ ধরিতে পারিয়াছেন,—উহার অভাবনীয় গতি, প্রকৃতি, প্রারম্ভ ও পরিণতির নিদান নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন। প্রেমকে সম্বোধন করিয়া, বিদ্যাপতির সুরে গলা ভিড়াইয়া গাহিতে ইচ্ছা হয়—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত
সাগর-লহরী সমানা।

প্রেম না-করে কী?—প্রেম বালকের প্রাণকে ক্রীড়া-চঞ্চল করিয়া রাখে, কিশোরকে সম্মোহিনী আশার উষা-রাগে নবশ্রীমণ্ডিত করিয়া দেয়, যুবককে কস্তুরী-মৃগ সম উদ্দাম গতি-চাঞ্চল্যে আত্মহারা করিয়া তুলে, প্রৌঢ়কে শুভ কর্ম-প্রেরণার শঙ্খ-নিনাদে অভিনন্দিত করে, বৃদ্ধকে সুখ-স্মৃতি জড়ানো অভিরাম ধ্যানলোকের অন্তরে পৌছাইয়া দেয়। প্রেম—কৃষককে অম্লানবদনে রৌদ্র-বৃষ্টি-করকার রুদ্র উৎপাত সহিবার প্রবৃত্তি দেয়, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের বাহুতে অফুরন্ত শক্তি—বপুতে দুর্জয় সাহসের উৎস-মুখ উন্মুক্ত করে, মস্তিষ্কে অচিন্তিতপূর্ব চিন্তা-প্রণালীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বৈজ্ঞানিককে নব নব উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া যায়!

প্রেমের প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন—এই চারিটি মানুষের সহজ বৃত্তি; অর্থাৎ এই চারি প্রকারের সংস্কার-বীজ সঙ্গে লইয়াই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। এই বীজগুলিই মানুষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হইয়া পত্রপুষ্পান্বিত সমুন্নত বৃক্ষে পরিণত হয়। আহার ও নিদ্রার প্রয়োজন মানুষের আত্মস্থিতির জন্য; ভয় দেয় মানুষকে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি; এবং মৈথুনের সার্থকতা মানুষের আত্মবিস্তার ও আত্মস্ফূর্তির জন্য। লৌকিক বা শরীরনিষ্ঠ প্রেমের আকর্ষণই ওই মৈথুনের জন্য এবং উহার চরম ও পরম উদ্দেশ্যই হইল মানবতার অমরত্ব। সুতরাং জীবনের একটা শুভসন্ধিক্ষণে প্রেমে পড়া ও মৈথুনের জন্য লালায়িত হওয়া মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে—গর্হিতও নহে।

আহার ও নিদ্রায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া অষ্টম হেন্‌রি, পঞ্চম চার্লস, আধমণি কৈলাস, পৌরাণিক কুম্ভকর্ণ, ভীম ও বকাসুর মানুষের

মানস-দরবারে যে আসন লাভ করিয়াছেন, রাজা সোলোমন পঞ্চদশ শত রমণীকে অঙ্কশায়িনী করিয়া ও ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শ শত গোপনারীর হৃদয় হরণ করিয়া তাহাদের চেয়ে উচ্চতর আসন লাভ করিয়াছেন। জুলিয়াস্ সীজার, অ্যাটিলা হুন্, আলেকজান্দার, চেঙ্গিস্ খাঁ, কুবলয় খাঁ, সার্লেমেন্, সমুদ্রগুপ্ত, রাজা শশাঙ্ক, সিংহহৃদয় রিচার্ড, ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্, উইল্‌হেল্‌ম কাইজার, লর্ড্ কিচেনার, লর্ড্ রবার্ট্‌স্, লর্ড নেলশন্, ফন্ হিণ্ডেনবুর্গ, জেনারেল্ লুডেন্‌ডর্ফ্ প্রভৃতি ইতিহাস-বিশ্রুত বীরগণও প্রেমের দুর্বার শক্তির নিকট মাথা নত করিয়া গিয়াছেন। অতীতের বা সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে করিতে একটা সত্য বারবার আমাদের মনে আঘাত করে যে, রাষ্ট্রশাসনে, শিল্পে, কাব্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে বা কোনরূপ অলৌকিক মনীষায় যাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ আহরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই জীবনের অধিকাংশ সময় প্রেম সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন, একান্ত উদারমতাবলম্বী ও অতিরিক্ত আগ্রহশীল ছিলেন।

প্রেমের সৃষ্টি-বিকীরণ

উত্তর হইতে দক্ষিণে, পূর্ব হইতে পশ্চিমে, হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুর হইতে মুসলমানের হারেমে, আশ্রমের শান্তিকুঞ্জ হইতে সংসারের কলকাকলি-ভরা কুটিরে, হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে প্যালেস্টাইনের জলা-ভূমিতে, অকরুণ কারখানা হইতে বন্দীশালায়, বিলাস-ঐশ্বর্যের সর্ব উপাদানময় ধনীর শয়ন-মন্দির হইতে সৈন্য-শিবিরের কঠিন শয্যায়, পক্কতমকেশ অতীত হইতে হরিততম-প্রাণ বর্তমানকাল পর্যন্ত, সর্বযুগের বর্বরতা ও সভ্যতার মর্মকোষে, দ্বীপে ও হ্রদে, শহরে ও

সাহারায়—যেখানে যান্ না কেন, যেদিকে দৃষ্টিপাত করুন না কেন, সেখানেই নর-নারীর আসক্তিমণ্ডিত বিচিত্র প্রেমের খেলা দেখিতে পাইবেন। অবিস্মরণীয় সমস্ত কীর্তি, মহৎ কর্ম-প্রচেষ্টা, মৌলিক গবেষণা ও চিন্তাধারার মূলে, নরের প্রতি নারীর—নারীর প্রতি নরের আকর্ষণ, আকুলতা ও আত্মনিবেদনের অজস্র গাথা বিজড়িত!

নিখিল বিশ্বের ইতিহাস—প্রধানত প্রেমেরই জন্ম, পরিণতি ও উত্থান-পতন দিয়া গঠিত। প্রেম—কাব্য, সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানের জন্ম দিয়াছে। জগতের যাহা কিছু শ্রেয় ও প্রেয়, সমুচ্চ ও সুন্দর, তাহারই অন্তরালে উহার অমোঘ হস্ত লুকাইয়া রহিয়াছে। সংসারের হাসি-কান্নার ছন্দ, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব, সাম্যের মাঝে দ্বন্দ্ব—প্রেমেরই সার্থকতা ও ব্যর্থতা দিয়া তৈয়ারি। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের সহস্র প্রাতিভাসিক বিকাশ—গতিভঙ্গিময় প্রেমেরই সূত্রহীন সুচারু মালা।

সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে ইহা মানুষের ভাগ্য-বিধাতা। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকগণ অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন—যৌনাবেগ কেমন করিয়া শিল্পী, ভাস্কর, চিত্রকর, দার্শনিক, কবি, সন্ন্যাসী, বক্তা ও সাহিত্যিক গঠন করে, কেমন করিয়া প্রেম-জীবনের অভিব্যক্তি তাহাদের কল্পনার পট-ভূমিকাকে রঙীন্ করিয়া তুলে—তাহাদের সৃজন-প্রতিভাকে এক-একটা অপ্রাকৃত প্রণালীতে পরিচালিত করে। অ্যারিস্টোফ্যানিস্, থিওক্রিটাস্, ওভিড্, ভার্জিল, বোক্যাকৃশিও, রেবেলিয়াস্, গেটে, কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, দেবেন সেন, দীনবন্ধু, গিরিশ, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, ব্রান্তোম্, রুশো, ভল্‌তেয়ার, মিরাবো, সেক্সপীয়র, বায়রন্, শেলী, ব্রাউনিং, মোলিয়ের, শীলার, ওয়ার্ড্‌স্‌ওআর্থ, সুইন্‌বার্ণ, ইয়েট্‌স্,

ইব্‌সেন, বানার্ড্ শ, গল্‌স্‌ওয়ার্দি, টমাস্ ম্যান্ প্রভৃতি শত শত মনীষীর জীবনচরিত অধ্যয়ন করিয়া দেখুন—প্রেম তাঁহাদের সত্তাকে লীলা-কেন্দ্র করিয়া, বিশ্ব-সাহিত্যে কি অমর অবদান দান করিয়াছে!

প্রেমের প্রভাব ও ধ্বংসশক্তি

প্রেম শুধু একের জীবনকে আশ্রয় করিয়া, স্বতন্ত্রভাবে স্ফূর্তিলাভ করে না; আশে-পাশে সকলকে অল্প-বিস্তর তাহার প্রভাব জানাইয়া দেয়,—যেন এক বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় শত পথিকের শ্রান্তি দূর হয়। সুপরিচালিত প্রেমের অমোঘ শান্তিধারায় সমগ্র পরিবার অভিষিক্ত হইয়া তৃপ্ত হয়; হয়তো সমাজের একটা দীর্ঘস্থায়ী বেদনার উপশম হয়। দুইটি প্রাণীর যুক্ত প্রেমের হোমশিখায় হয়তো মানবের মুক্তির মন্ত্র সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

প্রেমের জন্য অতুল বৈভব, পৃথিবীব্যাপী প্রতিপত্তি, এমন কি দিগ্‌দিগন্তব্যাপী সাম্রাজ্য ধূলিমুষ্টির ন্যায় পরিত্যাগ করার দৃষ্টান্ত খুঁজিতে ইতিহাসের পাতা উল্‌টাইবার প্রয়োজন হইবে না,—একবার মিসেস্ সিম্প্‌সনের প্রেম-পূজারী সম্রাট্ অষ্টম এডোআর্ডের মহান্ স্বার্থত্যাগের কথাটা ভাবিয়া দেখুন। এই তো সেদিন ইজিপ্টের অষ্টাদশ বর্ষীয় রাজা ফারুক্, তাঁহার বাগ্‌দত্তা পত্নীকে বিবাহ করিবার পথে মন্ত্রীমণ্ডলী কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিলে, সিংহাসন পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে মাদাস্ লুপেস্‌কুর পরকীয়া রসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া, রুমানিয়ার তদানীন্তন যুবরাজ প্রিন্স্ ক্যারল্ সিংহাসনের উত্তরাধিকারীত্বের দাবি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন!...

আবার বাঁধনহারা সংযমশূন্য যৌনপ্রবৃত্তির তরঙ্গোচ্ছ্বাস শুধু একটা পরিবারকে গ্রাস করে না, সময় সময় পল্লীকে পল্লী, শহরকে শহর, দেশকে দেশ ভাসাইয়া দিয়া যায়; একের অবিমৃষ্য প্রেমের মোহে একটা জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়—ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়। জগতের ইতিহাসে যাহার অতি সামান্য জ্ঞান আছে, সে-ও ইহার অন্তত একশত দৃষ্টান্ত স্মৃতিপথে আনয়ন করিতে পারিবে। হিন্দু পুরাণে যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনি একবার রামায়ণ ও মহাভারতের মূল বিষয়-বস্তুটার কথা ভাবিয়া দেখুন। জয়চাঁদ-কন্যা সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজের কাহিনী, পদ্মিনী ও আলাউদ্দিনের শোচনীয় পরিণাম ভারতের শিশুপাঠ্য ইতিহাস আজও সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। এই বিংশ শতাব্দীতেই ইন্দোর-রাজ তুকাজী রাও হোলকার, মমতাজ নাম্নী একটা মুসলমান বাইজীর কলুষিত প্রেমের জন্য রাজ্যপাট্ হারাইয়াছেন।

যৌনক্ষুধা-সর্বস্ব চিরলোলুপ প্রেমের ধ্বংসকর প্রভাবের আরো দৃষ্টান্ত চান্? কেন, সেই বাইবেলোক্ত ইভ্ ও লিলিথ্ হইতে লাবণ্যলব্ধামভূতা হেলেন-অপহরণ-ঘটিত ত্রোজান্ যুদ্ধ পর্যন্ত উপকথা-নিষিক্ত ইতিহাসের পাতাগুলি একবার উল্টাইয়া যান্ না—দেখিবেন, উদাহরণের ঘন অরণ্যানী পড়িয়া রহিয়াছে। ইতিবৃত্তের মেধাবী পাঠক, একবার চিত্ত-বৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া সেমিরামিসের সময় হইতে সুরু করিয়া কোল্যাটিনের অঙ্কলক্ষ্মী লুক্র্যাসিয়ার সময় পর্যন্ত ইতিহাসের সুদীর্ঘ বারাসত ভ্রমণ করিয়া আসুন্। স্যাফো হইতে ফিদ্রাস, ম্যাগদালা-নিবাসিনী জুডিথ্ হইতে মেরী ম্যাগ্‌ডেলেন্, উষ্ণপ্রস্রবণ স্বরূপিনী মেসালিনা হইতে অতৃপ্ত রূপসী ফ্রেডিগোণ্ডা, প্রেমের রণচণ্ডী বার্গাণ্ডির মার্গারিট্ হইতে শোণিত-সোহাগিনী লুক্র্যাসিয়া বর্জিয়া, পোয়াতিয়ের

ডায়না হইতে হতভাগিনী মেরি স্টুয়ার্ট্, প্রেমতপস্বিনী মাদাম্ দ্য মাইতন্ হইতে কুলটা-শিরোমণি রাশিয়া-সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন্ পর্যন্ত সহস্রদীপ-সমন্বিত প্রেম-পুরাবৃত্তের রাজপথ ধরিয়া চলিয়া আসুন্ দেখি। কি দেখিলেন বলুন তো?—শুধু তপ্ত রক্ত আর স্কন্ধচ্যুত মুণ্ড!

নারীর প্রেম

প্রত্যেক সৃষ্টি-ইচ্ছার মূলে ওতপ্রোত নারীর প্রেম। তাই হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তির কারণ মহামায়া বা আদ্যাশক্তি বলিয়া পরি-কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। নারীর প্রেম একদিকে সৃষ্টি করে—পালন করে, অন্যদিকে আবার ধ্বংস করে; উঠায়, নামায়, কোমল করে, কাঠিন্য দান করে; আলেয়ার ছলনায় আমাদিগকে দিশেহারা করিয়া দেয়, আবার আলো ধরিয়া তামিস্রাময় জীবনকে সুগম পথে পরিচালিত করে; বুকে ভরসা ও সাহস জাগায়, মনে দুরভিসন্ধি ও দুষ্কৃতির বহ্নিশিখা জ্বালায়। রমণীর ভালবাসা স্বচ্ছ সরিতের স্নিগ্ধ পানীয়ে অঞ্জলি ভরিয়া দেয়, আবার ভয়াবহ বন্যার ফেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে শান্তির নীড় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। ক্ষেত্র ও পাত্র বিশেষে, শিক্ষা, কুলগুণ (heredity) ও আবেষ্টনীর প্রভাবে নারীর প্রেম কখনো রূপ ধরে স্বেচ্ছাচারী রাজার, কখনো বা দীনতম প্রজার; কখনো হানে দারুণ শক্তিশেল, কখনো দানে মৃত-সঞ্জীবনী সুধা; কখনো সে বরভয়করা দুর্গা, কখনো নৃমুণ্ডমালিনী শ্মশানবাসিনী শ্যামা!

রূপের সহস্র বর্তিকা জ্বালাইয়া, বিম্বাধরে মায়া-চাপ বিস্ফার করিয়া, অন্তরের গোপন কন্দরে প্রভুত্বের প্রচ্ছন্ন কামনা পোষণ করিয়া, জীবনের

যাদুকরী নারী—পুরুষকে প্রতিনিয়ত আপন যৌবন-জলোচ্ছলিত চির-রহস্যভরা দেহ-তটের দিকে আমন্ত্রণ করিতেছে। আবার সে আত্ম-নিবেদনের গায়ত্রীমন্ত্র বুকে ধরিয়া, তৃপ্তি-দানে তৃপ্তিলাভ করাকেই জীবনের ব্রত করিয়া, পুরুষের চরণধূলার তলে মাথা নত করিতেছে,—তাহার বিপদে অভয়, সুখে স্বস্তি ও শোকে সান্ত্বনা দিয়া স্বর্গের কল্পনাকে মর্ত্যে সমূর্ত করিয়া তুলিতেছে।

নারী-প্রেমের মহিমা অনন্ত, গতি-ভঙ্গিমা বিচিত্র, পরিণতি অসাধারণ। আজ সে মেনকার বেশে বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করিতেছে, মাদাম্ দ্য বারির সকাশে পঞ্চদশ লুইকে আজ্ঞাবহ ভৃত্য বানাইতেছে, নাগরিকা অ্যাস্পাসিয়ার রূপের মদিরায় গ্রীসের ভাগ্যবিধাতা পেরিক্লিসকে মশ্‌গুল করিয়া রাখিতেছে; আবার কাল সে বেহুলাকে মৃতস্বামীর পাণ্ডুর দেহখানি বুকে করিয়া দেবতার বর মাগিতে অকুলে ভেলা ভাসাইতে শিখাইতেছে; রাজকন্যা সোনামণিকে জাতিশত্রু ঈশা খাঁর পদতলে আত্মবিক্রয় করিতে উদ্দীপিত করিতেছে, সম্রাজ্ঞী এলিজাকে র‍্যালের তর্জনী-হেলনে উঠাইতেছে-বসাইতেছে। আজ সে শতভোগ্যা ক্লিওপেট্রাকে উপলক্ষ করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য অ্যাণ্টনিয়স্ কর্তৃক হেলায় হারাইতে দিতেছে, কাল সে অ্যাগনেস্ সোরেল্‌কে দিয়া কাপুরুষ সপ্তম চার্লসের হৃদয়-কন্দরে নবীন আশার সঞ্চার করাইয়া ফ্রান্সের মুখ রক্ষা করিতেছে।

কখনো প্রেম ন্যাভার-নিবাসিনী মার্গারিটের সত্ত্বা সমাশ্রয় করিয়া রাষ্ট্রিক ও সামাজিক চিন্তাধারায় নবযুগের ('রেনাসাঁস্') প্রবর্তন করিতেছে; কখনো বা চতুর্দশ চার্লসের প্রেমপুত্তলী মাদাম্ দ্য পম্প্যাডুরের শরণ লইয়া, রাজরোষ হইতে স্বাধীন চিন্তাশীল দার্শনিক, সাহিত্যিক ও সংস্কারকদিগকে রক্ষা করিতেছে এবং সকলের

অজ্ঞাতসারে ফরাসী-বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। আজ সে মেহেরউন্নিসাকে শের আফগানের ভূতপূর্বা পত্নী-রূপে বুক-ফাটা শোকের দীর্ঘশ্বাসে ম্রিয়মান করিতেছে, কাল তাহাকেই আবার নূরজাহানরূপে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের প্রধানা বেগম করিয়া বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের দণ্ড-মণ্ডের কর্ত্রী করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে।

কি কর্ম-জগতে, কি চিন্তা-জগতে, কি সন্ধিতে, কি বিগ্রহে, কি কলায়, কি বিজ্ঞানে, নারীর প্রেম আবহমানকাল মানুষকে শক্তি, প্রেরণা ও উদ্দীপনা দিয়াছে; নিজেকে নিরালে রাখিয়া অকাতরে তাহাকে পুষ্টি ও তুষ্টি, মহত্ত্ব ও অমৃতত্ব বাঁটিয়া দিয়াছে। কান্তা-প্রেম তখনই কীর্তি-গরিমাময় শুভ পরিণতি লাভ করিয়াছে, যখনই তাহা মানুষের কর্মেন্দ্রিয় হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ে গিয়া, জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে মস্তিষ্কের সর্ব কেন্দ্র তাহার অমোঘ রসে অভিনিষিক্ত করিয়া, একটা বিশিষ্ট সৃষ্টি-প্রতিভাকে নাড়া দিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছে। হেলোইসী ও অ্যাবেলার্ড্, ফর্ণারিনা ও রাফেল্, মোনালিসা ও লিওনার্দো দ্য ভিন্সি—এই শ্রেণীর প্রেমের আস্বাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। বিয়েত্রিস্ নরকের গাঢ় অন্ধকারে উদ্‌ভ্রান্ত দান্তের হাত ধরিয়া স্বর্গের আলোকসমারোহময় তোরণদ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া, "ডিভাইন্ কমেডি'-র সোপান সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। পেট্রার্কের লরা, ট্যাসোর এলিয়নোরা, জাঁ জ্যাক্ রুশোর মাদাম্ দ্য ওয়ারেন্স, লামার্টিনের গ্রাৎসিয়েলা, গেটের ফ্রাউ ফন্ স্টাইন্, চণ্ডীদাসের রজকিনী রামী, বিদ্যাপতির রাণী লছমী, জয়দেবের পদ্মাবতী এক কালে প্রেমিকদিগকে কাব্য ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে অক্ষয় কৃতিত্ব-লাভের অনুপ্রাণনা দান করিয়াছিল।...

==দ্বিতীয় পটল==

প্রেমে ও কামে পার্থক্য

কিন্তু এতক্ষণ ধরিয়া যে প্রেমের জয়গান করিলাম, তাহা শুনিয়া কোনো পাঠক-পাঠিকা হয়তো বলিবেন—'এতো নিছক্ যৌনাসক্তির—তথা কামেরই স্তুতিবাদ করা হইল!'…কিন্তু তাই কি? লৌকিক অর্থে কাম আর প্রেমের একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নয় কি? কামের সূক্ষ্ম অর্থ করিতে হইলে বলিতে হয়—'কোন বিষয় বা বস্তুতে ভোগের অভিলাষ।' উহার আবার একটা স্থূল অর্থ করা হয়—'কোনো স্ত্রী বা পুরুষকে কায়িকভাবে ভোগ করিবার ইচ্ছা।' সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কামের মধ্যে, যে-ভাবেই হউক, একটা ভোগের ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রেমের মধ্যেও ভোগেচ্ছার অন্ত নাই—অভাব নাই। তবে যে ভোগেচ্ছার মধ্যে দেহ, মন ও আত্মা তিনটিই সমভাবে নিয়োজিত হয়—যে তৃষ্ণাকে মিটাইতে হইলে, কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সহিত সদ্বুদ্ধি বা বিবেকের সাহচর্য অনিবার্য,—যদি তাহাকেই প্রেম নামে অভিহিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে বরং বিশেষ আপত্তি না করিয়া আপনাদের কথাই মানিয়া লইব।

কিন্তু যদি চণ্ডীদাসের মতো ভাবগম্ভীর স্বরে মাথা নাড়িয়া বলেন, "রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়", অর্থাৎ ভোগ-লিপ্সা-বিহীন প্রেমই 'প্রেম' আর বাকি সব 'কাম,' তাহা হইলে আমি অবশ্যই

সত্য তথ্যের খাতিরে ঘোরতর প্রতিবাদের নির্ঘোষ তুলিব। আমি বলিব ও বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, নিষ্কাম প্রেম বলিয়া জগতে কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যদি বা জগতে সোনার পাথর বাটী, কাঁঠালের আমসত্ব অথবা ডুমুরের ফুল দেখা সম্ভব হয়, তথাপি কামগন্ধশূন্য প্রেমের দর্শন পাওয়া একান্ত দুষ্কর।

তদুপরি আমাকে জোর গলায় বলিতে হইবে যে, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম অর্থে কামকে কেহ এ জীবনে এড়াইয়া যাইতে পারে না, এবং উহা 'প্রেম' নামে অভিহিত না হইলেও স্থান-কাল-পাত্র-পরিমাণ-বিশেষে মানুষের মঙ্গল-বিধায়ক। এইবার একটা বিশ্বাসযোগ্য নজির আপনাদের নয়ন-সম্মুখে তুলিয়া ধরি। একবার মহাভারতের বনপর্বে অর্জুনাভিগমন পর্বাধ্যায়ের ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়টী পড়িয়া দেখুন।…"হে মহারাজ! পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মনঃ ও হৃদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ করে, তাহারই নাম কাম। উহা ধর্মের এক উৎকৃষ্ট ফল।'…

কাম ও ঈশ্বরপ্রীতি

একটু বিচার-বুদ্ধি-প্রবণ ও দার্শনিকের কল্পনা-পরিশূন্য হইয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বুদ্ধ হইতে বিবেকানন্দ, কন্‌ফুসিয়াস্ হইতে কেশবচন্দ্র কেহই নিষ্কাম সাধক ছিলেন না। তাঁহাদের ধর্মের ভিতরও কাম অর্থাৎ ভোগেচ্ছা লুক্কায়িত ছিল। যে-কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তু বা বিষয়ভোগের আনন্দ হইতে তাঁহারা মুক্ত থাকিতে পারিয়াছিলেন কি? তাঁহাদের কাম স্থূল হইতে সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষ অনুভূতির রাজ্যে চলিয়া

গিয়াছিল, ধীরে ধীরে স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল,—এই কথা বলা বোধ হয় অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী-সৃষ্টির সময় হইতে 'কৃষ্ণপ্রীতি ইচ্ছা' বা ভগবানকে ভালবাসার নামই 'প্রেম' এবং 'আত্মপ্রীতি-ইচ্ছা' বা মানুষকে স্বার্থের খাতিরে ভালবাসার নামই 'কাম' রাখা হইয়াছে। কিন্তু প্রেম যত উচ্চ ও লোকাতীত হউক না কেন, তাহা কি স্বার্থশূন্য হইতে পারে? ভগবানকেই ভালবাসি আর মানুষকেই ভালবাসি,—সে তো আমার নিজের স্বার্থের জন্য, আত্মতৃপ্তির জন্য। আমাদের প্রেমাস্পদ যিনি হউন্ না কেন, তিনি আমাদের সুখ-ভোগের কেন্দ্র; অন্ততপক্ষে আমাদের আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক স্বার্থও সে প্রেমের সহিত ষোলো আনা বিজড়িত। নয় কি?

পার্থিব অথবা স্বর্গীয় প্রেমে স্বার্থপরতার হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু রাহিত্য হইতে পারে না। লোকাতীত প্রেমাস্পদকে যতটুকু দিই—তাহার জন্য যাহা কিছু স্বার্থত্যাগ করি, তাহার বিনিময়ে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর আর একটা কিছু লাভ করিতে চাই। হয়তো সেটা জয়, নয় যশ, নয় নিছক্ আত্মপ্রসাদ। একদিক দিয়া ত্যাগ করি, আর এক দিক দিয়া অর্জন করি—ভোগ করি। ষাঁড়ের গায়ে কম্বল চড়াই—গুরুর নামে ধর্মশালা তৈয়ারি করিয়া দিই, আবার ঘৃতেও চর্বি মিশ্রিত করি।...

আপন অন্তরের গভীরতর সুখানুভূতির আশাকে ত্যাগ করিয়া কেহ প্রেমিক সাজিতে পারে না। শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "ধর্ম্ম ও কর্ম্ম" নামক পুস্তিকার একস্থলে লিখিতেছেন—'সুখের জন্য ত সকলেই লালায়িত। ত্যাগের খাতিরে ত্যাগ ত কাহাকেও

করিতে দেখি না। যে বিষয়ে জীব সুখ পায় না, সে বিষয় ত্যাগ করিয়া সে অন্যত্র সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়।...বাস্তবিক যেখানে যাহার একাত্মবোধ, সেইখানেই তাহার সুখভোগের কেন্দ্র।"...

পার্থিব ও ভগবৎ-প্রেমে মৌলিক সাদৃশ্য

ভগবানের রূপ ধ্যানের মধ্যেও আমাদের ইন্দ্রিয়গত আনন্দের পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বলিত রহিয়াছে। রোমাঞ্চ, স্বেদ-নির্গমন, পুলক, কম্পন, বাহ্যজ্ঞান-লোপ ইত্যাদি অবস্থা তো সেই ঈশ্বরোপলব্ধির বাহ্য লক্ষণ! রতি-বিলাস কালেও প্রেমিক-প্রেমিকার ঠিক্ অনুরূপ পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।...তারপর দেখুন, অতি বড় ভক্তও ভগবানের সান্নিধ্য বা সংযোগ কামনা করেন; শুধু তাই নয়, ভগবদ্‌মিলন-প্রসঙ্গে কোনো সাধক 'চিনি হইতে চাহেন', কেহ বা 'চিনি খাইতে চাহেন'। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতির মধ্যে ভগবানকে না পাইলে প্রেমিক আর স্থির থাকিতে পারেন না।

সাধারণ পর্যায়ের ভগবৎ-প্রেমিক্ প্রথমত আরাধ্যকে দেখিতে চান, পরে তাঁহার স্পর্শ পাইতে চান্; তাহার উচ্চতর স্তরে উঠিয়া তাঁহার সহিত আপন সত্বাকে বিলীন করিতে চান্। ইন্দ্রিয়জ্ঞান দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎ তৃপ্তির জন্য, মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে রঙ্-মাটি-খড় দিয়া ইন্দ্রিয়াদি-শোভিত বিভিন্ন মূর্তিতে প্রকট করিতে হইয়াছে। তদুপরি গুরু, পুরোহিত, রাজা, পিতা, মাতা প্রভৃতিকে সাক্ষাৎ ভগবানরূপে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। গুরুতেও যখন প্রেমিক মানুষের অরুচি ধরে, তখন যুগে-যুগে এক এক অবতারের অবতরণ মানিয়া লইয়া, তাহারা দিব্য রুচি বদলাইয়া লয়।

দর্শন দ্বারা নয়নের তো তৃপ্তি হইল। তারপর স্পর্শনেন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টির জন্য গুরু, মাতা-পিতা প্রভৃতির চরণ-বন্দনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন কোন গুরু সুন্দরী শিষ্যাদলের দ্বারা পদ-মর্দন, গাত্র-উদ্বর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হন্ না, নিবিড়তর স্পর্শ-সুখের স্বাধীনতা দান ও গ্রহণ করেন। 'ইহা বুঝি গুরুরূপী ভগবানের ছলনা', 'জরামরণশীল্ এই তুচ্ছ দেহ দিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সন্তুষ্টি বিধান করিব—তাঁহার সেবা করিব, ইহা এমন আর বেশি কথা কি?'…ইত্যাকার আত্ম-চিন্তা-দানে মনকে প্রবোধ দিয়া, ভগবৎ-প্রেমিকাগণ অজাচারী সন্ন্যাসীর নিকট দ্বিধাশূন্য আগ্রহে আত্ম-সমর্পণ করেন। বাংলা দেশে গুরুপ্রসাদী ব্যাপারটা যে নিছক্ নিন্দুকের স্বকলোপকল্পিত নয়, তাহার সাক্ষ্য বহু সমাজতাত্ত্বিকগণ নির্ভয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন।

যাক্, তারপর শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য তথাকথিত দৈববাণী, পিতামাতা বা গুরুমুখ-নিঃসৃত উপদেশবাণী, স্বাধ্যায়, মন্ত্রপাঠ, সংকীর্তনাদির প্রবর্তন। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য ধূপ-ধূনা, গুগ্‌গুল, চুয়া-চন্দন-অগুরু, বিবিধ গন্ধপুষ্পের সমন্বয়। পরিশেষে জিহ্বার উপভোগের জন্য চরণামৃত, বিবিধ চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোগের প্রসাদ তো আছেই।…যাহা হউক, মোট কথা, আমরা আমাদের সাধারণ, প্রত্যক্ষগোচর ও আজন্মলব্ধ বস্তুগুলি (অর্থাৎ জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াদি) দেবতাতে আরোপ করি এবং দেবতা যে অসাধারণ বস্তু ও গুণগুলির (যথা, অমরত্ব) অধিকারী, সেগুলি আমাদিগের মধ্যে আনিয়া বসাইতে চাই। এমনি করিয়া দেবতা ও আমাদের মধ্যে একত্ব-সম্পাদন ও অভেদত্বোৎপাদন করি।…সর্ব জাতীয় প্রেমের মূলত ওই একই ধারা।

ভক্তি-মার্গচারী মহাজনগণ যৌনেন্দ্রিয় দিয়া প্রেমাস্পদের সেবা

করাটাই কাম বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন এবং অতি নিন্দনীয় পংক্তিতে ঠেলিয়া দিয়াছেন। অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা সেবা করাটাকে বোধ হয় তাঁহারা প্রেমের কোঠায় ফেলিতে আপত্তি করিবেন না। তদুপরি যদি উহাতে নিজের স্বার্থ অপেক্ষা প্রেমাস্পদের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখার লক্ষণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে সম্ভবত 'নিকষিত হেম' বলিতেও বাধা হইবে না। প্রেমিক-প্রেমিকার চুম্বনের মধ্যে যৌনেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ বা সংস্পর্শ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সদাচারী মহাজনগণ উহাকে হয়তো পবিত্র প্রেমের বিকীরণ বলিতে দ্বিধা বোধ করিবেন।

অথচ রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে নিতান্ত লৌকিক ও বস্তুতান্ত্রিক-ভাবে শৃঙ্গারলীলার আদ্যন্ত বর্ণনা করিতে তাঁহারা কি ভাবকুশলতা ও ভাষাচাতুর্যের পরিচয় দিয়াছেন, কি ভাবে শত শত পদাবলীর মধ্যে নিখিল প্রেমিক-প্রেমিকার প্রাণকে যুগযুগান্ত ধরিয়া সরস সঞ্জীবিত উদ্দীপিত করিবার অনন্ত উপাদান সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়বিমুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। কবিরা তাঁহাদের স্বকীয় জীবনের সত্যোপলব্ধ ও কল্পনাসাধ্য প্রেমের অনুভূতিগুলিকে প্রিয় দেবদেবীর মধ্যে সঞ্চালিত করিয়া, একটা স্বর্গীয় পুলকে অভিভূত হইয়াছিলেন। আপন রস-ঘন দাম্পত্য বা যৌন-জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাসমূহকে তাঁহারা একটা ইন্দ্রিয়াতীত লোকের ইন্দ্রধনু-আঁকা স্বপ্ন-কুহেলির আবরণ দিয়া, প্রেমকে রমণীয় ও বরণীয় করিয়া আঁকিয়া গিয়াছেন মাত্র।

কাম ও কান্তপ্রেম

যাহা হউক, সূক্ষ্ম ভক্তিরসতত্ত্বের অনিশ্চিত, তমসাচ্ছন্ন, ভাবঘন আধ্যাত্মিক কণ্টকারণ্যে প্রবেশ না করিয়া, আমরা সুখ-দুঃখসমাশ্রিত

শ্যামলিম সংসার-কান্তারে বিচরণ করিয়া, যে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তদ্বারা এইটুকু সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, জগতের মানব-মনোজাত কোন প্রকার প্রেমই স্বার্থলেশশূন্য বা কামভাব-বিরহিত নয়। এমন কি, নিকটতম আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত আমাদের যে প্রেমের সম্বন্ধ, তাহার মধ্যেও সূক্ষ্ম-সূত্ররূপী কাম-কালসর্প লুকায়িত রহিয়াছে ;—জ্ঞান বা কর্মেন্দ্রিয়ের সহায়তায় লভ্য কোন-না-কোনরূপ স্বার্থ ও আনন্দানুভূতি এই প্রেমের উদ্দিষ্ট বিষয়। বাল্যকালের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া নর-নারীর মধ্যে যে যৌনভাবোদ্দীপক ভালবাসা জন্মে, তাহাকে বিশেষভাবে অভিহিত করা হয় 'কান্তপ্রেম' নামে ; এবং উহারই প্রকৃতি ও রীতি-নীতির আলোচনা করা বক্ষ্যমান পুস্তকের বিষয়ীভূত।

কান্তপ্রেমের মধ্যে যখন যৌনসম্মিলন ব্যাপারটা গৌণ না হইয়া মুখ্য হইয়া পড়ে, 'means to an end' না হইয়া 'an end in itself' হইয়া পড়ে, নিজের স্বার্থসাধন অন্য পক্ষের সুখ-দুঃখের মুখাপেক্ষী হয় না, তখন উহাকে প্রেম আখ্যায় অভিহিত করিতে না চান্—ক্ষতি নাই ; কিন্তু দোহাই, প্রেমের মধ্যে যৌনসম্মিলনের নাম শুনিয়া, ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া উহাকে 'নিছক কাম', 'পশু প্রবৃত্তি', 'আসুরিক আচার' ইত্যাদি বলিয়া উহার অমর্যাদা করিবেন না। স্মরণ রাখিবেন, কান্ত-প্রেমের অপরিহার্য ক্রিয়াটির কৃপায় আজ আমরা ধরিত্রীমাতার অঙ্কে স্থানলাভ করিয়াছি, বিশ্বপ্রকৃতির অপরূপ রূপ-সায়রে স্নান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, দেবতার পার্থিব প্রতিমূর্তি মানুষকে চিনিয়াছি, তাহার অসাধ্য-সাধনার অবদানগুলিকে জানিয়াছি। ওই তথাকথিত পশু-প্রবৃত্তিই নিখিল বিশ্বের জীবন-স্রোত এখনো প্রবহমান রাখিয়াছে,

বিধাতার লীলা-কমলকে চিরন্তন গৌরবে হিল্লোলিত, প্রাণপূর্ণ ও সুরভিত করিয়া দিয়াছে !

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রতিপত্তির সকল গুলিরই গুণকীর্তন করিয়া গিয়াছেন এবং সতত সমভাগে ও সমভাবে প্রথম তিনটি বর্গের অনুশীলন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ভীমসেন কামের শক্তিকে অপরাজেয় ও কামের সেবাকে অবশ্যপালনীয় বলিয়া মহাভারতে বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাণকার দেখাইয়া দিয়াছেন, দেবাদিদেবের কোপানলে ভস্মীভূত হইয়াও মদন তাঁহাকে পুষ্পবাণে জর্জরিত করিতে ছাড়িলেন না ; তাহারই ফলে সম্ভব হইয়াছিল কুমার-সম্ভব। এইজন্য কাম-কলাকে সুনিয়ন্ত্রিত, সুবিন্যস্ত, ও সুপ্রচারিত করিবার জন্য পুরাকালে কোনো সভ্যদেশেই বিচক্ষণ ব্যক্তির অভাব ছিল না। ভারতবর্ষেও শ্বেতকেতু, গোনার্দীয়, দত্তক, বাভ্রব্য, বাৎস্যায়ন হইতে আরম্ভ করিয়া কল্যাণমল্ল পর্যন্ত কত-না কামশাস্ত্রকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা যে অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এখনো বিশ্বের যৌনবৈজ্ঞানিককুল তাঁহাদের চিন্তা, গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসার মূল্যবান খোরাক পাইতেছেন।

আপামরসাধারণ মোক্ষ-অভিলাষী হইত, এবং এখনো হয়, তখনই—যখন তাহার সর্বদেহ ও মন সাংসারিক সৌহিত্যের অবসাদে—জরা ও ক্লৈব্যের গুরুভারে নুইয়া পড়ে। অর্থ ও কামের পূজা মানুষ সারা জীবন ধরিয়া তখনো যেমন করিত, এখনো তেমনি করে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থোপার্জনের মধ্যে এবং প্রজননের জন্য কামচর্চার মধ্যেও একটা স্বভাবসঙ্গত ছন্দ-সাম্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। তজ্জন্য লোক-সমাজে

কতকগুলি নীতি প্রচলিত ছিল—শিক্ষণীয় বিষয় ছিল এবং এখনো আছে। কালক্রমে সেই নীতির কতকগুলি রূপ-পরিবর্তন করিয়াছে, কতগুলি হয়তো অপ্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু মূলত উহারা ঠিকই রহিয়াছে। ঐ নীতিশিক্ষার সূত্রগুলিই লোকধর্ম নামে অভিহিত। ইহার অতিরিক্ত—মোক্ষের নিমিত্ত যে ধর্মচর্চা, তাহা মুষ্টিমেয় অসাধারণ লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল,—এই যান্ত্রিক্ যুগেও তাহাই রহিয়াছে।...

কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন মহাকবি কালিদাসকে মোক্ষ শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে বলিলে, তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিয়াছিলেন—'আবেশ-মধুর-নয়না ললনার কটিবসন উন্মোচনই আমার কাছে বড় মোক্ষ *।'

---

* অবিদিত-সুখ-দুঃখং নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ
জড়মতিরিহ কশ্চিৎ মোক্ষ ইত্যাচচক্ষে।
মম তু মতমনঙ্গ-স্মের-তারল্যঘূর্ণন্
মদকল-মদিরাক্ষী-নীবি-মোক্ষো হি মোক্ষঃ॥
[শৃঙ্গার-রসাষ্টকম্]

=তৃতীয় পটল=

প্রেমের প্রকৃতি ও বিকাশ-ধারা

সুস্থ স্বাভাবিক মানুষমাত্রেই যৌবনের প্রারম্ভে প্রেমে পড়ে, একথা ঠিক নহে। বস্তুত আমাদের প্রেম-জীবনের আরম্ভ হয় আমাদের জন্মদিন হইতে। অবশ্য শিশু নিজের প্রেম সম্বন্ধে সঠিক সংবিৎশীল না হইলেও প্রেমের পাত্র বা পাত্রীর রূপ ও গুণ সম্বন্ধে একটা অর্ধস্ফুট ধারণা করিয়া লইতে পারে; উহার নিকট হইতে তাহার কোন্ বিশেষ দৈহিক অভাবটির মোচন হয়, তাহা সে বুঝিতে পারে। কঠিন পারিভাষিক মতে, এই প্রেমে যৌনেন্দ্রিয়-জনিত কামগন্ধ থাকিতে পারে না, এবং থাকেও না। আত্মপ্রেম হইতেই এই প্রেমের উৎপত্তি এবং উহা প্রধানত ক্ষুন্নিবৃত্তির সহিত বিজড়িত। এক শ্রেণীর মনোবৈজ্ঞানিকগণ বলেন—শৈশবের প্রেম sexual না হইলেও sensual বটে।

প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিদেবী মানুষকে শিশুকাল হইতেই প্রেমের পরিবেশের মধ্যে ফেলিয়া, তাহাকে উহার ক্রমোচ্চ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিয়া তুলেন। মাতৃক্রোড়ে বসিয়াই আমরা ভবিষ্যৎ প্রেমের পছন্দই আদর্শ—রঙ্, তুলি, মাল-মশলা, টুকরা টুকরা বাহ্যরেখাসমন্বিত ছবিগুলি আপন অজ্ঞাতসারে সংগ্রহ করি।—কেমন করিয়া, তাহা পরে বলিব।

বাল্যপ্রেমের প্রকৃতি

বাল্যকালে অর্থাৎ পাঁচ-ছয় বৎসর বয়স হইতে তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যে বালক-বালিকা প্রেমে পড়িতে পারে। আবার বালক বালককে ভালবাসে, বালিকা বালিকাকে ভালবাসে গভীরভাবে,—এরূপ ঘটনাও অপ্রতুল নহে। অনেক সময় দেখা যায়, সাত-আট্ বৎসরের বালক ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্কা বিবাহিতা বা বিধবা নারীকে ভালবাসিয়াছে। এই নারী হয়ত তাহার দূর বা নিকট-আত্মীয়া অথবা প্রতিবেশিনী হইতে পারেন। এ ভালবাসা কেন—কোন্ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া জন্মিল, তাহা সে বলিতে পারে না; এ ভালবাসার প্রকৃতি বা পরিণতি সম্বন্ধে তাহার কোন স্পষ্ট পরিজ্ঞান থাকে না। এমন কি, অপর পক্ষ তাহার ভালবাসার যথার্থ মূল্যাবধারণ করিতে না পারিলেও সে মর্মাহত হয় না—নিরুৎসাহ হয় না। বলাবাহুল্য, এই প্রেমেও প্রত্যক্ষভাবে কোন যৌন আকাঙ্ক্ষার মোহ-মাদকতা বিজড়িত না থাকিলেও মনোবৈজ্ঞানিকগণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন—ইহার মূলে যৌন এষণার একটি নিরঙ্কুরিত ক্ষুদ্র বীজ লুকাইয়া থাকে। একটু বয়োবৃদ্ধি হইলে এবং অপর পক্ষের ঐকান্তিক আদর-যত্নের একটু বেশি উত্তাপ পাইলে, ঐ নির্মল প্রেমে দৈহিক কামনার লেলিহান বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতে পারে। জাঁ জ্যাক্স্ রুশোর জীবনে এইরূপ প্রেমের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।

বাল্যকালের প্রেম বড় তীব্র ও উগ্র হয়; তাহার স্মৃতিও অনেক ক্ষেত্রে দুর্মোচ্য ও জ্বালাময়ী হয়। কিন্তু সমবয়স্কের মধ্যে বাল্যকালীন্

প্রেমের পাত্র-পাত্রী অতি সহজেই পরিবর্তিত হইতে পারে; সামান্য কারণেই একটা বিবাদ-বিসম্বাদ বা মনান্তরের সৃষ্টি হইয়া যায়। আবার একই সময়ে ভালবাসার একাধিক পাত্র-পাত্রী থাকাও কিছু বিচিত্র নহে। প্রেম লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কলহ, মনস্তাপ, সাধ্যসাধনা, মানভঞ্জন, বিরাগ, পুনর্মিলন প্রভৃতি বালক-বালিকাদিগের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সংঘটিত হইতে দেখা যায়।

বাল্যপ্রেমের দুরন্ত স্মৃতি

বাল্যকালে বৃহৎ সুখ, ক্ষুদ্র দুঃখ ও সীমাবদ্ধ জগতের মাঝখানে যে অপক্ক ও অপেক্ষাকৃত অমল প্রেম দুইজন প্রায় সমবয়সী সমব্যথীর মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া তৃপ্তিরসে বিভোর হইয়া যায়, কৈশোরের কিনারায় পৌঁছিয়া তাহা যদি দৈবদুর্বিপাকে বিচ্ছিন্ন হইয়াও পড়ে, তাহা হইলে সে প্রেম যৌবন-বসন্তের সমাগমে মহত্তর ও শ্রেয়স্কর আধার লাভ করিয়াও অনেক ক্ষেত্রে সার্থক হইতে পারে না। যৌবনের ক্ষণিক অন্ধ মাদকতা কাটিয়া যাইবামাত্র দেখা যায়—বাল্যপ্রেমের স্মৃতি স্ফুটতর হইয়া মনের গুহায় একাকিনী বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। তখন বহু প্রেমিক-প্রেমিকাই বাল্যের সেই প্রেম ও প্রেমিকাকে যৌবনের নূতনতর অভিজ্ঞতার রসে অভিষিক্ত করিয়া, জীবন সার্থক করিবার প্রগাঢ় অভিলাষ মনে মনে পোষণ করে। বাল্যপ্রেমিকা বহু ক্ষেত্রেই তাহার বাল্যপ্রেমিককে শত চেষ্টায়ও মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। তাই শৈবলিনী চন্দ্র পণ্ডিতের ঘরনী হইয়াও প্রতাপকে ভুলিতে পারে নাই, রাজলক্ষ্মী সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পারাবার পার হইয়া খেয়ালি শ্রীকান্তের সহযাত্রিনী হইয়া ধন্যা হইয়াছিল, পার্বতী প্রীতি-ঐশ্বর্য

ঘেরা অচলায়তনের মধ্য হইতে ছন্নছাড়া দেবদাসকে কাছে টানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল!

কৈশোর প্রেমের ধারা

বাল্যকাল হইতেই প্রেমের প্রতি মানুষের একটা গ্রহণশীলতা ও উত্তরদায়কতার ভাব বর্তমান থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কৌলিক সংস্কার, পারিবারিক ও স্থানিক্ পরিবেশ, সঙ্গ ও শিক্ষাদীক্ষার উপর ব্যক্তি বিশেষের প্রেমের প্রকার, প্রবণতা, পরিমাণ, সাধনার ঐকান্তিকতা, বাহ্য বিকাশ প্রভৃতি বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রেমের পুতুল খেলা ভুলিয়া, পূর্ণভাবে ও সার্থকভাবে ভালবাসিবার জন্য একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের একটা নির্দিষ্ট বিভাবে জাগিয়া উঠে। পূর্ণ কৈশোরে, কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে অথবা যৌবন-সমাগমে, যৌনেন্দ্রিয়-সংলিপ্ত যে মিলন-রসে মানুষের অন্তরাত্মা অভিনিষিক্ত হয়, তাহাকেই আমরা আসল প্রেম বলিয়া বুঝিতে চাই।

পুরুষের কৈশোর কালের স্থায়িত্ব চৌদ্দ হইতে সতেরো বা আঠারো পর্যন্ত; নারীর বারো হইতে পনেরো বৎসর পর্যন্ত। পুরুষের যৌবন আসে আঠারো বৎসর বয়সে, নারীর ষোলোয়। প্রথমোক্তের যৌবন পরিপক্ক হয় বাইশ হইতে পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে, দ্বিতীয়োক্তের যৌবন পূর্ণপরিণতি লাভ করে উনিশ হইতে বাইশের মধ্যে। ইহার মধ্যেই প্রেমের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উপকরণসমূহ অন্তঃপ্রকৃতির নিভৃত কর্মতৎপরতায় পূর্ণবিকশিত ও ক্রিয়া-চঞ্চল হইয়া উঠে। কৈশোর হইতেই স্বাভাবিক মানুষের মনে লাগে আসন্ন যৌবনের একটা অপূর্ব পুলক-শিহরণ—একটা মদিরালস আবেশের

ঝিলিক্; অনেকেরই 'মনের মানুষ' অন্বেষণ ও লাভ করিবার একটা প্রবৃত্তি বা প্রেরণা প্রাণের মধ্যে রণরণিতে থাকে।

স্বর্ণস্বপনমণ্ডিত সুমধুর কৈশোর যতই যৌবনের প্রশস্ততর প্রবাহের নিকটবর্তী হয়, ততই প্রতি পদক্ষেপে মানুষ প্রাণের মধ্যে একটা জাগ্রৎ ও দুর্নিবার শক্তির সাড়া ও তাড়া উপলব্ধি করে। বৃন্তহীন পুষ্পের মতো একটা অশরীরী, অস্পষ্ট, অসংহত ও অনামা ছবি সে কেবলি আঁকে আর মুছে; কোমল মনোমৃত্তিকায় এক-একটা রঙীন্ কল্পনার বিগ্রহ গড়ে আর ভাঙে। পরিবার বা সংসারের কঠিন কর্তব্যের বোঝা স্কন্ধে লইয়াও কিশোর-কিশোরী অন্তরের পটভূমিকার এই অনুভবনীয় ও অভাবনীয় পরিবর্তনটিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। কাজ করিতে করিতে সে উন্মনা হইয়া কোন্ সুদূর মেঘলোকে উড়িয়া যায়; ঘুমাইতে গিয়া কল্পনার নেশায় বুঁদ হইয়া চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া থাকে; নিদ্রার মাঝে কত অভিনব ও অসম্ভাব্য স্বপ্ন-লীলা দেখিয়া চমকিয়া উঠে।

কি যেন সে চায়—পায় না; কেমন করিয়া তাহা পাইবে—জানে না। তাহার মনের আদর্শ কি—তাহা স্পষ্ট বুঝে না, ভাষায় সঠিক প্রকাশ করিতেও পারে না। প্রাচুর্যের মাঝেও একটা অভাবের সুর—আনন্দ-মেলার মধ্যস্থলেও একটা বিষণ্ণ বিমুখতা,—চারিদিকের মনোরম পরিপূর্ণতার অন্তরে যেন একটা অর্থহীন শূন্যতা! হয়তো এক সময় কল্পনা-রঙীন্ আশার পুলকাবেগ, আবার এক সময় নিরুদ্দম হতাশার ভারে গভীর দীর্ঘশ্বাস! চণ্ডীদাস, বলরাম দাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি পদকর্তারা কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণের বিসদৃশ আচরণগুলি স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য-ভরা ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। "রাধার কি হইল

অন্তরেতে ব্যথা" প্রভৃতি ছত্রগুলি বাংলার রসিক সুজনের নিকট সুপরিচিত। মৈথিলী কবিবর বিদ্যাপতি এই সময়কার ভাবান্তরের যুক্তিযুক্ত উত্তর একটি পংক্তিতে বড় মনোজ্ঞভাবে গ্রথিত করিয়াছেন—"মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ", অর্থাৎ মন্মথ-পাঠের প্রথম আরম্ভ হইয়াছে; সোজা কথায়—প্রেমের পাঠশালায় হাতে-খড়ি সুরু হইয়াছে!

যৌবনে প্রেমের লক্ষণ, গতি ও রীতি

যৌবন-সূচনায় বা যৌবন-সমাগমে কল্পিত দয়িত অনেকের মধ্যেই একটা স্পষ্ট বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করে। যুবক বা যুবতী এতদিন যে কুসুমকে আকাশে ফুটাইতেছিল, তাহাকে মর্ত্যভূমিতে নামাইয়া আনিয়া আপন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির আওতায় আনিতে চায়; একটা রক্ত-মাংসময় দেহধারীর নিকট আপনাকে নিবেদন ও সমর্পণ করিতে ব্যগ্র হয়। আপন বিশিষ্ট আদর্শরে অনুরূপ নর বা নারী অন্বেষণ করিবার—তাহাকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিবার জন্য সে পাগল হইয়া উঠে। তখনকার অবস্থা ঠিক্—"যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো, উহারি পরশ-রস মাগে!" জীবনের সর্ব ক্রিয়াশীলতা, সর্ব চিন্তা, সর্ব প্রচেষ্টা যেন তাহাকে ঘেরিয়াই দানা বাঁধিতে থাকে; তাহাকে লইয়াই জগতের চিরগতি-ছন্দের তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে ইচ্ছা হয়।...

যৌবনেই যৌনযন্ত্রগুলি রীতিমত সুপুষ্ট হইয়া উঠে; স্ত্রী ও পুরুষের যৌনধর্মের বাহ্যিক লক্ষণগুলি পূর্ণবিকশিত হয়। পুরুষের অণ্ডকোষে (Testicles) বীর্য ও স্ত্রীলোকের অণ্ডাশয়ে (Ovaries) অণ্ডাণু প্রস্তুতির তাড়া লাগিয়া যায়। তদ্ব্যতীত অন্যান্য নানাবিধ অন্তঃস্রাব রক্তস্রোতের মধ্যে নিয়মিতভাবে মিশিয়া, যৌবনোচিত আবেগ,

আকাঙ্ক্ষা, কৌতূহল, উদ্যম ও আসক্তির প্রস্রবণ উৎসারিত করিয়া দেয়। কৈশোরের মাঝামাঝি সময় হইতে পুরুষের স্বপ্নদোষ ঘটিতে বা পাণিমৈথুনের (Masturbatiou) দ্বারা বীর্য-নিঃসারণের একটা দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকের ঐ সময় প্রতি আটাশ দিন অন্তর-অন্তর জরায়ু-মধ্য হইতে শোণিতস্রাব নির্গত হয়।

কৈশোরে ও যৌবনে কোনো কোনো বালক প্রেমাবেগের সহিত যৌন-উপভোগের আকাঙ্ক্ষা এরূপ তীব্রভাবে অনুভব করে যে, বিপরীত যৌনধর্মীর অভাবে সমযৌনধর্মীর সহিত অস্বাভাবিক দৈহিক মিলনে প্রবৃত্ত হইতেও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। কোনো কোনো বালিকা বা যুবতী অভাবে পড়িয়া এইরূপ সম-জাতীয় প্রেমের কায়গত প্রযোজনায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। কেহ কেহ আবার পুরুষের ন্যায় নিজে নিজেই যৌনাবেগ প্রশমনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার স্মরণ লইতে শিখে। স্থায়ীভাবে বিপরীত যৌনধর্মীর সহিত মিলিত হইলে, প্রায় সকলেই এই সকল আপত্তিকর অভ্যাস ছাড়িয়া দেয় এবং প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতির সোপান বাহিয়া সানন্দে ঊর্ধ্বলোকে উঠিতে থাকে।

প্রেমের পাত্র নির্বাচন ও তাহার সহিত যথাসাধ্য স্থায়ীভাবে মিলিত হওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় হইল যৌবন-কাল; স্ত্রীলোকের পক্ষে যৌবনের প্রারম্ভ, পুরুষের পক্ষে যৌবনের মাঝামাঝি সময়। কৈশোরের শেষেও মিলিত হওয়া একদিক দিয়া অসম্ভব বা অসঙ্গত না হইলেও স্বাস্থ্যনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির দিক্ দিয়া বিশেষ সমীচীন নয়। প্রেমের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে স্ত্রীপুরুষের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকাটা ঘোরতর অন্যায় সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎসম্বন্ধে মতামত-গঠন সকল সময় আপন

অন্তরোদ্ভূত প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই করা উচিত নহে। প্রেমে শুধু যৌনাবেগ-প্রশমনের নেশা ছাড়া আরো অনেক মূল্যবান ও ভাবীফলপ্রসূ বস্তু আছে, যেগুলিকে উপেক্ষা করিয়া গেলে, তাহা উত্তরকালে শুধু ব্যক্তিগত অনুতাপেরই কারণ ঘটে না, পরিবার ও সমাজেরও অকল্যাণের হেতু হয়।

প্রেমিকের স্বভাব

প্রেমে বহু লোককেই অন্ধ হইতে দেখা যায়। ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী ব্যক্তিবিশেষের বংশানুক্রমিক প্রভাব ও সাহচর্য-প্রভাব একদিকে, এবং দেহাভ্যন্তরস্থ কতকগুলি যন্ত্রের ক্রিয়াশীলতা অন্যদিকে। বর্তমান মনোবিজ্ঞান অবশ্য প্রেম-সঞ্জাত উন্মাদভাব ও দৃষ্টিহীনতার একটা সীমারেখা টানিয়া, খানিকটাকে সম্পূর্ণ স্বভাবসঙ্গত ও অনিবার্য বলিয়া মতপ্রকাশ করে, বাকিটাকে অস্বাভাবিকতা ও ব্যাধিগ্রস্ত মনের লক্ষণ বলিয়া নির্ধারণ করে। যে প্রেমে শুধু যৌন সম্ভোগের স্পৃহাই ষোলো আনা স্থান জুড়িয়া থাকে, দেওয়া অপেক্ষা পাওয়ার অধীরতা যাহার মধ্যে সম্যক স্ফুরিত, সেই প্রেমেই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যতা সমধিক মাত্রায় বিকশিত দেখা যায়।

প্রেমে যখন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে স্থৈর্য, আত্মসংযম, ভাবাতিশয্য ও পরার্থপরতার সংশ্লেষ থাকে, তখন তাহা অন্ধ না হইয়া বরং একটা নূতন বিশালতর দৃষ্টিক্ষেত্র পায়, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। প্রেমিক হয়তো তাহার আরাধ্য বস্তুর বড় বেশি করিয়া মূল্য নিরূপণ করে; তাহার যেখানে যেটুকু অভাব-ত্রুটি আছে—সেগুলিকে তিতিক্ষা ও কবি-কল্পনার রঙ্-তুলি দিয়া পরিপূরণ করিয়া লইয়া, এক অখণ্ড অতুল

রূপের প্রতীক গড়িয়া তুলে। আদর্শের সহিত বাস্তবের যেখানে যেটুকু গরমিল্ আছে, সেটুকু প্রেমিক আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া, বিদূরণ করিবার চেষ্টা করে। সেইজন্য প্রত্যেক প্রেমিকই একাধারে শিল্পী ও কবি।

মহাকবি সেক্স্‌পীয়ার তাঁহার 'Midsummer Night's Dream'এ বলিয়া গিয়াছেন, "The Lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact." প্রথম প্রেমের আবেশে অনেক মানুষই যে উন্মত্তবৎ হইয়া পড়ে, তাহা যুগযুগান্তের অভিজ্ঞতালব্ধ পরম সত্য। প্রেম-বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন যে, এই উন্মত্ততার জন্ম দেয় আমাদের অণ্ডকোষ বা অণ্ডাশয় মধ্যস্থ একাধিক প্রকার নিগূঢ় রস; ঐ রসের সহিত একযোগে অধিবৃক্কীয় গ্রন্থি-নিঃসৃত রস আমাদের অজ্ঞাতসারে সমগ্র রক্তস্রোতে ক্রমাগত মিশিয়া মিশিয়া যৌবনকালে যাহা-কিছু বৈলক্ষণ্য, ভাবান্তর ও উদ্‌ভ্রান্তি উৎপাদন করে। এই যন্ত্রসমূহ ও তন্নিঃসৃত রসের বিশেষ পরিচয় পরে দিব।

প্রেমে মাদকতা

কবিরা উপমা-স্থলে প্রেমকে যে সুধার সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভাবিয়া দেখিতে গেলে অতিশয়োক্তি বিশেষ কিছু নাই। ভক্ত কবি রামপ্রসাদ যে গাহিয়াছিলেন, "সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী ব'লে",—ঐ সুরা বা সুধা শুধু ভক্তিভাবেরই উৎসেচন নহে, প্রেমেরও; এবং আমাদের দেহ-ল্যাবরেটরির মধ্যেই উহার সৃষ্টি ও ব্যবহার। ইহাকেই আমরা চলিত কথায় বলি—'ভালবাসার নেশা'।

এই নেশা মানুষকে অভূতপূর্ব উত্তেজনাও দেয়, অচিন্তিত জীবনী-শক্তি ও কর্মপ্রেরণাও দেয়।

উহা ব্যক্তিবিশেষে ধীরে ধীরে জন্মিয়া প্রগাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয়; আবার কাহারো জীবনের সকল সময়ই নেশাটা গোলাপী ও ফিঁকে থাকিয়া যায়। কাহারো হয়তো স্তূপীকৃত বারুদে একটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ সংযোগের ন্যায় গুরু গর্জনে প্রেমের নেশা জ্বলিয়া উঠে,—তাহা যেমন অকস্মাৎ, তেমনি নিদারুণ। প্রথম দৃষ্টিতে প্রেমে পড়া-ব্যাপারে কোনো কোনো পুরুষকে এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে মদিরাধীর হইতে দেখা যায়। কাহারো কণ্ঠের একটা গান শুনিয়া, পরিচ্ছদ বা গাত্রের গন্ধ গ্রহণ করিয়া অথবা এক ফোঁটা সেবার ছলে অঙ্গের সামান্য স্পর্শ পাইয়া অনেকে ভালবাসার রেশমী জালে পলকে আবদ্ধ হইয়া পড়ে—হয় চিরদিনের জন্য, নহেতো সাময়িকভাবে!

প্রেমের আদর্শ ও হিন্দুবিবাহ

প্রেম ও প্রেমিকের আদর্শ সম্বন্ধে সকলের ধারণা সমান নয়। একই পরিবারের দশজন লোকের মধ্যে হয়তো প্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখা যায়। একটু শিক্ষিত, সভ্যতাভিমানী, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহার আদর্শকে—তাহার কল্পলোকের মানস-প্রতিমাকে খাটো করিয়া রচনা করে না। কিন্তু ষোলো আনা আদর্শানুযায়ী প্রিয়জন বাস্তব জগতে কয়জন লাভ করে?

হিন্দু-সমাজে প্রেমের ব্যক্তিগত আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন বা তৎপূরণে উদ্‌গ্রীব হইবার পূর্বেই ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হইত; বিবাহ স্থির করিবার ও পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করিবার বিধাতা ছিলেন পিতামাতা

বা অন্যান্য অভিভাবক। বিবাহের অব্যবহিত উদ্দেশ্য কি, উহার অনাগত ফল কি, উহার সার্থকতা কোথায়—সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ বিবাহের পূর্বে কেহই পাইত না। পরিণয়ের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায় কালক্রমে যখন তাহারা আপন-আপন প্রেমের আদর্শ সম্বন্ধে সংজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া উঠিত, তখন হয়তো দেখিত যে, তাহার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিটি সেই আদর্শের দাবি-দাওয়া হইতে বহুদূরে অবস্থিত; অথচ সে অবস্থায় আইনানুগভাবে আদর্শ-পূরণের কোনরূপ প্রচেষ্টা করাও অসম্ভব। তখন এইরূপ অসন্তুষ্ট প্রেমিক-প্রেমিকা মনে মনে পিতামাতার মাতব্বরিতাকে অভিশাপ দিত, এবং সমাজের ভয়ে ও লোক-লজ্জার খাতিরে শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে একটা বাহ্য বনিবনাওয়ের ভাব বজায় রাখিয়া চলিত।

কেহ কেহ পরস্পরকে শুধু যৌবনের দুর্দম্য কামনার বিধিদত্ত সুলভ ইন্ধনরূপে জ্ঞান করিয়া, বিবাহিত জীবনের প্রথমাংশটা একপ্রকার অর্ধতুষ্টির আওতায় কাটাইত; কিন্তু শেষাংশটা উভয়ের পক্ষেই দুর্বিষহ ও বিষময় হইয়া উঠিত। কেহ কেহ যৌবনের প্রথম হইতেই প্রকাশ্যে বা গোপনে বেড়া ডিঙ্গাইয়া, 'মনের মানুষ' পাইবার সাধ্যমতো চেষ্টা করিত; তাহার ফলে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও মানসিক অশান্তি বাড়িয়াই চলিত। তদুপরি, বিগত পাঁচ শত বৎসর কাল কুলীন-প্রথা, মেলবন্ধন, শ্রেণী-বিচার, পণ-প্রথা, পুরুষপ্রাধান্য-সমন্বিত সমাজের নানারূপ বিধিনিষেধ হিন্দুর বিবাহ-জীবনে প্রেমের স্বচ্ছন্দগতিকে ব্যাহত—সত্যকার দাম্পত্য প্রীতিকে সুদুর্লভ করিয়া তুলিয়াছিল।

আধুনিক হিন্দুবিবাহের বৈশিষ্ট্য

এক্ষণে যুগ-প্রগতির আব্‌হাওয়ায় সমাজের শাসন-নিষ্ঠা ও সঙ্কীর্ণ-প্রাণতা বহু পরিমাণে দূর হইয়াছে। বিবাহার্থী পুরুষ তাহার ভাবী পত্নীকে দেখিবার ও তাহার সম্বন্ধে সম্যক্ তথ্য অনুসন্ধান করিবার একটা স্বাধীনতা পায়; পূর্ণ কিশোরী বা যুবতী বিবাহের প্রাক্কালে স্বমত-প্রকাশের একটা সুযোগ পায়। সামাজিক বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বা পারিবারিক্ ওজর-আপত্তি উপেক্ষা করিয়া, পূর্বরাগবদ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকার বিবাহের মধ্য দিয়া সম্মিলিত হওয়ার একটা প্রবণতাও সম্প্রতি কোন কোন স্তরে দেখা দিয়াছে।

এইরূপ সম্মিলন যে সর্বক্ষেত্রে পরিণামে শুভপ্রদ হয় অথবা উভয় পক্ষের চিরসুখদায়ক হয়, তাহা নহে। তথাপি বিবাহের ন্যায় জীবনের একটা গুরুতর ধর্ম-সংস্কারকে বরণ করিবার পূর্বে উভয়পক্ষই তাহাদের তরুণ মন ও তরল অভিজ্ঞতা দিয়া পরস্পরকে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, পরস্পর পরস্পরের প্রেমলাভের যোগ্য কিনা—তদ্বিষয়ে স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে পারে। তারপর যদি উভয়ে ভুল বুঝিয়া থাকে, কিছুদিনের ঘনিষ্ঠ সহবাসে যদি উভয়ের নিকট পরস্পরের দোষ-দুর্বলতাগুলি এমনভাবে ধরা পড়ে যে, কোনক্রমে তাহাকে বরদাস্ত বা সংশোধন করা যায় না, তাহা হইলে তজ্জন্য পিতা-মাতা, সমাজ-বান্ধবকে দোষী হইতে হয় না। তখন উভয়েই যথোচিত অনুতাপের পর কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও আত্মস্থ হইয়া, গৃহকোণে বসিয়া মনে মনে গাহিতে পারে—"দোষ কারো নয় গো শ্যামা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি ওমা।"...

বিবাহ কি মানুষকে চিরতৃপ্তি দান করে?

বিবাহ-সংস্কার যত বড়ই পবিত্র হউক, পতি-পত্নী-সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের অজিত বিধি-নির্দিষ্ট বিধান বলিয়া যতই জোর গলায় প্রচার করা হউক না কেন, উহা যে সর্বক্ষেত্রে মানুষের আশানুরূপ প্রেমোপলব্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়,—একথা সর্বতোভাবে স্বীকার করা চলে না। তবে বিবাহ সর্বপ্রথমেই মানুষকে প্রেমের বস্তুতান্ত্রিক্ দিকটি সম্বন্ধে সজাগ করে, তৎসম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গত তৃপ্তির একটা সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালী উপস্থাপন করে, যৌনসম্ভোগ বিষয়ে তাহাকে একনিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করে; তারপর যথার্থ প্রেম বলিয়া বস্তুটি সম্বন্ধে মানুষের যে উচ্চ ধারণা—তাহার সামঞ্জস্য, সংশোধন বা রূপান্তর-বিধান করিতে সাধ্যমতো প্রয়াস পায়। অবশেষে পুত্রকন্যার মায়া, অর্থনীতিক্ চিন্তাজাল ও নানাবিধ দায়িত্বের বোঝা চাপাইয়া দিয়া, তাহার পূর্ব-পরিকল্পিত প্রেমের অসম্পূরণীয় দাবি-দাওয়াগুলিকে বিস্মরণ-সমুদ্রে ডুবাইয়া দিতে চায়।...কিন্তু সকল ক্ষেত্রে কি কৃতকার্য হয়?

বিবাহ-সংস্কার সত্যসত্যই মানুষকে যদি আজীবন পরিতৃপ্ত করিয়া, অন্য কাহাকেও ভালবাসার ইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে দুর্নীতিমূলক অপরাধ অনেক কমিয়া যাইত, পাশ্চাত্য দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার এত উদ্ভব হইত না, সমাজের সর্বস্তরে বিবাহ-বীতস্পৃহ নরনারীর সংখ্যা দিন দিন এরূপ বাড়িয়া চলিত না। বিবাহের মধ্যে যে কয়জন লোক তাঁহাদের ভালবাসার প্রতিভাস চৌদ্দ বা পনেরো আনা-রূপ সিদ্ধ দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের নমস্য,—তাঁহাদিগের কথা

ছাড়িয়া দিতেছি। বাকি সকলে তাঁহাদের সচেতন (Conscious) বা অবচেতন (Subconscious) মনে প্রেম সম্বন্ধে অল্পাধিক অতৃপ্তির ভাব পোষণ করিয়াই বাঁচিয়া থাকেন। ইঁহাদিগকে যদি আজ বিবাহ-জীবনের সর্বপ্রকার নৈতিক ও ব্যবহারিক দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইঁহাদিগের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জনই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন এবং আশান্বিতচিত্তে নূতন করিয়া প্রেমাস্পদ অন্বেষণের কার্যে লাগিয়া যান্।

প্রেমামৃতে অবসাদ ও অরুচি

সভ্য সমাজ কর্তৃক প্রেমের যে সমুচ্চ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ করা এক প্রকার অসম্ভব। বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, প্রেমের যে সংশোধিত নির্বচনই নির্ধারণ করা হউক না কেন, মানুষ তাহাকে পুরাপুরিভাবে লাভ করিতে পারে না। তদুপরি বর্তমান সভ্যতার দোষে হউক, সামাজিক শিক্ষার দোষেই হইক, মানুষের স্বভাব-দোষেই হউক, প্রেম প্রায়ই সমানভাবে একটানা বহিতে চাহে না; এবং সে বোধহয় কমলার ন্যায় চিরচঞ্চল।

বহু ব্যক্তি পরিণত বয়স পর্যন্ত এক-একটা নির্দিষ্ট সময়-অন্তে তাহার স্থায়ী প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে নিজেকে অল্পাধিক অবসাদগ্রস্ত ও উদাসীন বলিয়া মনে করে; সেই সময় তাহারা প্রেমস্পৃহাকে নূতন করিয়া ঝালাই করিয়া লইতে অর্থাৎ উহাকে নূতন ক্ষেত্রে—নূতন পাত্রে—নূতন ছন্দে উপভোগ করিতে চায়।

বিবাহ-জীবনে প্রতীয়মানত পরিতুষ্ট প্রেমিক কয়েক বৎসর পরে কোন মহিলার রূপে বা গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য উন্মুখ

হইয়া উঠিয়াছেন, এমন কি তাঁহার সম্বন্ধে নিজের অকারণ দুর্বার দুর্বলতার কথা বন্ধু-মহলে অকপটে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই,—এরূপ উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।...কোন প্রতিবন্ধকতা বা গভীর আত্মসংযমের ফলে হয়তো সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত দৈহিক মিলন সংঘটিত হইল না; কিন্তু তাঁহার সহিত কিছুদিন পর্যন্ত ভাবাতিশয্য ও নিগূঢ় অর্থপরিপূর্ণ চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলিল, জন্মদিনে বা অন্য কোন উৎসবে মূল্যবান উপহার-বৃষ্টি হইল, তাঁহার সামান্য সামান্য বিপদে আশাতীতরূপ সাহায্যের বন্যাস্রোত বহিল। তাহার পর আবার সব চুপ্‌চাপ্, আবার পুরাতন প্রেম-পাত্রে হাসিমুখে প্রত্যাবর্তন। কেহ কেহ হয়তো সুযোগ বা সুবিধা পাইয়া কোন নূতন প্রেমিকাকে কয়েকদিন বা কয়েক মাস কাল কায়িকভাবে বিপুল আগ্রহে উপভোগ করিয়া, তারপর প্রকৃতিস্থ হন্।

বহু লোককেই জীবনে উপর্যুপরি কয়েকবার অথবা কয়েক বৎসর অন্তর-অন্তর প্রেমপাত্র সম্বন্ধে রুচি-পরিবর্তন করিতে দেখা যায়। 'ফাউস্ট্'-রচয়িতা জার্মান্ কবি গেটে তেইশ বৎসর বয়স হইতে প্রতি সাত বৎসর অন্তর একবার করিয়া নূতন প্রেমের ফাঁদে পা দিয়াছেন; এবং ঠিক্ ঐ সন্ধিক্ষণটিতে তাঁহার কবিত্ব-শক্তিও আশ্চর্যরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এমন কি, খ্যাতনাম্নী ক্রিস্টিআনি ভাল্‌পিয়াসের সহিত যখন তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ সুগভীর পিরীতি-সাগরে নিমজ্জিত, তখনো তিনি নব নব পাত্র হইতে যৌবনানন্দ-মদিরা-ধারা পান করিবার প্রলোভন দমন করিতে পারেন নাই। ম্যারিয়ানা, বেটিনা প্রভৃতি লাস্যচটুলা বিলাস-বিভ্রমময়ী তরুণী তাঁহার হৃদয়-যমুনায় কিরূপ বীচি-বিক্ষোভ

তুলিয়াছিল, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় গেটের অনেকগুলি খণ্ডকবিতা ও পত্রাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়।

বিবাহিতা নারীরাও জীবনে এইরূপ কয়েকবার সাময়িকভাবে এবং সচরাচর আধ্যাত্মিকতার মিথ্যা আবরণে প্রেমে পড়িতে পারেন। প্রেম-বিষয়ে কতকটা অতৃপ্ত পত্নী বা তরুণী-বিধবাগণ গণ্ডীবদ্ধ ও সংযত জীবন-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, সামান্য একটু সুযোগের ফাঁকে আপনাদিগকে ব্যক্তিবিশেষের নিকট কাম্য এবং তাহাকে নিজেদের নিকট রম্য করিয়া তুলেন। কেহ কেহ হয়তো ঘটনাচক্রে পড়িয়া দুই-চারিদিনের জন্যও এই ক্ষণিকের অতিথির নিকট পরম পুলকে দেহদান করিতেও কার্পণ্য করেন না।

এতদ্ব্যতীত বিবাহ-জীবনে মোটামুটিভাবে সুখী রমণীদিগকেও একটা বয়সে কখনো কখনো অপর পুরুষকে ভালবাসিতে বা মনে মনে তাহাকে নিবিড়ভাবে আকাঙ্ক্ষা করিতে দেখা যায়। এইরূপ ভালবাসা হয়তো সস্নেহ সেবায়, আচারে-ব্যবহারে, বা চিঠির উভয় পংক্তির মাঝখানে বিজলী-ঝলকের মতো অভিব্যক্ত হইয়া, কিছুদিন পরে মিলাইয়া যায়। ইহার উদ্ভব সাধারণত হয় কোনো উৎসব-ক্ষেত্রে, তীর্থস্থানে. বায়ু-পরিবর্তনের জায়গায়, সিনেমা বা থিয়েটারে, কোনো বান্ধবীর গৃহে, রেল-স্টীমারে ভ্রমণ-কালে, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়,—সামান্য উপকারের ফলে, চাটুবাদবহুল মুখের দুইটি মিষ্টকথায়, কিম্বা চকিতের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময়ে!

প্রেমে অনন্যপ্রাণতা ও আজীবন বীতস্পৃহা

কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহারা এক ব্যতীত দ্বিতীয় কাহাকেও

ভালবাসিতে পারেন নাই, স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া জীবন-সায়াহ্ন পর্যন্ত আর কেহ তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই; প্রায় ক্ষেত্রেই ইহাকে ভণ্ডামি নামে অসংশয়ে অভিহিত করা চলে। যদি সত্যই এরূপ কোন ব্যক্তি থাকেন, তাহা হইলে তিনি অস্বাভাবিক লক্ষণ-যুক্ত বলিতে হইবে।...

একদল দুঃখবাদী বৃদ্ধ আছেন, যাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলেন যে, তাঁহারা জীবনে কখনো কাহাকেও ভালবাসিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকেও কেহ কখনো যথার্থ ভালবাসিতে পারে নাই; এবং ভালবাসা বলিয়া কোন জিনিস দুনিয়ায় নাই। আসলে এই মানুষগুলি আজীবন ঘোর স্বার্থপর; নিজস্ব দৈহিক তাগিদটুকু মিটানো ব্যতীত প্রেমের মধ্যে আর যাহা কিছু শ্রেয় ও উচ্চতর ছিল, তাহাকে তাঁহারা চিরকাল উপেক্ষা করিয়াছেন, এবং তাহার ফলে তাঁহারা নিজেরাও উপেক্ষিত হইয়াছেন। ভালবাসায় যে অপরিহার্য দায়িত্বটুকু হাসিমুখে গ্রহণ ও বহন করিতে হয়, তাহাকে তাঁহারা সাধ্যমতো এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন; দিনের পর দিন ধরিয়া যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন, তাহাতে তাঁহারা অসমর্থ হইয়াছেন।...

এমন মানুষও জগতে বিরল নহে—যাহারা প্রেম জিনিসটির প্রতি বাল্যকাল হইতেই বীতরাগ; তাঁহারা উহাকে শ্রদ্ধা করিতে জানেন না, শুধু ভয় অথবা ঘৃণা করেন। ইঁহাদের প্রায় সকলেই চিরকুমার বা চিরকুমারী থাকেন; অথবা অল্পদিনের মধ্যে বিপত্নীক বা স্বামীহারা হইলে, আমরণ পুনর্বিবাহের চিন্তাকে মন হইতে দূরে রাখেন। এই লোক-গুলি সাধারণত হয় উৎকট ভাবপ্রবণ, মনে মনে অত্যন্ত আত্মম্ভরী, অতিরিক্ত স্বাধীনচেতা, ভবিষ্যৎ কর্মফল সম্বন্ধে অতিশয় সাবধানী এবং

অল্পবিস্তর নাড়ীবিকারগ্রস্ত (Neurotic type). বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে গুটি কয়েক বিসদৃশ উদাহরণ দেখিয়া, তাঁহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, কাহাকেও ভালবাসার অথবা ভালবাসিয়া বিবাহ করার অর্থ তাহার নিকট আপন ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ অনুদ্ধরণীয়ভাবে বিসর্জন দেওয়া এবং জীবনের প্রতি কর্ম-বিভাগে তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। এতখানি আত্মত্যাগের কল্পনাও তাঁহারা করিতে পারেন না।

তথাপি প্রেমের জড়্ তাঁহাদের প্রাণের নিম্নতম স্তরে থাকিয়া যায় এবং এক-একটা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া মাথা খাড়া করিয়া উঠে। সারাজীবন তাহাদের চেতন ও অবচেতন মনে চলে প্রেমের সহিত ঘোর দ্বন্দ্ব। যদি কখনো কোথাও প্রেমের কাছে তাঁহারা প্রতিহত হন্, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ্যে স্বীকার করাটাও মহাপাপ বলিয়া মনে করেন। প্রেম সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ ও আত্মবঞ্চনা করিয়াই তাঁহারা একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তি পান্।

আশৈশব স্থির প্রেমিক

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের ভিতর স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে সারাজীবনের মধ্যে প্রেমের ক্রম-পরিবর্তন ঘটে না। প্রেম সম্বন্ধে তাঁহারা আজীবন শিশু থাকিয়াই যান্। ইঁহারাও নাড়ীবিকারগ্রস্ত (Neurotic) ও অস্বাভাবিক পর্যায়ের লোক। সেই-যে বাল্যকালে পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠতাত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমা, বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কাহাকেও আদর্শ দেবদেবী-জ্ঞানে অযৌন ও অপাপবিদ্ধ প্রেমে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই প্রেমকেই তাঁহারা সাতপুরুষের বিশ্বস্ত প্রজার মতো চিরকাল লালনপালন করিতে থাকেন।

ওই আত্মীয় বাঁচিয়া থাকিলে, কালক্রমাগত যৌনপ্রেমকে অস্ফুট ও কতকটা বস্তু-নিরপেক্ষ রাখিয়া, এই অবিচলিত ও বিবাহবিরাগী প্রেমিককুল উহাদের সেবা-শুশ্রূষার মধ্যেই জীবনের সার মোক্ষফল লাভ করেন।

আত্মীয় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, চিরবিষণ্ণতাময় যবনিকার অন্তরালে বসিয়া, তাঁহার সজীব স্মৃতির একান্ত উপাসকরূপে ইঁহারা দিনগত পাপক্ষয় করিয়া যান্। পূর্ণযৌবনে যৌনোন্মাদনাবশে অন্য কাহাকেও ভালবাসিবার ক্ষণিক প্রলোভন হৃদয়ে জাগিলেও তাঁহারা এই নির্বেদ-চিন্তা-দ্বারা ত্বরিৎ আত্মদমন করিতে পারেন যে, সে হয়তো তাঁহাকে আশানুরূপ প্রেম-প্রদানে অশক্ত হইবে, অথবা হয়তো তাঁহার শৈশবের প্রেমাস্পদের মতো তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইবে; তাঁহার কপালে আর সুখ-ভোগ লেখা নাই!···ইঁহাদের মধ্যে যদি কেহ ভাগ্যক্রমে বিগত আত্মীয়ের ন্যায় বাহ্য সৌষ্ঠবসম্পন্ন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান্, তাহা হইলে বয়সের পার্থক্য বা সামাজিক প্রতিকূলতার সম্ভবনীয়তা স্বত্বেও তাহাকে প্রবল ঔৎসুক্য-ভরে ভালবাসিয়া ফেলেন এবং বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে পরম আহ্লাদিত হন্। এইরূপ মনোভাবাপন্না কোনো কোনো যুবতী জীবিত বা মৃতদার বৃদ্ধের ঘরণী হইয়া, তাঁহাতে একান্ত সমর্পিত-প্রাণ হইয়া পড়ে।

সংশয়ী ও অসিদ্ধ প্রেমিক

জগতে এমন স্ত্রী-পুরুষও দেখা যায়, যাহারা নিজেদের ভালবাসার ক্ষমতার উপর ঘোরতর সংশয়ের ভাব পোষণ করে। ইহাদিগকে যখন অপরে ভালবাসে, এবং তৎসম্বন্ধে তাহাদের মনে সামান্য প্রতীতি জন্মাইয়া

দেয়, তখন তাহারা প্রেমোদ্বোধকের চরণে নিতান্ত নিঃসহায়ের মতো লুটাইয়া পড়ে।...

এই সুবিশাল বিশ্বে যে ভালবাসিবার মতো একটি প্রাণীকেও খুঁজিয়া পায় না, সে সকলের করুণার পাত্র। এই উৎসবময়ী শ্যামা ধরণী তাহার চক্ষে নিষ্প্রভ, নিঃস্ব, নিরানন্দ। সে যেন এখানে নিতান্ত অনাত্মীয়, অপরিচিত, অসহায়। পৃথিবীর সকলকেই সে অবিশ্বাস, ঘৃণা ও সন্দেহের চক্ষে দেখে। এই জুগুপ্সা-ভাব যখন দ্বিগুণ প্রতিঘাত পাইয়া তাহার নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসে, তখন সে নিজের কাছে নিতান্ত মূল্যহীন হইয়া পড়ে। ইহার ফলে অনেকেই মধ্যযৌবনে আত্মঘাতী হইয়া, আপন ব্যর্থ জীবনের অবসান ঘটায়। যাহারা অপরকে ভালবাসিতে জানে না, তাহারা প্রকৃতপক্ষে নিজেকেও ভালবাসিতে পারে না।

প্রেমাস্পদকে সর্বতোভাবে জয় করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে—এরূপ স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা জগতে ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে। বর্তমান শিক্ষা, সভ্যতা ও অর্থনীতিক অসাম্য ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী সন্দেহ নাই। এই অকল্যাণকর অসামর্থ্যের প্রধান প্রধান কারণ-নির্ণয় ও উহার প্রতিকার-নির্দেশ বক্ষ্যমান পুস্তকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

যখন দেখা যায়, কোনো লোক মনের মধ্যে ভালবাসার ঐকান্তিক ইচ্ছাকে পোষণ করিয়াও বস্তুনিষ্ঠভাবে তাহার চরিতার্থ সাধন করিতে পারিতেছে না, তখন তাহা সত্যই মর্মন্তুদ বলিয়া মনে হয়। আবার ইহার বিপরীত ব্যাপারের দৃষ্টান্তও জগতে বড় অল্প মিলে না। দেহগত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই অনেকে প্রেমের কর্তব্যটুকু নিঃশেষ করিতে চান্, আধ্যাত্মিক সমন্বয়ের নিমিত্ত তাঁহারা আদৌ উৎসুক নহেন। প্রেমাস্পদের

জন্য তাঁহাদের একটা গভীর মমত্ববোধ, চিরসজাগ অনুকম্পা, ভাবের আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকে না; কর্ম ও চিন্তা-জগতে তাঁহারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন ও বহুদূরবর্তী রহিয়া যান্। এই প্রেম কখনো আদর্শ পদবাচ্য হইতে পারে না এবং উহা কাচ-পাত্রের ন্যায় অতি সহজেই টুটিতে পারে।

প্রেমের আসল ধর্ম ও লক্ষ্য

দেহ ও মন, রূপ ও গুণ,—উভয় লইয়াই প্রেমের কারবার। উভয়ের যাহা কিছু দেহগত ও মনোগত ন্যূনতা বা দীনতা, তাহা প্রেমিকের চক্ষে উপেক্ষণীয়, এমন কি আদরণীয় হইয়া উঠে। যৌনাবেগের স্থূল পরিপূর্তির তাগিদ্ যখন আসিবে, তখনই যে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন অপরিহার্য হইয়া উঠিবে, অন্য সময় নহে,—ইহাকে কখনই সত্যকার প্রেম বলা চলে না। পরস্পরের জন্য নিত্য নূতন আকৃষ্টি ও উন্মুখতা, ত্যাগপ্রিয়তা ও দুঃখবরণের ঐকান্তিকতা—সত্যকার প্রেমের প্রধান লক্ষণ *।

"প্রেমাস্পদ যে নব নব, নিত্য নব। নূতন নূতন সৌন্দর্য্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠে। চাঁদকে ভালবাসি, দেখ, তাই চাঁদ কখনও পুরাণ হয় না।...গোলাপ কখনও পুরাণ হয়? ... মার কাছে শিশুর মুখ কখনও কি পুরাতন হইয়াছে? হইতে পারে না—হইবার যো নাই। যাহাকে ভালবাসি, সে চিরদিন নূতন; যাহা ভালবাসি, তাহা চিরদিন নূতন। প্রেমাস্পদের মুখ দেখিলে, প্রত্যেক দিন প্রাণের ভিতরে কত নব ভাবের লহরী খেলে।".....

"প্রেমিক প্রেমাস্পদের সুখের জন্য নিজের সুখ ত্যাগ করেন। অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি মহৎ বিষয় পর্য্যন্ত প্রেমিকের এই লক্ষণ দেখিতে পাইবে। সামান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অকিঞ্চিৎকর পদার্থ ভোগ করিতে হইলেও আগে প্রেমাস্পদের ভোগ চাই, নতুবা প্রেমিক তাহা ভোগ করিবেন না।"

—'প্রেম,' অশ্বিনীকুমার দত্ত, পৃ, ২৭-২৮, ৩৯-৪০।

প্রেমের লক্ষ্য হইল—অপরকে উপলক্ষ করিয়া মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করা। সেইজন্য বহু দার্শনিক বলেন যে, কাহাকেও ভালবাসার অর্থ হইল, তাহার ভগবানকে পাওয়া। সেইজন্যই প্রেমের আদর্শকে আমরা এত বড় করিয়া রচনা করি, প্রেমের পাত্রকে এত মহৎ করিয়া অঙ্কিত করি, তাই আমরা কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গাই—

"এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"...

প্রেমাস্পদের মধ্যে মানুষ নিজেকে খুঁজে ; তাহার মধ্যে শুধু নিজের প্রতিবিম্বই দেখিতে পায় না, নিজের ভিতর যেটুকুর অভাব—সেটুকুকেও তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত দেখে *। ভক্ত ও প্রেমিক দু'জনেই ঘৃণা, লজ্জা ও ভয়—এই তিনটি প্রবৃত্তিকে জয় করেন। ভক্তের ন্যায় প্রেমিকও তাঁহার আরাধ্যকে সম্মুখে রাখিয়া বলেন—"যজ্ঞ, দান, জপ, তপ, সব তুয়া মোর।"...

* Romantic love sees reflected in another the thoughts, feelings, aspiration, ambitions aud accomplishments of his own soul ; the loved one becomes the looking glass of the lover."—**The Lover's World** by A. B. Stockham, M. D., p. 36.

পরিতৃপ্ত প্রেমিক উদার, আনন্দময়, অহিংস, ঈর্ষাশূন্য, জগতের সহিত নির্বিরোধী—জীবনের সর্বাবস্থায় উচ্চাভিলাষশূন্য। প্রেমাস্পদকে সে ঈশ্বরের সহিত একাত্ম করিয়া, নিজেও ঈশ্বরত্বে উপনীত হয়। দেবতার মতো পৃথিবীতে প্রেম তাই চিরঞ্জীব, প্রেমের সাধনা তাই এত কৃচ্ছ্রসাধ্য, প্রেমের অবদান তাই এত গরিমামণ্ডিত!

—•—

চতুর্থ পটল

প্রেম-নিয়ামক যন্ত্রাবলী

পাঠকগণ, স্মরণ রাখিবেন, প্রেমের যে অংশ তথাকথিত 'কাম' অথবা যৌনলিপ্সা ও তাহার চরিতার্থতার সহিত সংশ্লিষ্ট, আমরা এই পুস্তকে প্রধানত তাহারই বিচার ও বিশ্লেষণ করিতেছি—বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর। প্রেতাত্মা যেমন তাহার অপূর্ণ জাগতিক কামনারাশি মিটাইবার ও মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে মনুষ্যদেহে ভর করিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়, প্রেমও তেমনি নিজেকে পূর্ণ বিকশিত ও সার্থক করিবার জন্য সকর্মক মনুষ্য-ইন্দ্রিয় খুঁজিতে থাকে। প্রেম বা কামকে 'মনসিজ' বলা হইয়াছে বটে; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—সে মনটি আমাদের দেহের ভিতরেই অবস্থিত এবং দেহের বিভিন্ন যন্ত্রাদির উপর তাহার কার্যকারিতা, পুষ্টি, তৃপ্তি ও উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। মানুষ যতদিন বাঁচিয়া আছে, ততদিন মন তাহার দেহকে অতিক্রম করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য করিতে পারে না, অথবা অপরের দেহকে অস্পৃশ্য রাখিয়া শুধু তাহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

মস্তিষ্ক ও অনুমস্তিষ্ক

দেহের মধ্যে মনের স্থান কোথায়?—মস্তিষ্কে। অভিনেতারা যে বুকে হাত দিয়া তাঁহাদের মন বা হৃদয়ের স্থান নির্দেশ করেন, তাহা

একান্ত ভ্রমাত্মক। বলা বাহুল্য, মস্তিষ্কের অবস্থিতি আমাদের মস্তকের খুলির অভ্যন্তরে। অতি কোমল অথচ প্রয়োজনীয় যন্ত্র বলিয়া ইহাকে ভগবান এত কঠিন আবরণের মধ্যে রক্ষা করিয়াছেন এবং দেহের শীর্ষভাগে ইহার স্থান-নির্দেশ করিয়াছেন। মস্তিষ্কের চারিটি বিভাগ আছে; সমগ্র ললাটের পশ্চাতে এক বিভাগ, উভয় কর্ণের তিনপার্শ্বে এক বিভাগ, চাঁদি বা ব্রহ্মতালুর নিম্নে একটি বিভাগ, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে আর একটি বিভাগ। সমগ্র মস্তিষ্কে প্রায় বিয়াল্লিশটি ক্ষুদ্র সেরেস্তা আছে। এক-একটি সেরেস্তায় এক-এক প্রকার অনুভূতি, আবেগ, প্রবৃত্তি, অভিলাষ প্রভৃতির কেন্দ্র।

মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে মস্তিষ্কের যে অংশটি ঈষৎ চ্যাপ্টা বড় কমলালেবুর মতো রহিয়াছে, সেইটির নাম অনুমস্তিষ্ক (Cerebellum). এই অনু-মস্তিষ্ক খোদ্ মস্তিষ্ক মহাশয়ের সহকারী এবং ইহা আমাদের শরীরে প্রধানত দুইটি ক্রিয়া পরিচালনা করে। চলা, উঠা, বসা, দাঁড়ান, প্রভৃতি কার্য করিবার জন্য অঙ্গ-সঞ্চালন ব্যাপারে ক্ষুদ্র-বৃহৎ পেশীসমূহের যেভাবে নড়া-চড়া করা দরকার, ঠিক সেই ভাবে নড়া-চড়ার শক্তি ও প্রেরণা দেয় অনুমস্তিষ্ক। আমরা যে চলিবার, দৌড়িবার বা নাচিবার সময় ঠিকমত ধীরে বা দ্রুত পদদ্বয় ফেলি ও বাড়াই, তাহা অনুমস্তিষ্কেরই কার্যকারিতায়। উহা আমাদের গতি-সুষ্ঠুতা (poise) ও ভারসাম্য (equilibrium) বজায় রাখিতে সাহায্য করে। ইহার দ্বিতীয় কার্য হইল গার্হস্থ্য প্রবৃত্তি ও প্রবণতাগুলিকে আশ্রয় দেওয়া—প্রতিপালন ও পরিচালন করা *।

* The Science of A New Life —J. Cowan, M. D., P. 96—97.

গার্হস্থ্য প্রবৃত্তিনিচয়

গার্হস্থ্য প্রবৃত্তিগুলিকে মোটামুটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়; (১) অপর যৌনধর্মীর প্রতি আকর্ষণ ও ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ প্রেম, (২) বিবাহের প্রতি অনুরাগ ও স্বামী অথবা স্ত্রীর প্রতি অবিচলিত আসক্তি, (৩) সন্তানবাৎসল্য, তদভাবে পশু-পক্ষীর প্রতি প্রীতিভাব, (৪) গৃহের বাহিরে বন্ধুত্বপ্রিয়তা বা সামাজিকতা, (৫) স্বগৃহ বা স্বগ্রামের প্রতি ভালবাসা, ও (৬) সাংসারিক কার্যে চিত্তস্থিরতা, অনন্যমনতা ও প্রলম্বিত অধ্যবসায়। পশ্চাদ্‌মস্তিষ্কের নিম্নপ্রান্তে ঠিক্ মাঝামাঝি জায়গায় স্কন্ধ ও মস্তিষ্কের সংযোগ-স্থলে (কোন কোন লোকের এই জায়গায় একটি ক্ষুদ্র অবনমন দেখা যায়) এক ইঞ্চি পরিমিত অংশে মানুষের প্রেমের প্রসব-ঘর। শুধু প্রসব-ঘর বা বলি কেন—প্রেমবৃত্তির নাট্যমঞ্চ বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হয়। প্রেম সম্বন্ধীয় যাহা-কিছু ভাব ও ভাবনা, আগ্রহ ও আকুলতা, চিন্তা ও চেষ্টা, তাহা অনুমস্তিষ্কের এই কেন্দ্রটির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হয়। মস্তিষ্ক-বৃত্তিবিশারদগণ (Phrenologists) বলেন, যাহাদের এই স্থানটি বাহির হইতেই বেশ বিস্তৃত, পুষ্ট ও রোমশ দেখায়, তাহারা গভীর ও স্বতোৎসাহী প্রেমিক।

নাড়ী ও তাহার কার্যাবলী

অনুমস্তিষ্কের প্রেম-কেন্দ্রের পশ্চাতে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে "সুষুম্না রজ্জু" নামক নাড়ীগুচ্ছের ঊর্ধ্বপ্রান্ত। দেহতত্ত্বের পারিভাষিক তথ্য-বিস্তারণে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য-চ্যুতির সম্ভাবনা বুঝিয়া, এই ব্যাপারটি অতি সংক্ষেপে সহজবোধ্যভাবে বলিয়া যাইব। 'নাড়ী'

শব্দটি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের একটা অস্পষ্ট অথবা ভ্রান্ত ধারণা আছে। ইংরাজীতে 'nerve' বলিতে যাহা বুঝায়, সংস্কৃত বা বাংলায় 'নাড়ী' বলিতে তাহাই জ্ঞাপন করে,—যদিও প্রায় লোকেই ভুল করিয়া 'নার্ভের' প্রতিশব্দ 'স্নায়ু' ব্যবহার করিয়া থাকেন। নাড়ীর প্রধান কার্য কি?—দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যে ক্রিয়াশক্তি সঞ্চালিত করা। বলা-বাহুল্য, ওই ক্রিয়াশক্তি মস্তিষ্ক হইতেই উদ্ভূত হয়।

দেহের শিরা-উপশিরায়, হৃৎপিণ্ডে, যকৃতে, চক্ষুতে, কর্ণে, চর্মনিম্নে, জিহ্বায়, ওষ্ঠে, ফুস্‌ফুসে, মূত্রস্থালীতে, গুহ্যদ্বারে, যোনি ও লিঙ্গদেশে, হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রত্যেক পেশীর মধ্যে বৈদ্যুতিক তারের ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ-হ্রস্ব-দীর্ঘ নাড়ীতন্তু ছড়াইয়া আছে। এক শ্রেণীর নাড়ী-তন্তু বাহ্য জগৎ হইতে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের বোধ বা প্রতিচ্ছবি বহন করিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায়; আর এক শ্রেণীর নাড়ীতন্তু মস্তিষ্ক হইতে কার্যের প্রেরণা বহন করিয়া ইন্দ্রিয়গুলিতে লইয়া আসে।

মনে করুন, আপনি বাগানে গিয়া একটি সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন; অর্থাৎ আপনার চক্ষুমধ্যস্থ দৃষ্টিগ্রাহী নাড়ী ঐ ফুলের প্রতিচ্ছবিটি আপনার মস্তিষ্কের নিকট বহন করিয়া লইয়া যাইবামাত্র ফুল সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান জন্মিল। এই জ্ঞান-দানে সাহায্য করিল প্রথম শ্রেণীর নাড়ীতন্তু। ফলে আপনার মস্তিষ্কের মনন-কেন্দ্রে ইচ্ছা হইল ঐ ফুলটির গন্ধ শুঁকিবার। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাড়ীতন্তু ক্রিয়া-শক্তি বহন করিয়া লইয়া আসিল দক্ষিণহস্ত ও তাহার দুইটি অঙ্গুলির পেশীগুলির মধ্যে—যদ্বারা আপনি দক্ষিণবাহু প্রসারিত করিয়া দুই অঙ্গুলির সাহায্যে ফুলটিকে ছিঁড়িলেন ও তাহাকে নাকের কাছে ধরিলেন। এইবার

নাসিকাগাত্রে-সংলগ্ন গন্ধবহা নাড়ীতন্তুসমূহ গন্ধের বোধ মস্তিষ্কে বহন করিয়া লইয়া গেল।...ঋতুজনিত শৈত্যাতপ, বিষয়োৎপন্ন সুখদুঃখ ভোগের প্রত্যক্ষ কর্তা হইল মস্তিষ্ক, উহাই আমাদের মন, বুদ্ধি, অহংকারের অধিষ্ঠান-ভূমি—সর্ব ক্রিয়াশক্তির storage-battery বিশেষ।

এইবার একটু উপমার সাহায্য লইব। মস্তিষ্ক হইল যেন আমাদের দেহ-প্রদেশের লাট-সাহেব, সর্বময়কর্তা; কয়েকটি বিশেষ জরুরি কার্যের উপর তিনি সরাসরি তত্ত্বাবধান করেন এবং বাকিগুলির ভার আছে অনুমস্তিষ্কের উপর। অনুমস্তিষ্ক তাঁহার ক্যাবিনেট্ বা মন্ত্রিমণ্ডলী। আর সুষুম্না-রজ্জু হইল মন্ত্রিমণ্ডলীর সেক্রেটেরিয়েট্; ইহা ধরাবাঁধা মামুলি কাজের তত্ত্ব লয়—দিগ্বিদিকে শক্তি বা প্রেরণা প্রেরণ করে, প্রায়শ মস্তিষ্কের অনুমতির অপেক্ষা রাখে না। তবে তাঁহাকে নিয়মিতভাবে রিপোর্ট্ দাখিল করিতে হয়।

সুষুম্না-রজ্জু ও কামোদ্দীপক কেন্দ্র

সুষুম্না-রজ্জু প্রায় ষোলো-সতেরো ইঞ্চি লম্বা এবং আমাদের কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় মোটা। ইহার ওজন তিন আউন্সের বেশি নয়। ইহা কি-ভাবে অবস্থান করে জানেন? আমাদের পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে—মস্তকমূল হইতে নিতম্বের ঊর্ধ প্রান্ত পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থির টুকুরায় গাঁথা মেরুদণ্ড অবস্থিত; ওই মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন সরু নালী আবৃত রহিয়াছে। অনুমস্তিষ্কের নিম্নপ্রান্ত হইতে সুষুম্না-রজ্জুটি এই নালীর মধ্যে ঝুলিয়া রহিয়াছে—ঠিক্ একটি সর্পশিশুর মতো। সুষুম্না-রজ্জুর উভয় পার্শ্ব দিয়া একত্রিশ জোড়া নাড়ী-কাণ্ড বাহির হইয়া, দেহের চতুর্দিকে অসংখ্য নাড়ীতন্তু বিস্তার করিয়া দিয়াছে। অক্ষি-তারকার সঙ্কোচন, চক্ষের

পলক ফেলা, লালা-নিঃসরণ, গলাধঃকরণ, বমন, উদ্গার তোলা, হাঁচি প্রভৃতি কার্যের প্রেরণা সুষুম্না-রজ্জুই প্রদান করে। সুষুম্না-রজ্জুর আরো গুরুতর কর্তব্য আছে। ইহার নিম্ন প্রান্তস্থ এক-একটি কেন্দ্র আমাদের মূত্রস্থালী (bladder), মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়কে সক্রিয় রাখে *। কটিদেশে মেরুদণ্ডের যে অংশ অবস্থিত, সেই অংশের মধ্যেই আমাদের "কামোদ্দীপক কেন্দ্র"। উহারই প্রেরণা বা প্রভাবে স্ত্রী-পুরুষ যৌনসম্মিলনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। একের লিঙ্গোত্থিত হয়, অন্যের ভগাঙ্কুর (Clitoris) ঈষৎ কঠিন হইয়া দ্রুত স্পন্দিত হয়; উভয়েই সঙ্গমকালীন্ বিশিষ্ট রস-নিঃস্রাবের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে।

কিন্তু কামোদ্দীপক কেন্দ্রের স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; সে তাহার সক্রিয়তার প্রায় সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী অনুমস্তিষ্কের উপর। অনুমস্তিষ্কের ইঙ্গিত না পাইলে সে বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারে না। রাত্রিকালে প্রস্রাবাধিক্যে মূত্রস্থালী পরিপূর্ণ হওয়ার ফলে অথবা জননেন্দ্রিয়ে সামান্য সুড়্‌সুড়ি বা হস্ত-বিলেপন দেওয়ার ফলে যে লিঙ্গোত্থান ঘটে, তাহা অবশ্য সুষুম্নারজ্জুর কামোদ্দীপক কেন্দ্রের সহায়তা ব্যতীত ঘটে না; কিন্তু তাহাতেই মানুষের অবশ্যম্ভাবীরূপে যৌনলিপ্সা বা শুক্রস্খালনের স্পৃহা জাগে না। যদি কখনো জাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—উহাতে অনুমস্তিষ্কের সম্মতি আছে। অনুমস্তিষ্কও আবার বহুক্ষেত্রে যৌনাবেগ প্রশমন-চেষ্টায় খোদ্ মস্তিষ্ক সাহেবের আজ্ঞাধীন। কারণ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও মুখ-মণ্ডলের স্পর্শজ্ঞান আহরণের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি; তদুপরি তাঁহারই শাসনে স্মৃতির ভাণ্ডার, পছন্দ-অপছন্দ, বিচার-বুদ্ধি, লিপ্সা, চিন্তা ও আবেগের মূল উৎস।

* দেহতত্ত্ব—ডাঃ শ্রীকার্তিকচন্দ্র বসু, এম-বি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২।

অন্তঃস্রাবী ও বহিঃস্রাবী গ্রন্থিনিচয়

এক্ষণে আমাদিগকে জানিতে হইবে, মস্তিষ্ক, অনুমস্তিষ্ক ও সুষুম্না-রজ্জু—কামের চিন্তা, ইচ্ছা ও উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আর কাহারো সাহায্যপ্রার্থী কি না! হ্যাঁ, উহারা কয়েকটি অন্তঃস্রাবী-গ্রন্থির সাহায্য না লইয়া পারে না। এখন এই গ্রন্থিগুলির সামান্য কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থি অর্থে শরীর-অভ্যন্তরস্থ শক্ত বা নরম ছোট-বড় থলি বিশেষ; উহার মধ্যে শরীর-বিধানের প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় নানাপ্রকার রস প্রস্তুত হয়।

আমাদের জিহ্বার আশে-পাশে তিন জোড়া লালাস্রাবী গ্রন্থি আছে। উহাদের মধ্যে একপ্রকার পাৎলা রস প্রতিনিয়ত সঞ্চিত ও মুখ-বিবরে নির্গত হয়। লালা-নির্গমনের জন্য প্রত্যেকেরই এক বা একাধিক সরু সরু নালী আছে। মুখের লালা আমাদের খাদ্যগ্রাসকে কোমল করিয়া দেয় ও এক জাতীয় খাদ্যকে আংশিকভাবে পরিপাক করে।...চর্ম-নিম্নে লক্ষ লক্ষ অতি ক্ষুদ্র ঘর্মগ্রন্থি আছে; লোমকূপের মধ্য দিয়া উহারা অবিরত শরীরের আবর্জনা-মিশ্রিত জল নিঃসরণ করিয়া দিতেছে।...যকৃতের গায়ে একটি ক্ষুদ্র চর্মময় গ্রন্থি আছে, ঐ থলির মধ্যে পিত্ত নামক একপ্রকার তিক্তকটু নীলাভ রস প্রস্তুত হয়। পিত্তরস একটি নল-সাহায্যে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম প্রান্তের মধ্যে ক্ষরিত হইয়া ভুক্ত খাদ্যের ঘৃত-তৈল-জাতীয় উপাদানকে পরিপাক করে, এবং মলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাহির হইয়া যায়। এইগুলি বহিঃস্রাবী গ্রন্থির দৃষ্টান্ত। ইহাদের প্রত্যেকেরই এক বা একাধিক রস-নির্গমনের নালী আছে বলিয়া, ইহাদিগকে 'সনালী গ্রন্থি-মালা' বলা যায়।

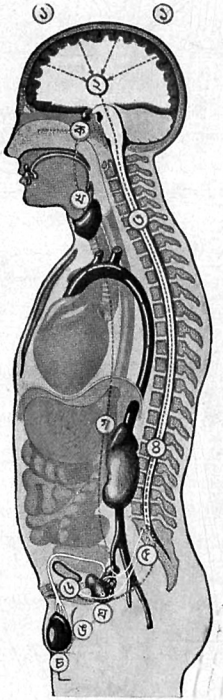

(ক) পার্শ্বতীর্থক, (খ) অবটু, (গ) অধিবৃক্কীয়, (ঘ) (ঙ) শুক্রাধার ও পৌরুষ গ্রন্থি, (চ) মূত্র।
(১) মস্তিষ্কের উপরিতল, (২) মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থল (৩) মেরুদণ্ড-মধ্যস্থ সুষুম্নারজ্জু (৪) কামোদ্দীপক ও শুক্রনিঃসারক কেন্দ্র
(৫-৬) যৌনেন্দ্রিয় অবধি বিস্তৃত অনুভূতি ও ক্রিয়াশক্তি-বাহী নাড়ীতন্তুসমূহ।

মনুষ্যদেহে কাম-নিয়ামক যন্ত্রাবলী (লম্বাকারে দ্বিখণ্ডিত)

Blank page (s)

কিন্তু অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলির আকারও একটু ভিন্ন এবং কাযও একটু বিভিন্ন রকমের। ইহাদের মধ্যে যে বিশিষ্ট প্রকার রস প্রস্তুত হয়, তাহা তৎসংযুক্ত কোনো নালী দিয়া নির্গত হয় না অথবা শরীরের নির্দিষ্ট কোন স্থলের মঙ্গল-সাধনের পর শরীর হইতে বাহির হইয়া যায় না। ইহাদের রস আপন-আপন গাত্র চুঁয়াইয়া বাহির হয় এবং সমগ্র দেহের রক্তস্রোতের মধ্যে মিশিয়া গিয়া, বিশেষ-বিশেষভাবে দেহকে প্রভাবান্বিত করে। ইংরাজী বৈদ্যকশাস্ত্রে এই অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলিকে বলা হয় 'ডাক্ট্‌লেস গ্ল্যাণ্ড্‌স্' বা 'এণ্ডোক্রাইন্স্'। ইহাদের নিজস্ব কোনো নালী নাই বলিয়া ইহাদিগকে 'নির্নালী গ্রন্থিমালা' বলিয়া অভিহিত করা চলে। আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের ব্যক্তিত্ব, আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কায়মনোগত বৃত্তিসমূহ, ভৌতিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মূলে রহিয়াছে এই রহস্যমণ্ডিত গ্রন্থিনিচয়*।

আমাদের দেহ-মধ্যে প্রায় ডজনখানেক অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি আছে। কিন্তু সবগুলির নাম করিয়া ও পরিচয় দিয়া নিরর্থক কতকটা স্থান নষ্ট করিতে চাই না। যেগুলি আমাদের প্রেম বা কাম-জীবনের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট, সেইগুলিরই একটু বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব। এইরূপ গ্রন্থি আমাদের শরীরে আছে চারিটি; যথা,—অবটু গ্রন্থি (Thyroid), পার্থতীর্থক গ্রন্থি (Pituitary), অধিবৃক্কীয় গ্রন্থিদ্বয় (Suprarenals or Adrenals), পুরুষের মুষ্কযুগল (Testes) ও স্ত্রীলোকের অণ্ডাশয়দ্বয় (Ovaries)।

* "যৌবনের যাদুপুরী"—দ্র. কু. বসু, পৃ. ১৯।

অবটু-গ্রন্থি

গ্রীবাদেশে শ্বাস-নালীর ঊর্ধ্বপ্রান্তে ক্ষুদ্র বর্তুলাকার অস্থি-ফলকের পশ্চাতে পরস্পর-সংলগ্ন দুইটি বৈঁচিফলের ন্যায় পিঙ্গলাভ রক্তবর্ণের বস্তু-পিণ্ডের নাম "অবটু-গ্রন্থি"। ইহার বিশিষ্ট অন্তঃস্রাবের নাম 'অবটিমা' (Thyroxin)। আমাদের দেহের খাদ্য-পরিপাক, পুষ্টি, বৃদ্ধি ও কতকগুলি রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অবটিমা-রস অনিবার্য। স্বভাবত যাহাদের অবটু-গ্রন্থি উপযুক্ত পরিমাণে অন্তঃস্রাব রক্তস্রোতে মিশ্রিত করিতে পারে না, তাহাদের কেশ বিরল, অথবা রুক্ষ ও খাড়া-খাড়া, দাঁতগুলি অসম, গাত্রচর্ম পুরু ও খস্‌খসে হয়। লোকগুলি অপেক্ষাকৃত হ্রস্বকায় ও তাহাদের অঙ্গুলির ডগাগুলি মোটা-মোটা হয়। ইহাদের মোটা বুদ্ধি, জড়তা, উদ্ভাবন-শক্তির অভাব, যৌন-ব্যাপারে উৎসাহহীনতা, নিদ্রালুতা প্রভৃতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত বিলম্বে ঋতুশোণিত দেখা যায় এবং অনিয়মিতভাবে ঋতুর আবির্ভাব হইতে থাকে।

যাহাদের অবটিমা প্রচুর পরিমাণে নিষিক্ত হয়, তাহাদের প্রচুর চিক্কণ কেশরাজীর উদ্গম, চর্ম কোমল ও মসৃণ, দন্তরাজী দুগ্ধধবল ও সুবিন্যস্ত এবং দেহ সহজে ঘর্মাক্ত হয়। অবটিমা-বহুল লোকগুলিকে ভাবোচ্ছ্বাস-প্রবণ, অভিমানী, সহজেই ব্যথা-কাতর, উদ্বেগ-মগ্ন, চকিতে কর্মচঞ্চল ও চকিতে নিরুৎসাহ হইতে দেখা যায়। তাহারা আকারে লম্বা ছিপ্‌ছিপে ও লঘুভার হয়; প্রায়ই অনিদ্রা, অজীর্ণ ও উদরাময়ে কষ্ট পায়। অত্যধিক অবটুগ্রন্থি-নিঃসৃত রস দুঃসাধ্য গলগণ্ড রোগের জন্ম দিতে পারে। দেহ-বিশেষে এক একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় অবটিমা-রস মানুষের প্রেম-জীবন,

যৌনানন্দ উপভোগের আগ্রহ ও ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। অবটুগ্রন্থি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের যৌনযন্ত্রাবলীর উপর আপন প্রভাব অধিকতর পরিচালিত করে *। স্ত্রীলোকের যৌবনাগমে, ঋতুস্রাব ও গর্ভধারণ কালে অবটুগ্রন্থি অধিকতর সক্রিয় উঠিয়াছে দেখা যায়।

পার্থতীর্থক গ্রন্থি

"পার্থতীর্থক গ্রন্থি" আকারে একটি পায়রা মটরের চেয়ে বড় হইবে না। আমাদের কর্ণদ্বয়ের উপরিস্থ মস্তকের হাড়ের ফলক ভেদ করিয়া সোজাসুজি মস্তকের মধ্যস্থলে গেলে, একটি অতিক্ষুদ্র অস্থিময় খিলানাকার গুহা পরিদৃষ্ট হয়; ঐ গুহার মধ্যে ধ্যানস্থ রহিয়াছে পার্থতীর্থক গ্রন্থি। এই গ্রন্থিটি আবার সম্মুখ-পশ্চাৎ হিসাবে দুই ভাগে বিভক্ত; একটির নাম 'পুরঃপিণ্ডক' (Anterior lobe), অন্যটির নাম 'পশ্চাৎপিণ্ডক' (Posterior lobe)। প্রত্যেক বিভাগ হইতে এক-একপ্রকার অন্তঃস্রাব প্রস্তুত হইয়া রক্তস্রোতে মিশ্রিত হয়।

পুরঃপিণ্ডক-নিঃসৃত রস যৌবনকাল পর্যন্ত আমাদের অস্থি ও তরুণাস্থিসমূহ, নাসাগ্র, ওষ্ঠ, জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি রীতিমত পুষ্ট করিয়া দেয়। এই রস যাহাদের কৈশোর-প্রারম্ভ হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে সঞ্জাত হইতে থাকে, তাহারা লম্বাচৌড়া চেহারাযুক্ত হয়, তাহাদের হাড়গুলি খুব মোটামোটা এবং তাহাদের লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ যথাতিরিক্ত পরিবর্ধিত হয়। পুরুষের মুষ্কে প্রচুর বীর্য ও শুক্রকীট জন্মিতে থাকে, তাহারা যৌবনের পূর্ব হইতেই যৌন-উপভোগের জন্য প্রচণ্ড আগ্রহশীল,

* American Journal of Anatomy— F. S. Hammeth, 32, July 15. 1923.

অগ্রবর্তী ও অন্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহাদের যৌন-স্পৃহা স্পষ্টত না কমিলেও সহবাস-ক্ষমতা রীতিমতো কমিয়া যায়। শরীরে অতিরিক্ত চর্বি বৃদ্ধি পায় এবং প্রস্রাবে শর্করা দেখা দেয়।

স্ত্রীলোকদের অণ্ডাশয় অকালে রীতিমতো পরিপুষ্ট হয়; তাহারা একটু শীঘ্র শীঘ্র রজোদর্শন করে এবং প্রেমিক-সঙ্গসুখ আকুলভাবে কামনা করে। ডাঃ অস্কার রিড্ল্ ইন্দুর ও পায়রার উপর পার্থতীর্থক গ্রন্থি-রসের ক্রিয়া সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষণ করিয়াছিলেন। খুব বাচ্ছা ইন্দুরের দেহে পার্থতীর্থক গ্রন্থির পুরঃপিণ্ডক-রস অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে কয়েকদিন যাবৎ অন্তঃক্ষেপ (injection) করিয়া তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, ইন্দুরগুলি বাহ্যভ্যন্তরিক যৌন-ব্যাপারে বেশ অকালপক্ক হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষ পায়রার রক্ত-মধ্যে এই রস প্রবেশ করানোর ফলে, তাহাদের যৌনেন্দ্রিয়ের ওজন ধীরে ধীরে সতেরো গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল *।

পশ্চাৎপিণ্ডকের রসও শরীর ধারণের পক্ষে একান্ত উপযোগী। উহা রক্তাধার, শিরা-ধমনীসমূহ, মূত্রস্থালী, অন্ত্র, প্লীহা, পাকস্থলী প্রভৃতিকে কর্মঠ রাখে, শরীরের তাপ ও রক্তের চাপ সর্বদা স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করে।'

অধিবৃক্কীয় গ্রন্থিদ্বয়

আমাদের কটিদেশে, পিঠের দিক ঘেঁষিয়া, মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে বৃক্ক নামক দুইটি যন্ত্র (Kidneys) অবস্থান করে। এই যন্ত্র দুইটির

* "Some Interrelations of Sexuality, Reproduction and Internal Secretion" by Oscar Riddle in **Journal of Americal Medical Association,** Vol. 92, No. 12.

প্রধান কার্য—শরীরের রক্তস্রোতকে পরিষ্কার করা ও খাদ্যের জলীয়াংশ হইতে কতকপরিমাণে আবর্জনা-মিশ্রিত জল মূত্ররূপে পৃথক করিয়া মূত্রস্থালীতে পাঠাইয়া দেওয়া। দক্ষিণবৃক্কের মাথায় হরিদ্রাভ বর্ণের একটি পানিফলের ন্যায় এবং বামবৃক্কের মাথায় বাদামের ন্যায় যে গ্রন্থিদ্বয় আছে, তাহাদেরই নাম অধিবৃক্কীয় গ্রন্থি। ইহাদের প্রত্যেকটি লম্বে দেড় ইঞ্চি ও প্রস্থে পঁউনে এক ইঞ্চির বেশি নয়। প্রতি গ্রন্থির উপরিতল বা বাহ্যাংশ হইতে এক প্রকার, এবং মজ্জা বা অন্তস্তল হইতে অন্য প্রকার অন্তঃস্রাব নির্গত হইয়া, শোণিতপ্রবাহে মিশ্রিত হয়।

দুইপ্রকার অন্তঃস্রাবের দুইপ্রকারের ক্রিয়া। উপরিতল-নিঃসৃত অন্তঃস্রাব কৈশোর-সমাগমে আমাদের যৌনবোধ প্রস্ফুটিত করে এবং যৌনযন্ত্রের রূপান্তর-সাধন ও কেশোদ্গম করে। যৌবন-কালেও ঐ রসের প্রভাবে মানুষ প্রেম ও প্রেমিক সম্বন্ধে চিন্তা ও মনন করিতে শিখে এবং মস্তিষ্ক ভালবাসার পাত্র-সম্বন্ধে কতকটা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের শক্তি পায়। গর্ভধারণ কালে ও ইতরপ্রাণীদিগের সঙ্গম-মর্ম্মের সময় অধিবৃক্কীয় গ্রন্থির বাহ্যাংশ বেশ স্ফীত হইয়া উঠে *। বাল্যকাল হইতে যাহাদের এই গ্রন্থির বাহ্যাংশের অন্তঃস্রাব অতিরিক্ত পরিমাণে ক্ষরিত হইতে থাকে, তাহাদের শরীরে অসম্ভবরূপ শক্তিবৃদ্ধি হয়, শরীর বেশ মাংসল ও মেদোবহুল হয়, জোড়া ভ্রূ জন্মে, দাঁতগুলি ঈষৎ চওড়া ও শ্বদন্ত দুইটি রীতিমতো প্রবর্ধিত হইয়া উঠে। স্ত্রীলোককে পুরুষের ন্যায় স্বভাবাপন্ন হইতে দেখা যায়; ভগাঙ্কুরটি (Clitoris) বৃদ্ধি পায়, গলার স্বর ভারি হয় ও অনেকের গোঁফ্ ও দাড়ির রেখা স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

* **Archives of Internal Medicine,** R. G. & A. D. Huskins, 1919, Vol. XVII, p. 584.

খুব বিলম্বে রজঃস্রাব সুরু হয় এবং পরবর্তীকালে অনিয়মিতভাবে ঋতু হইতে থাকে।

মজ্জা হইতে যে অন্তঃস্রাব নির্গত হয়, তাহাদ্বারা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার নিয়ন্ত্রিত হয়, পেশীসমূহের অবসাদ ও দুর্বলতা হ্রাস পায়, শরীরের তাপ কমিতে পারে না। মজ্জা-রস সাময়িকভাবে ঈষৎ অধিক পরিমাণে নির্গত করিয়া মানুষকে কার্যে অগ্রবর্তী ও আত্মরক্ষায় উদ্যোগী করিয়া তুলে; ইন্দ্রিয়গুলির অনুভূতি প্রখরতর করিয়া দেয়; বেদনা, ক্রোধ, ভীতি, সংশয়, আশা, আনন্দ প্রভৃতি আবেগগুলিকে স্ফুটতর করিয়া প্রকাশ করে। হঠাৎ মনোমত একটি নারীকে বা পুরুষকে দেখিয়া প্রেমিক যে তাহার প্রতি তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হয় ও তাহাকে লাভ করিবার বাসনায় উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে, তাহা এই অধিবৃক্কীয় রসেরই কৃপায়।

যৌনগ্রন্থিদ্বয়

এইবার আমরা খোদ্ যৌনগ্রন্থিগুলির আলোচনা প্রবৃত্ত হই। পুরুষের মুষ্ক বা অণ্ডকোষ ও স্ত্রীলোকের অণ্ডাশয়দ্বয়কে সাধারণভাবে "যৌনগ্রন্থি" (Gonads) নামে অভিহিত করা হয়। পুরুষের মুষ্ককে চলিত কথায় 'বীচি' (বীজের অপভ্রংশ) বলা হয়, এবং ইহাকে কেবল শুক্র-প্রস্তুতির কারখানা বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু শুক্র জিনিষটি হইল অণ্ডকোষের বহিঃস্রাব, কারণ উহাকে আমরা শোণিতের-সহিত-অমিশ্রিত অবস্থায় বাহিরে আসিতে দেখি। শুক্রের বিশেষ পরিচয় আমরা অতঃপর দিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে উহার অন্তঃস্রাবের স্বরূপ চিনিবার প্রয়াস করা যাক্।...."Leydig cells" নামক কতকগুলি ছিদ্রযুক্ত লম্বা

ভাঁজ-করা ছোট ছোট কোষের মধ্যে একপ্রকার অন্তঃস্রাব কিশোর-কাল হইতে তৈয়ারি হয় এবং উহা আমাদের রক্তস্রোতে মিশিয়া দেহে পুরুষোচিত যৌবন-লক্ষণগুলি পরিস্ফুট করিয়া তুলে।

ঐ অন্তঃস্রাবের কৃপায় পুরুষের গুম্ফ ও শ্মশ্রু উদ্গত হয়, অস্থি ও মাংসপেশীগুলি সুপুষ্ট হইতে থাকে, গলার স্বর ভারি হয়, বীর্যরস ও তন্নিহিত শুক্রকীট প্রচুর জন্মিতে থাকে, স্ত্রীজাতির প্রতি সুস্পষ্ট যৌন আকর্ষণ ও তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির আওতায় আনিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে, ধীশক্তি ও বাহিরের কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগেচ্ছা প্রগাঢ়ভাবে প্রকাশ পায় *।

যাহাদের শৈশব হইতেই মুষ্কগত অন্তঃস্রাব একটু অধিক মাত্রায় সঞ্জাত হয়, তাহাদিগের দন্তোদ্গম অপেক্ষাকৃত শীঘ্র হয় এবং কৈশোর না আসিতেই বগলে ও জননেন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বাংশে রোমোৎপত্তি হইতে থাকে। জননেন্দ্রিয় বয়সের অনুপাতে বড় হয় ও সকল বিষয়ে অতিপরিপক্কতার লক্ষণ দেখা যায় †।

স্ত্রীলোকের আসল যৌনগ্রন্থির অবস্থান হইল তলপেটের মধ্যে, আমাদের চক্ষুর অন্তরালে। ক্ষুদ্র ঘটাকার জরায়ুর উভয় পার্শ্বে সিদ্ধ চাউলের পিঠার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এক-একটি কোমল যন্ত্র অবস্থিত, যাহার নাম "অণ্ডাশয়"। পুরুষের অণ্ডকোষের মধ্যে যেমন শুক্রকীট জন্মে, স্ত্রীলোকের অণ্ডাশয়-মধ্যে সেইরূপ অণ্ডাণু (Ovum) জন্মে। প্রতি চান্দ্রমাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক-একটি অণ্ডাণু একদিকের অণ্ডাশয়ের পাৎলা গাত্রচর্ম ভেদ করিয়া, এক-একটি বিশিষ্ট নালীর মধ্যে

* "Internal Secretory Organs"—Biedl, pp. 397-98.

† "Orgenotherapy in General Practice", (Carnick), p. 138.

আনীত হয়। শুক্রকীটের সহিত স্ত্রীলোকের অণ্ডাণু মিলিত হইলেই গর্ভোৎপত্তির সূচনা হয়। কিন্তু সে কথা পরে বলিব; এক্ষণে অণ্ডাশয়ের অন্তঃস্রাবের কথায় আসি।

অণ্ডাশয়ের অন্তঃস্রাব একাধিক আছে বলিয়া দেহ-বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন। যাহা হউক, এই অন্তঃস্রাবগুলি কৈশোরে স্ত্রীসুলভ সকল প্রকার কায়িক ও মানসিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী। বালিকার স্তনদ্বয় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে, প্রতি আটাশ দিন অন্তর রজোস্রাব হইতে থাকে, অণ্ডাশয়ের উপরিতলে মধুকোষ-বৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে অণ্ডাণুসকল নিয়মিতভাবে বিকাশ-লাভ করিতে থাকে, জরায়ু বেশ ফাঁপিয়া উঠে. গলার স্বর মিষ্ট ও তীব্র হয়। ক্রমে পছন্দসই যুবাপুরুষ দেখিয়া সলজ্জতার আভাস অথচ তাহাকে কাছে পাইবার আকাঙ্ক্ষা, তাহার নিকট নিজের গুণপনা দেখাইবার ও তাহার মুখ হইতে স্তুতিবাদ শুনিয়া প্রীত হইবার গোপন ইচ্ছা···ইত্যাদি নানা অভিনব ভাব জাগ্রত হয়।

কোনো যুবতীর দেহ হইতে অণ্ডাশয়দ্বয় কাটিয়া বাদ দিলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঋতুশোণিতস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, জরায়ুও শুষ্ক সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়, যোনিদ্বার গুটাইয়া আসে, স্তনদ্বয় চুপ্‌সাইয়া সমতল হইয়া পড়ে, দেহ পুরুষোচিত স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। তাহার গলার স্বর বদ্‌লাইয়া যায়; নির্লজ্জতা, অতিসাহস ও গৃহস্থালিকর্মে বিতৃষ্ণা, পুরুষের ন্যায় চলা ও বলার ভঙ্গী প্রকাশ পায় *। প্রফেসর স্টাইনাক্, লিপ্‌সাৎস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়া দিয়াছেন যে, কোন পুরুষলোকের অণ্ডকোষ কাটিয়া লইয়া, তৎস্থলে যদি স্ত্রীলোকের অণ্ডাশয়ের খানিকটা

* "Gynecology"—Graves, 2nd Edn. 1921.
"Endocrinology"—Novak, 1922.

কলম করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির দেহ-মনে প্রায় চৌদ্দ আনা রকমের স্ত্রী-সুলভ বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে †।

যাহা হউক, এই স্থলে একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়া যাই যে, অবটু, পার্থতীর্থক ও অধিবৃক্কীয় গ্রন্থিগুলির রস রক্তাস্রোতে মিশিয়া, মুখ্যত যৌনগ্রন্থিগুলিকে ও গৌণত মস্তিষ্ক ও অনুমস্তিষ্ককে প্রভাবান্বিত করে। প্রথমোক্ত তিনটি রসের অপ্রাচুর্য ঘটিলে, যৌনগ্রন্থি হাজার সক্রিয় হইয়াও আশানুরূপ ফলদায়ক হইতে পারে না।

† "Arch. fur Entwicklungemech. d. Organ," Liepzig, 1918, Vol. XLIV.

পঞ্চম পটল

প্রেমের আদ্য আদর্শ ও পরিণতি

পূর্বেই বলিয়াছি, মানুষের প্রেম-জীবন আরম্ভ হয়, তাহার শৈশব-কাল—তথা জন্মদিন হইতে। এই কথাটি বোধ হয় না বলিলেও চলিবে যে, সে প্রেম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা-বোধশূন্য ও ইন্দ্রিয়গত হইলেও যৌনাবেগ বা যৌনলিপ্সা-বর্জিত। নব্য মনোবিকলন-গুরু সিগ্‌মুণ্ড্ ফ্রয়েড্ ও তাহার চিন্তা-চতুষ্পাঠী কিন্তু ইহার মধ্যেও অসংহত ও অস্পষ্ট যৌন এষণার ছায়া প্রতিফলিত দেখিতে পাইয়াছেন; কিন্তু আমরা ততদূর অগ্রসর হইতে চাহি না। এক্ষণে শিশু-মনে ভবিষ্যৎ প্রেমের আদর্শ কিভাবে গঠিত হয় এবং পরবর্তী জীবনের ব্যক্তিগত প্রবণতা, পছন্দ-অপছন্দ ও রুচির প্রথম উৎস কোথায় উৎপন্ন হয়, তাহা লইয়া একটু আলোচনা করা যাক্।

কিন্তু তৎপূর্বে আধুনিক মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ মন সম্বন্ধে যে অমূল্য ও অবিসম্বাদিত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহারই চুম্বক-সার দুই-চারি কথায় ব্যক্ত করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। উঁহারা অখণ্ড মানস-সত্তাকে তিনটি সেরেস্তায় বিভক্ত করিয়াছেন। একটির নাম নির্জ্ঞাত বা অচেতন মনোবিভাগ, ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'আন্‌কন্‌শাস্ মাইণ্ড্'। আর একটির নাম অন্তর্জ্ঞাত বা অবচেতন মনোবিভাগ; উহার

ইংরাজী নাম 'সাব্‌কনশাস্ মাইণ্ড্'। তৃতীয়টির নাম সংজ্ঞাত বা সচেতন মনোবিভাগ, ইংরাজী অভিধায় যাহাকে বলে 'কন্‌শাস্ মাইণ্ড্'। আসংজ্ঞাত বা 'সুপার কনশাস্' নামক আর একটি মনোবিভাগের সন্ধানও সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণ আমাদিগকে দিয়াছেন, কিন্তু সেটিকে আপাতত আমাদের আলোচনার এলাকায় না আনিলেও চলিবে।

নির্জ্ঞাত মন

নির্জ্ঞাত মন প্রায় আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে; ইহার কার্যকলাপের হদিশ্ আমরা সচরাচর পাই না। কেবল যখন মাঝে-মাঝে কোন অজ্ঞাত কারণে দয়া করিয়া ইনি অল্পাধিক বিকৃত ও অদ্ভুত রূপে একটু-আধটু নিজের ইচ্ছা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনোলোকে পাঠাইয়া দেন্, তখনই আমরা জানিতে পারি—ইনি আছেন। যে সকল সহজ প্রবৃত্তি ও সংস্কার লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি, সেইগুলি দিয়াই এই নির্জ্ঞাত মনোভবনের প্রথম ভিত্তিপত্তন হয়। আত্মরক্ষা, আত্মবিস্তার, শত্রুর প্রতি ঘৃণা, শত্রু হননের ইচ্ছা, ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রাসক্তি, ভয়-কাতরতা প্রভৃতি আমাদের সহজ প্রবৃত্তি। জন্ম-মুহূর্ত হইতে আমরা প্রত্যেকেই আত্মকামী অর্থাৎ আত্মভোগ-পরায়ণ, ঘোরতর স্বার্থপর। নিজের সুখের জন্যই পরের মুখের দিকে চাহি; আমার সুখের পথে যে প্রতিবন্ধক, তাহাকে শত্রু বলিয়া গণ্য করি।

শৈশবে যে সকল ইচ্ছা বাস্তব উপাদান-লাভের জন্য ব্যগ্র হয়, সেগুলিকে পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগ্নীর শাসন অবদমিত করে; তাহারা নির্জ্ঞাত মনের কোণে গিয়া চুপ্ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া, বাহিরে প্রকাশ

পাইবার সুযোগের অপেক্ষা করে। শিক্ষক, গুরু, বন্ধুর উপদেশ, সমাজ ও কৃষ্টির দাবি এই প্রবৃত্তিগুলিকে আরো দাবাইয়া ফেলে। শৈশবে যে সকল উদ্ভট কল্পনা প্রায়ই আমাদের মনে জাগিত, যে সকল অদ্ভুত অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত বিক্ষোভের তরঙ্গ তুলিত, সেগুলিকে আমরা অতি সহজে ভুলিয়া যাই। যাহাদের কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্য ভালবাসিয়াছিলাম বা ঘৃণা করিয়াছিলাম, বাহ্য-জগতের চাপে পড়িয়া, তাহাদের নাম, তাহাদের চেহারা, তাহাদের সংজ্ঞা পর্যন্ত বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া যায়। 'ভুলি' মানে, সংজ্ঞাত মন হইতে ওই ভাব, ইচ্ছা ও আবেগগুলিকে অন্তর্জ্ঞাত মনের সেরেস্তায় পাঠাইয়া দিই। অন্তর্জ্ঞাত মন আবার সেগুলিকে একটু নাড়া-চাড়া করিয়া পাঠাইয়া দেয় নির্জ্ঞাত মনের মণিকোঠায়। সেইখানেই এই অনাদৃত, অসম্পূর্ণ ও অপূরিত বাসনা ও চিন্তাগুলি থাকে আজীবন সযত্নে রক্ষিত। তাহারাই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পছন্দ-অপছন্দ, স্নেহ-প্রেম, দয়া-দাক্ষিণ্য সম্বন্ধে পাত্র ও ক্ষেত্র নির্বাচনে অসাক্ষাৎভাবে সাহায্য করে।

অন্তর্জ্ঞাত মন

অন্তর্জ্ঞাত মন আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডার, সংজ্ঞাত ও নির্জ্ঞাত মনো-বিভাগের সেতুস্বরূপ। এক সতর্ক প্রহরী ইহার ঘাঁটি আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছে; অসৎ, অভব্য, অসামাজিক, অনিষ্টকর কামনা ও ভাবনাগুলিকে সংজ্ঞাতের সেরেস্তায় সে কিছুতেই আসিতে দেয় না, অথবা সংজ্ঞাতের মধ্যে এইরূপ আপত্তিকর চিন্তার উদ্ভব হইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ নির্জ্ঞাতের অচলায়তনের মধ্যে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিতে চেষ্টা করে।

সংজ্ঞাত মন

সংজ্ঞাত মনোবিভাগকে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মন বলিয়া জানি। জগতের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ লইয়া ইহার কারবার; বাহির হইতে অনুভূতি পাওয়া ও ভিতর যথাবিহিত কর্ম-প্রেরণা দেওয়া হইল সংজ্ঞাত মনের নিত্যকার কর্ত্তব্য। ইহা আবার অনেকটা আড়কাঠির আফিসের মতো কাজ করে; দেশ-বিদেশ হইতে কুলি সংগৃহীত হইয়া এখানে পৌছিবামাত্র উহারা চা-বাগানে চালান্ হইয়া যায়, অর্থাৎ অনুভূতি ও অনুভাবগুলি সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জ্ঞাত মনোবিভাগে প্রেরিত হয়। যে অভিজ্ঞান বারবার আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হয়, অথবা যাহা আমাদের আনন্দদায়ক ও ইষ্টকর বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহাকে সহজে আমরা ভুলি না; বিনা অথবা অল্প আয়াসেই অন্তর্জ্ঞাত মনোবিভাগের রেকর্ড্-আফিস্ হইতে আমরা তাহার ফাইল্ খুঁজিয়া বাহির করি।

বাল্যকালের বহুতর অসম্পূরিত, অবদমিত খেয়াল্ ও ভাবনা আমাদের নির্জ্ঞাত মনে তো লুকাইয়া থাকেই, তাহা ছাড়া প্রথম জীবনের কষ্টকর ও দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতার ছবিগুলিও ধীরে ধীরে এইখানে আসিয়া বাসা বাঁধে। অতীত দুঃখের পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা আমরা বড় শীঘ্র ভুলিয়া যাই; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নাতিবৃহৎ দৈন্যক্লেশের কথা ক্রমশ আমাদের মন হইতে মুছিয়া যায়। সত্য সত্যই সেগুলির স্মৃতি কিন্তু মহাশূন্যে মিলাইয়া যায় না, সেগুলি স্তরে স্তরে জমা থাকে আমাদের নির্জ্ঞাত মনের নিরুদ্ধ গর্ভগৃহে। একটা উপলক্ষ পাইলে, মানস-প্রহরীর একটু অসতর্কতা দেখিলে, তাহারা একটা বিকৃত,

বিসদৃশ রূপ—হয়তো একটা অভাবনীয় ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সংজ্ঞাতের রাজ্যে পলাইয়া আসে। তাহাদের তখন সহজে চেনা যায় না, আবির্ভাবের কারণও বুঝা যায় না। কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিকগণ একটু চেষ্টা করিলেই উহার রহস্যভেদ করিতে পারেন *।

শিশুর মন

শৈশব-মনোবিশারদগণ শিশুর মনকে বলেন—a *tabula rasa*, a tablet upon which nothing is written. আরো একটু সহজবোধ্য করিয়া বলিতে গেলে বলা উচিত যে, শিশুর মন যেন কতকগুলি মশলা-মাখানো ফটো-প্লেট্ অথবা অজস্র ফিঁতালি (film) সমন্বিত ক্যামেরা। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহার মানস ক্যামেরার পাঁচটি স্ন্যাপ্‌শট্ লইবার লেন্স্ বিশেষ। যেই বাহ্য জগতের এক-একটি বস্তু ও ব্যাপারের সহিত ঘটে তাহার সংস্পর্শ, অমনি তাহার প্রতিরূপ আসিয়া আলো-ছায়ার সুষমা-ব্যঞ্জনায় ফুটিয়া উঠে তাহার সেই প্লেট্-গুলিতে বা ফিঁতালির গায়ে। ফোকাসের তারতম্যে, দূর-নৈকট্যের ব্যবধানে, উপর্যুপরি একই রূপ প্রতিভাসের ফলে, কোন চিত্র হয় স্পষ্ট, কোনটি অস্পষ্ট, কোনটি বা অতিস্পষ্ট †।

শিশুর জন্মাবধি পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার যে চিত্রগুলি তাহার মনের পটভূমিকায় গৃহীত হয়, সেইগুলিই তাহার

* "ঘুণার পঙ্কে প্রেমের পঙ্কজ"—নৃ. কু. ব., 'বাতায়ন,' শারদীয়া সং, ১৩৪৩, পৃ. ৯৮।

† "মনোবিজ্ঞানালোকে আদুরে দুলাল"—নৃ. কু. ব. 'কিশলয়', শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃ. ২৩৭-৩৮।

জীবনের আদ্যজ্ঞানের পুঁজি ও পরবর্তী জ্ঞানার্জনের আদর্শ। ইহারই দ্বারা অনেকাংশে তাহার পরবর্তী জীবন—তথা জীবনের স্পৃহা ও বিতৃষ্ণা, আবেগ ও অনুরাগ, উদ্যম ও আশা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই শিশুর স্বভাব ও মনোবৃত্তির একটা স্পষ্ট নমুনা (pattern) তৈয়ারি হইয়া যায় *। পরবর্তী চারি-পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে এই নমুনায় একটু ঘষামাজা অথবা উহার যৎসামান্য রূপান্তর-সাধন চলিতে পারে। তারপর মনোবৃত্তির প্রকৃত পরিবর্তন দুঃসাধ্য। চারাগাছ তখন মাটিতে এমন করিয়া মূল গাড়িয়াছে যে, তাহার উৎপাটন অসম্ভব।

সদ্যোজাত শিশু তাহার প্রথম অভিজ্ঞতার উৎসমূল পায় কোথায় —কাহার নিকট? অবশ্যই গৃহে, পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট। যতদিন সে একমাত্র মাতৃস্তন্যের উপর নির্ভর করে, ততদিন সে মাতাকেই ডাল করিয়া চিনে। নিজের সুখ, সুবিধা ও তৃপ্তির মধ্য দিয়াই শিশু-মনে প্রথম ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয়। মাতার স্তন্য-দানও একেবারে নিঃস্বার্থপরতা-প্রণোদিত নহে, উহার মধ্যেও তাঁহার একটা কায়িক পুলক ও অতল আত্মপ্রসাদের ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যত দিন যায়, শিশু পিতামাতাকে তত পূর্ণতররূপে দেখিতে পায়; এবং ইহাদের মূর্তিই তাহার মানসসত্তায় চিরকালের জন্য মুদ্রিত থাকিয়া, অন্তরাল হইতে জীবনের সর্ব কর্ম, জ্ঞান ও প্রেমের উপর প্রভাব নিক্ষেপ করে। শিশুর প্রতি পিতামাতার আচরণ, পিতা ও

* "Experiences Concerning the Psychic Life of the Child"—Tr. by A. A. Brill in the **American Journal of Psychology**, April, 1910.

মাতার পরস্পরের মধ্যে ব্যবহার—শিশুর ভবিষ্যৎ গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন-যাপনের একটি প্রধান নিরীখ্ হইয়া পড়ে *।

পুত্র-কন্যার একদেশদর্শী আত্ম প্রেম

মনোবিশ্লেষকগণ বিশেষ পর্যবেক্ষণের ফলে আর একটা বিস্ময়কর তথ্যও আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মাতৃস্তন্য পরিত্যাগ করিবার পর হইতে শিশুপুত্র মাতাকে ও শিশুকন্যা পিতাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে শিখে; পরন্তু মনের গোপনতম কোণে নিজেরই অজ্ঞাতসারে পুত্র তাহার পিতাকে ও দুহিতা তাহার মাতাকে অল্পাধিক বিরাগ করিতে থাকে এবং এই বিরাগের একটা উপযুক্ত হেতুবাদও তাহার কোমল মন গঠন করিয়া লয়। সংজ্ঞাত মনে এই বিরাগের ভাবকে সহজে বাসা বাঁধিতে না দিলেও অনেক সময় আপনা-আপনি পুত্রের চিন্তারাজ্যে পিতার মৃত্যু-ইচ্ছা ও কন্যার মনে জননীর মৃত্যু-ইচ্ছা জাগিয়া উঠা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে উহাকে দমন করা ও তজ্জন্য অনুশোচনা করাও খুবই স্বাভাবিক †। বাংলার—তথা জগতের শতকরা পঁচানব্বইটি সংসারে ছেলে মায়ের বেশি বাধ্য, ও মেয়ে বাপের বেশি অনুগত দেখা যায়। প্রতীয়মানত হয়ত অন্য

* "Symbole und Wandlungen der Libide"—Jung, (Gahrbuck fur Psychoanalyse, Vol. II.)

† (1) "Three Contritutions to the Sexual Theory"—S. Trued Translated into Eng, by A. A. Brill.

(2) "Further investigation shows that children do not always, love their parents as is commonly supposed, but very oftan hate one of them."—A. A. Brill in Psychanalysis, P. 254.

পক্ষের প্রতি একটা ভক্তির ভাব বজায় থাকে, কিন্তু সেটা সভ্যতার খাতিরে চর্মের উপরকার পোষাকি আবরণ—মর্মের সত্যকার বস্তু নয়। পিতা ও মাতার মধ্যে কোন বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক বা ঝগড়া-ঝাঁটি হইলে, প্রায়শ দেখিবেন, পুত্র আন্তরিকভাবে মাতার, এবং কন্যা পিতার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে!

যে শিশুপুত্র বাল্যে মা হারায় অথবা যে মাতা তাহার জন্মের পর হইতে প্রায়শ অসুখে ভুগিতে থাকেন, তাহাদের কেহ কেহ বাপের অত্যধিক আদর পাইয়া হয়তো তাঁহাকেই সব ভালবাসাটুকু বণ্টন করিয়া দেয়। কিন্তু উত্তরকালের প্রেম-জীবনে তাহার ফল অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিষময় হইতে পারে।...

আবার কোনো কোনো মাতৃহারা পুরুষ-শিশু ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমা, অথবা কাকিমার কোলে-কাঁখে মানুষ হইতে হইতে, তাঁহাকেই আত্মপ্রেমের আদর্শস্থানীয়া করিয়া লয়। কেহ কেহ বা মাতার জীবিতাবস্থায়ই উপরি-উক্ত আত্মীয়-স্বজনের একজন বা ততোধিকের মধ্যে তাহার গভীরতম ভালবাসার কতকাংশ সমর্পণ করে। যে বা যাহারা তাহাকে আদর-যত্ন করে, কোলে করে, চুমু খায়, খেলনা দেয়, ক্ষুধার সময় খাইতে দেয়, গরমের সময় পাখার বাতাস করে, শাসনের হাত হইতে রক্ষা করে, শিশু তাহাকে বা তাহাদিগকেই ঘনিষ্টভাবে চিনে ও সব চেয়ে বেশি ভালবাসে। সকৃতজ্ঞ শিশু-মন এইরূপ আদর-যত্নকারীদের ছবি নির্জ্ঞাত বা সংজ্ঞাত মনোবিভাগের উচ্চতম বেদীতে স্থাপন করিয়া আজীবন পূজা করিয়া থাকে।

যে সকল শিশুপুত্র মাতা ব্যতীত বড়বোন, দিদিমাতা, ঠাকুরমা প্রভৃতির নিকট হইতে, অথবা যে সকল শিশুকন্যা পিতা ব্যতীত বড়ভাই,

দাদামহাশয়, ঠাকুরদাদা প্রভৃতির অতিরিক্ত আদর-যত্ন লাভ করে, তাহাদের মনে ইঁহাদের সকলের রূপ ও গুণের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি একত্র সংশ্লিষ্ট হইয়া, যৌবনের অনাগত প্রেমিকের একটি নক্সা প্রস্তুত করিয়া ফেলে।

শিশুর ভেদবুদ্ধিহীন ভালবাসা

ভালবাসা সম্বন্ধে শিশুর ভেদ-বুদ্ধি নাই। রক্তের সম্পর্ক, জাতির বিচার, সামাজিক উচ্চতা-নীচতার বোধ তাহার না থাকাটাই স্বাভাবিক। যে সকল শিশুকে ধাত্রীতে মানুষ করে, তাহারা মাতা অপেক্ষা ধাত্রীকেই বেশি ভালবাসে। আবার যে সকল শিশুকে বিলাসিনী মায়ের কোল অপেক্ষা দাসীর কোলকে নিবিড়তরভাবে চিনিতে হয়, তাহারা দাসীরই অধিকতর অনুরক্ত হইয়া পড়ে *। উচ্চবংশীয়া অপেক্ষা নীচ বংশীয়ের প্রতি, সুরূপা অপেক্ষা কুরূপার প্রতি, আত্মীয় অপেক্ষা পরের প্রতি এই সকল শিশুর একটা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আসক্তি মনের অন্তস্তলে দুর্মোচ্য ছাপ লাগাইয়া দেয়। উত্তরকালের প্রেম-জীবনে ইহার পরিণতি কিন্তু রীতিমত কদর্য আকার ধারণ করিতে পারে। ইহার দুই-একটি উদাহরণ পরে দিব।

যাহাহউক, আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিশুপুত্র সর্বপ্রথম তাহার মাতা, নচেৎ কোন নিকট-আত্মীয়া অথবা দাসীর প্রতি

* "The child loves indiscriminately, unmindful of the barriers of blood relationships. It loves the wet-nurse more than the mother, or it loves the house-keeper more than the father if it be thrown into contact with these persons more than with its parents."—**Frigidity in Woman** by W. Stekel, Vol. I, p. 36 (Boni & Liveright.)

তাহার প্রথম গভীর ভালবাসা অর্পণ করে; এবং শিশুকন্যা সর্বপ্রথম তাহার পিতা, নচেৎ কোন আত্মীয় অথবা কোন ভৃত্যের প্রতি তাহার আদ্য প্রেম সমর্পণ করে। ইহাদেরই আকৃতি-প্রকৃতি-রূপ-গুণ ও চারিত্রিক্ বৈশিষ্ট্য দিয়া গঠিত হয়—তাহাদের প্রেমের প্রাথমিক আদর্শ বা ভালবাসার 'আদ্‌রা'।

বাহ্যজগতের প্রভাব

শিশু যত বড় হইতে থাকে—যতই সে গৃহ-গণ্ডীর বাহিরে বৃহত্তর জগতের সহিত পরিচিত হইতে থাকে, ততই সে পিতামাতার প্রত্যক্ষ যত্ন-আপ্যায়ন ও প্রভাব হইতে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যায়। হয়তো আর একটি সন্তান জন্মিয়া তাহার সাক্ষাৎ ভালবাসার অনেকাংশ গ্রাস করিয়া বসে। শিশুর ভালবাসাও বাহিরের সঙ্গী, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর উপরও কতকটা বর্ষিত হয়। ইহার ফলে সুস্থ বালক-বালিকার মনোমুকুরে পিতা, মাতা বা তাহার অন্য কোন আদ্য প্রেম-পাত্রের প্রতিচ্ছবি মলিন হইতে মলিনতর হইতে থাকে। সংজ্ঞাত মনে যে ছবি মলিনতর হয়, নির্জ্ঞাত মনোনভে তাহা স্ফুটতর হইয়া উঠে,—ইহাই মনস্তত্ত্বলোকের স্বাভাবিক নিয়ম। প্রেম ও প্রেমিক সম্বন্ধে যে জ্ঞানটুকু তাহারা শৈশব হইতে পোষণ করিতেছিল, যৌন জাগৃতির ছোঁয়াচ্ পাইয়া ও সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষার হাওয়া লাগিয়া সে জ্ঞানটুকু তাহারা ইন্দ্রিয়গত মন হইতে মুছিয়া ফেলে, এবং সম্পূর্ণ নূতন ছবি আঁকিতে চেষ্টা করে।

তারপর অশিষ্টতার জন্য তিরস্কার, ভব্যতা শিখিবার কড়া তাগিদ, লেখাপড়ায় মনোযোগ দিবার জন্য উপদেশের পাশুপতাস্ত্র কিংবা অন্য ছেলেমেয়েদের সহিত কলহ-ব্যাপারে তাহাকে প্রায়শ দোষী সাব্যস্ত করার

প্রচেষ্টায় পুত্র বা কন্যা বুঝিতে পারে যে, পিতামাতার স্নেহামৃত, যে কারণে হোক্ বা যে করিয়া হোক্, তরল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ধীরে ধীরে একটা ধ্রুব বিশ্বাস বর্ষীয়ান্ শিশু-মনে জাগ্রত হয় যে, পিতামাতার ভালবাসা শুধু তাহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়াই গঠিত হয় নাই এবং তাহার ভালবাসা শুধু একমাত্র পিতামাতার মুখাপেক্ষী করিয়াই গড়িয়া তুলিলে চলিবে না। সুতরাং সে বহির্মুখী হয়; ঘাটের তরী তখন বাঁধন ছিঁড়িয়া মাঝ-দরিয়ায় গা-ভাসান্ দেয়। এমনিভাবে ক্রমবর্ধিষ্ণু মানব তাহার ভালবাসাকে কেন্দ্রবিমুখ করিয়া তাহার বিস্তার সাধন করে।

শৈশবানুবন্ধ

এতৎস্বত্বেও কিন্তু মনের নিভৃততম প্রকোষ্ঠ অর্থাৎ নির্জ্ঞাত মন হইতে পিতামাতার প্রতীক সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় না। উহা অন্তরাল হইতে সমগ্র জীবন ভরিয়া সন্তানের কার্য ও চিন্তাধারার উপর, তাহার প্রেম ও বিরাগের উপর, তাহার আচার ও আচরণের উপর একটু-না-একটু প্রভাবের ছোঁয়াচ্ লাগাইয়া দেয় *।

যাহারা পিতা-মাতা বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের নিকট আশৈশব শুধু শাসনহীন সমাদর ও সস্নেহ প্রশ্রয় পায়—তাহারা প্রেমের আদ্য

* "(1) Thus a father image and a mother image remain permanently engraved in the mind and act as standards for estimation of men and women that later enter into this person's life...The ideal is not eliminated, but repressed into the unconscious and there it continues to exert its influence through the whole life of the individual." —A. A Brill, **Op. Cit.,** pp 254-55. (2) "A Few Remarks on the Technique of Psychanalysis,"—**Medical Review of Reviews,** April, 1912. (3) **W. Stekel,** Op. Cit. p. 38.

আদর্শকে সারা জীবন এমনভাবে আঁকড়াইয়া থাকে যে, উত্তরকালে তদনুযায়ী প্রেমের পাত্র বা পাত্রী লাভ না করিলে বিবাহ করে না, নতুবা বিবাহ করিয়া কদাচিৎ সুখী হইতে পারে *। তথাকথিত অতি-মাতৃভক্ত সন্তান বা পিতৃস্নেহ-গর্বিতা কন্যা, মাতা বা পিতা ছাড়া আর কাহারও ভালবাসাকে বড় করিয়া দেখিতে পারে না এবং সে ভালবাসাকে চিরকাল সন্দেহ ও তুলনামূলক তীব্র সমালোচনার চক্ষে দেখে।

কোনো কোনো সংসারে আমরা দেখি যে, পুত্র মাতার প্রতি সামান্য অবহেলায় নববধূর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে। মাতা হয়তো লোক-লজ্জার খাতিরে মৌখিক একটা আপত্তির সুর তুলিলেও তাঁহার প্রতি পুত্রের অবিচলিত নিষ্ঠা দেখিয়া মনে মনে গভীর তৃপ্তি লাভ করেন। পাড়া-প্রতিবেশী সকলের নিকট বধূ 'কুললক্ষ্মী' বলিয়া গণ্য হইয়াও এবং পতিদেবতার প্রতি অনুরাগের সহস্র বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় দিয়াও, বেচারী স্বামীর মন পায় না। কেন?—ইহার উত্তর দিতে পারে হয়তো নির্জ্ঞাত মন, যে তাহার গর্ভগৃহে শৈশব প্রেমের অম্লান সংসক্তির ছবি লুকাইয়া রাখিয়াছে। ঐ ছবিই এইরূপ অহেতুক প্রেমবৈরাগ্যের প্রেরণা যোগায়।

স্নেহের সহিত উপযুক্ত পারিবারিক শাসনের মধ্যে মানুষ হয় যাহারা, শৈশব হইতেই যাহারা বুঝিতে শিখে যে, ভিতর অপেক্ষা বাহিরের

* "Such parental influences may often be strong enough to inhibit materially the individual's relations to the other sex. Thus too much and prolonged affection on the part of the mother is apt to cause an undue conscious or unconscious attachment to the parents, and thus prevent the child from going through the various stages of psycho-physical development."—**A. A. Brill,** Op. Cit., p. 250.

আকর্ষণই তাহাদিগের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাকে প্রলম্বিত করিয়া দিবে, তাহারা শৈশবের প্রেমাস্পদের কল্পিত আদর্শকে অনেকখানি খর্ব করিয়া, কৈশোর হইতে স্বাধীনভাবে নবীন রূপে তাহার যৌন-প্রেমের আদর্শ গড়িয়া তুলিতে পারে। কিন্তু তথাপি শৈশবানুবন্ধের (infantile fixation) স্মৃতিমার মধ্য হইতে দুই-চারিটা বিস্মৃত রেখা চুপি চুপি আসিয়া এই নূতনতর আদর্শের মধ্যে মিশিয়া পড়ে। ওই তথাকথিত পারিবারিক প্রভাব-নির্মুক্ত যুবক-যুবতীগণ হয়তো পিতামাতার রূপের ঠিক বিপরীত রূপসম্পন্ন কোন যুবতী বা যুবককে তাহার প্রেমের যথার্থ আদর্শ বলিয়া সাব্যস্ত করে। তথাপি পিতামাতার একাধিক গুণ তাহারা প্রেমাস্পদের মধ্যে সংবিষ্ট দেখিতে চাহে, নচেৎ তাহারা ভালবাসিয়া পূরাপুরি তৃপ্ত হইতে পারে না। যাহারা শিক্ষিত ও ভাবাবেগপ্রবণ, তাহারা অনেক সময় আদ্য আদর্শ হইতে সামান্য অপকৃষ্ট পত্নী লইয়া সুখী হইতে পারে না।

স-বাবুর উদাহরণ

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই গুরুতর বিষয়টির উপর একটু ভালো করিয়া আলোক-পাত করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি।...

একটি আটাশ বৎসর বয়স্ক, জাতীয়তা-ভাবাপন্ন, রূপবান গ্র্যাজুয়েট্ যুবক স্কুলে শিক্ষকতা করে। তাহার নাম, ধরুন, স-বাবু। তাহার জন্য পিতামাতা বহু সন্ধান করিয়া একটি পরমসুন্দরী মোটামুটি শিক্ষিতা যুবতী-কন্যাকে বধূরূপে গৃহে আনিলেন। কিন্তু যুবকটি তাহাকে অবহেলা করিতে লাগিল; এমন কি, সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া তাহার সহিত ঝগড়া বাধাইতে লাগিল। শেষে সে

= সত্তর

একদিন পিতামাতার নিষেধ স্বত্বেও তাহাকে পিতৃ-গৃহে রাখিয়া আসিল। মাস দুই বাদে লোক-পরম্পরায় শুনা গেল, যুবকটি কোনো মধ্যবয়স্কা নার্সের গৃহে ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছে। অবশেষে কাহারো জানিতে বাকি রহিল না যে, স-বাবু তাহার প্রেমে পড়িয়াছে। কালক্রমে স-বাবু প্রকাশ্যে তাহাকে লইয়া চিত্র-ভবনে যায়, তাহার গৃহে রাত্রি-যাপন করিতেও দ্বিধা করে না। দুই একজন ঘনিষ্ট সমব্যথীর নিকট সে অকপটে ব্যক্ত করিল যে, লোকচক্ষে কথিত নার্সটি কালো, কুৎসিতা হইলেও সে তাহার অন্তরের মধ্যে যে মহিমময় আলোক দেখিয়াছে, তাহাতে সে মুগ্ধ হইয়াছে—অভিভূত হইয়াছে।

উহার অন্তরের কি এমন বিশিষ্ট রূপ দেখিয়া সে তাহার যৌবন-লাবণ্যময়ী নবপরিণীতা পত্নীকে ভুলিতে বসিল, তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাক্। স-বাবুর পরিবারের সকলেই সুশ্রী, সুরূপ ও গৌরবর্ণ; অথচ সে একটি কৃষ্ণকায়া, বিগতযৌবনা, সন্দিগ্ধচরিত্রা নার্সকে এরূপ তীব্রভাবে ভালবাসিয়া ফেলিল কেন? ইহা কি ক্ষণিকের মোহ, যাদুমন্ত্র, না, সত্যকার ভালবাসা?...যুবকটী কিন্তু পিতামাতায় আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া এগারো বৎসর যাবৎ ঐ নার্সের সহিতই বসবাস করিতেছে। মোহ কি এত দীর্ঘস্থায়ী হয়? নার্সের মধ্যে আকর্ষণীয় কি কি গুণ দেখিয়া সে মোহিত হইল, সে প্রশ্নের উত্তর যুবকটি চট্ করিয়া সংক্ষেপে বলিতে পারিত না। কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিকের জটিল বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অধীনে আসিয়া, রোগীর মুখ দিয়াই ধীরে ধীরে রোগের বহুদূর-নিবদ্ধ কারণগুলি একে একে ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

পরীক্ষণের ফলে মোটামুটি এই তথ্যগুলি খুঁড়িয়া বাহির করা হইল :—

একাত্তর =

স-বাবু শৈশবে প্রায় চারি বৎসর বয়ক্রম অবধি তাহার এক বিধবা পিসিমার কোলে লালিতপালিত হইয়াছিল। ঐ সময় তাহার মাতা দুই-তিন বৎসর কাল কঠিন সূতিকা-রোগে ভুগিয়াছিলেন এবং তাহার পিতা দীর্ঘকাল তাঁহাকে লইয়া বায়ু-পরিবর্তন মানসে নৈনিতালে ছিলেন। পিসিমাটির বয়স তখন ২৭ বৎসরের মধ্যে ছিল এবং তিনি দেখিতে মোটামুটি সুশ্রী ছিলেন।...সুতরাং পিসিমার সহিত কথিতা নার্সটির আকারগত কোন সাদৃশ্য না থাকিলেও বয়োগত একটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

তদুপরি তাঁহার তিনটি সামান্য গুণের কথা ওই যুবকের শৈশবকালীন্ মানসপটে দুরপনেয়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। প্রথমত—তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে সর্বদা নিজের কাছে লইয়া শয়ন করিতেন এবং অনেক সময় সে না ঘুমাইলে, তাহাকে বুকের উপর উপুড় করিয়া ফেলিয়া ঘুম-পাড়ানে ছড়ার সহিত ধীরে ধীরে পিঠ্ চাপ্ড়াইতেন। দ্বিতীয়ত—বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রত্যহ সযত্নে তাহার অর্ধ-কুঞ্চিত কেশগুলিতে হস্তবিলেপন করিতেন এবং নিত্য সযত্নে আঁচ্ড়াইয়া দিতেন। ইহাতে সে নিবিড় আরাম বোধ করিত। তৃতীয়ত—তাহাকে স্বদেশী গান শিখাইতেন এবং সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনী দত্ত, বিপিন পাল, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি দেশ-নেতাদের গল্প শুনাইতেন। মোট কথা, পিসিমাতাই ওই শিশুর কচি মনে দেশাত্মবোধের বীজ উপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

এক্ষণে স্ত্রীর সহিত অবনিবনাও হওয়ার গূঢ় হেতুগুলির অনুসন্ধান করা যাউক্। বিবাহের কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রে স্ত্রীর সহিত কথা-প্রসঙ্গে যুবকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল সে কি-কি স্বদেশ-

সঙ্গীত গাহিতে পারে। তদুত্তরে পত্নী সোজা ভাষায় উত্তর দিয়াছিল যে, সে কোনো স্বদেশ-সঙ্গীতই জানে না। 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' গানটির প্রথম তিন-চারিটি পংক্তি সে কোনমতে গাহিতে পারে মাত্র; এইজাতীয় গানে তাহার আনুরক্তি নাই। এই কথায় তরুণ স্বামীর মনে দারুণ আঘাত লাগে।...

স্ত্রীর সুপুষ্ট স্তনদ্বয়ের মাঝখানে তপ্ত পেলব বক্ষ-উপত্যকাটুকুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিবার প্রবল প্রলোভন জাগায়, স-বাবু উপর্যুপরি দুই দিনই ঐ স্থানটিতে মস্তক স্থাপন করিয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণে স্ত্রী বিরক্তি-ভরে মাথাটি ঠেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল, "ও কী বিদ্‌ঘুটে শোওয়া! সর, ওতে আমার ভীষণ অসোয়াস্তি বোধ হয়।"...

তারপর একদিন সে রবিবার দ্বিপ্রহরে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার স্ত্রীকে সোহাগ-ভরে অনুরোধ করিয়াছিল একটু চুল আঁচ্ড়াইয়া দিতে। তাহাতে সে মৃদু হাঁসিয়া জবাব দিয়াছিল, "ওইতো ঘরে আয়না লট্‌কানো রয়েচে। হাত তো তোমার আর নুলো হয়নি, নিজেই আঁচ্ড়াও না কেন! আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।"...এই সবিদ্রূপ উপেক্ষাকে সে কোনমতেই বরদাস্ত করিতে পারে নাই।

নার্সকে স-বাবু তাহার কোন এক ছাত্রের বাড়ীতে প্রথম দেখে। ছাত্রটি ধনীর সন্তান, মাতৃহারা। টাইফয়েডে আক্রান্ত হওয়ায় তাহার সেবা-শুশ্রূষার জন্য নার্সটিকে স্নেহময় পিতা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই ছাত্রটিকে স-বাবু কিছুদিন বাড়ীতে পড়াইয়াছিল এবং সে ক্লাসের অন্যতম মেধাবী ছাত্র বলিয়া, অসুখের সময় তাহাকে তিন-চারিদিন দেখিতে গিয়াছিল। তৃতীয় দিন গিয়া স-বাবু দেখিতে পায়, ছাত্রটি প্রায় রোগমুক্ত হইয়াছে; নার্সটি শিয়রের নিকট বসিয়া অভিনেবেশ

সহকারে একখানা নরম ব্রাশ্ দিয়া তাহার ছোট-করিয়া-ছাঁটা চুলগুলি আঁচ্ড়াইয়া দিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়াই স-বাবুর দেহের মধ্যে একটা রোমাঞ্চ জাগিয়া উঠে এবং আচম্বিতে নার্স্ সম্বন্ধে তাহার ধারণার অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ সে ঐ ভাগ্যবান ছাত্রটির স্থলে নিজেকে অধিষ্ঠিত করিবার একটা দুর্দম্য স্পৃহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

খুব সামান্য একটা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া তারপর নার্সের বাটীতে তাহার গতায়াত আরম্ভ হয়। এই নার্স্‌টি ছিল বালবিধবা; গ্রামের একটি যুবকের ফুস্‌লানিতে সে কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন পরে পরিত্যক্ত, নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। তারপর এক বৃদ্ধ ডাক্তার স্নেহ-পরবশ হইয়া, তাহাকে নার্সিং শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন্; ঐ ডাক্তার ভদ্রলোকের নামের সহিত কোন দেশপূজ্য স্বর্গত নেতার নামের সৌসাদৃশ্য ছিল। নার্স্ তাহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিত। এই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারটিও তাহার আবাল্য স্বাদেশিকতা-পুষ্ট প্রাণকে নার্সের প্রতি আকৃষ্ট করার অন্যতম কারণ-স্বরূপ হইয়াছিল। তারপর সে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করে ওই বিগত-যৌবনা সেবিকার নিকট সেইদিন —যেদিনকার ধূসর সন্ধ্যায় সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মেলনের কর্ম-কোলাহলের মধ্যে তাহাকে প্যাণ্ডালের পার্শ্বে খদ্দরের সাড়ী-শোভিতা স্বেচ্ছাসেবিকাদের মধ্যে দেখিতে পায়।...

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রথম যৌন-সম্মিলনের পর, প্রায় প্রতিরাত্রেই স-বাবুর মাথাটি সে বুকের উপর সাগ্রহে দুই করতলে চাপিয়া ধরিয়া বলিত, "আমি বড় অসহায়, তুমি আমাকে ছেড়ো না।" যে মাথা একদিন তাহার স্ত্রী দারুণ হতাদরে সরাইয়া দিয়াছিল, সেই মাথাকে

সযত্নে যে বুকের বন্দরে আশ্রয় দেয়, তাহাকে ঠেলিয়া ফেলার সাধ্য তাহার ছিল না।...

এক্ষণে পাঠকগণ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, শৈশবের পিসিমার স্নেহের কয়েকটি উপেক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কেমন করিয়া এই শিক্ষিত যুবকের প্রেমের আদর্শের মধ্যে তাহার অজ্ঞাতসারেই একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে।

বিবাহিতা কন্যাদের পিতৃ-অনুরাগ

অনেক সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া, কন্যা যখন মাতা, ভগ্নি, ঠাকুর্মা, পিসিমা ও প্রতিবেশিনীদের সমাজে বসিয়া, নূতন সম্পর্কীয়দের সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকে, তখন উহার ফাঁকে ফাঁকে তাহার স্বামীর সহিত পিতার দোষগুণের কোথায় কি-কি মিল্ আছে, তাহা কতকটা বেহুঁস্‌ভাবেই ব্যক্ত করিয়া ফেলে। সদ্যোবিবাহিতা কন্যারা হয়তো মাতাকে বলে, 'উনি বাবার মতো মোচার ঘণ্ট ও ইঁচড়ের ডাল্‌না খেতে বড় ভালবাসেন্', 'উনি বাবার মতো গরীব-দুঃখীকে লুকিয়ে দান করেন', 'ওঁর হাঁটার ভঙ্গি অনেকটা বাবার মতন', 'উনি বাবার মতো পান থেকে একটু চুণ খস্‌লেই চাকর-বাকরদের ভীষণ গালাগালি দেন্', 'বাবার মতো দিনে দশ কাপ চা খাওয়া ওঁর অভ্যাস', ...ইত্যাদি। এই সকল সামান্য কথাবার্তা ও আচার-আচরণের মধ্য দিয়া নির্জ্ঞাত মনের শৈশব সংসক্তি ও আদ্য আদর্শ-পূরণের গোপন আনন্দ আমাদের নিকট সহজে ধরা পড়িয়া যায়।...

কোনো বালিকা শৈশবে পিতার অত্যন্ত আদরের সামগ্রী ছিল।

সাড়ে তিন বৎসরের সময় পিতার মৃত্যু হয়। বিবাহের পর উপযুক্ত স্বামিরত্ন লাভ করিয়া সে সুখী হইল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র এক বিষয় লইয়া তাহার মনের কোণে একটা অতৃপ্তির আঁচড় রহিয়া গেল। স্বামীর হাসি সে পছন্দ করিত না। বিবাহ কয়েক বৎসরের প্রাচীনত্ব লাভ করিবার পর, সে মাঝে মাঝে একান্তে তাঁহাকে বলিত, 'তোমার উপর-পাটীর ডানদিকের গজদাঁতটা (শ্বদন্ত) আমার ভারি বিশ্রী লাগে।' কেন বিশ্রী লাগে, তাহার কারণ সে বুঝাইয়া বলিতে পারিত না।...তাহার মনোবিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল যে, তাহার পিতার উপর-পাটির দক্ষিণদিকের শ্বদন্তটি বহুকাল পূর্বে পড়িয়া গিয়াছিল। পিতার রূপের সঠিক প্রতিচ্ছবি তাহার সংজ্ঞাত মনে ছিল না; কিন্তু নিশ্চয়ই একটা ম্লান চিত্র নির্জ্ঞাতের মহাফেজখানায় স্তূপাকার স্মৃতির তলায় চাপা পড়িয়া ছিল। এইজন্য তাহার অন্তর্জ্ঞাত মনো-বিভাগে একটা গজদন্তহীন হাসির প্রতিভাস প্রায়ই আলেয়ার আলোর মতো ঝল্‌সিয়া উঠে; উহাই স্বামী-সোহাগিনী যুবতীটিকে তাহার অজ্ঞাতসারে মঞ্জুহাস্যের আদর্শ সম্বন্ধে ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে।...

একটি মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের দ্বিতীয় পক্ষের রূপসী গৃহিনী তাহার স্বামীকে দাড়ি-গোঁফ কামানোর জন্য প্রায়ই তিরস্কার করে। এক এক সময় বুঝাইয়া বলে, 'পুরুষের বাহ্য লক্ষণ ও পুরুষত্বের প্রধান গর্বই হ'ল দাড়ি-গোঁফ্। আর দাড়ি রাখ্‌লে তোমায় মানায় বেশ।' কথাটা যতটা নির্দোষ খেয়াল্ ও যুক্তিবাদ-মূলক বলিয়া মনে হউক না কেন, আসলে কিন্তু উহা ঘোর স্বার্থ-প্রণোদিত। প্রকারান্তরে কথাটার তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে,—তুমি যদি দাড়ি রাখ, তাহা হইলে তোমায় আরো

বেশি করিয়া অথবা প্রায় পুরাপুরিভাবেই ভালবাসিতে পারি; তোমার মুণ্ডিত চিবুক যেন আমার ভালবাসার পথে অন্তরায় হইতেছে।... অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, মেয়েটি একবৎসর বয়সের সময় পিতৃহারা হয়; উহার এক নিঃসন্তান জ্যেঠামহাশয় নয় বৎসর বয়স পর্যন্ত উহাকে পুত্রবৎ গভীর স্নেহে ও সুশিক্ষার পরিবেশে লালিত-পালিত করেন এবং মৃত্যুকালে ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের জন্য দুই হাজার টাকার বরাদ্দ উইলে লিখিয়া যান্। ওই ভদ্রলোকটির কাঁচা-পাকা দাড়ি ছিল। কৃতজ্ঞ মন তাঁহার মুখচ্ছবির সবটুকু ভুলাইয়া দিয়া, ওই দাড়িটুকু সম্বন্ধে স্ত্রীলোকটিকে শুধু সচেতন রাখিয়াছে এবং প্রেমিকের রূপ সম্বন্ধে এই বিসদৃশ রুচির প্রেরণা যোগাইতেছে।...

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা কি বিশ্বস্তা হয়?

বার্ধক্য-কর-স্পৃষ্ট দরিদ্র ব্যক্তির তরুণী রসময়ী ভার্যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার স্বামীকে প্রাণের চেয়ে প্রিয় দেখে, আজীবন তাহার প্রতি বিশ্বস্ত—তাহাতে তদ্গতচিত্ত থাকে। এরূপ দৃশ্য অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকের কল্পনার অতীত, অবিশ্বাস্য, হাস্যোদ্রেক-যোগ্য হইলেও সত্য, সম্ভবনীয়—বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। শত শত সুশ্রী যুবকের ব্যাজস্তুতি ও ধনী বিলাসীর প্রলুব্ধ প্রয়াসের সম্মুখে অচঞ্চলা নারী গর্বিত পুলকে তাহার দীন স্বামীর চরণ-ধূলায় প্রেমের বৈকুণ্ঠ রচনা করিতেছে। কেন?...

পতি সম্বন্ধে সমাজধর্মের চিরাচরিত অনুশাসন ও সংরক্ষণশীল পরিবারের পবিত্র শিক্ষা হয়তো মেয়েটির সতীত্ব-বৃত্তির প্রতি খানিকটা নিষ্ঠা জাগাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু বাকি নিষ্ঠাটুকু? যদি দেখা যায় যে,

যুবতীটি তাহার প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ পিতার একমাত্র অথবা অন্যতমা আদরিণী সন্তান ছিল, এবং স্বামী ও পিতার মধ্যে আকার-প্রকারগত কতকগুলি সাদৃশ্য তাহার নির্জ্ঞাত মনোবিভাগ খুঁজিয়া পাইয়াছে, তাহা হইলে উহার মূলে কোন্ প্রধান ও সনাতন কারণটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। সুন্দরী, শিক্ষিতা, সুরসিকা যুবতীদের বার্ধক্য-প্রীতির আরো কতকগুলি কারণ থাকিতে পারে; সেগুলির উল্লেখ ও বিচার পরের অধ্যায়ে করিব।

—০—

==ষষ্ঠ পটল==

পুংস্ত্ব ও স্ত্রীত্ব, সাদন ও মর্ষণকাম

মাতৃগর্ভে আড়াই মাস কাল পর্যন্ত ভ্রূণদেহে স্ত্রী বা পুরুষের বিশিষ্ট যৌন-চিহ্ন প্রকাশ পায় না। এই সময়ে অদূরভবিষ্যতের স্ত্রী ও পুরুষের শরীর অভিন্ন আকারের থাকে, এবং অপরিণত ভ্রূণপিণ্ডে উভয় যৌন-তত্ত্বের বীজই নিহিত থাকে। একাদশ সপ্তাহ হইতে তাহাদের প্রত্যেকের দেহে একপ্রকার তত্ত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, তজ্জাতীয় যৌনযন্ত্রের পৃথক রূপ প্রকাশ করিতে থাকে; ঐ সঙ্গে বিপরীত তত্ত্বের বীজটি শুষ্ক, নিরঙ্কুরিত থাকিয়া যায়।

একটি অজানিত প্রাকৃতিক পদ্ধতির বলে পুং-ভ্রূণের মধ্যে অণ্ডকোষ ও স্ত্রী-ভ্রূণের মধ্যে অণ্ডাশয়ের বিকাশ সম্ভবনীয় হইয়া উঠে। গর্ভের মধ্যেই যৌনগ্রন্থির বিভিন্ন গুণসম্পন্ন অন্তঃস্রাবী রসের প্রক্রিয়ায় একদল ভ্রূণ পুরুষ-শিশুরূপে ও অন্যদল স্ত্রী-শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তথাপি একের দেহের মধ্যে অন্যের যৌনযন্ত্রের সামান্য এক ফোঁটা চিহ্নও সন্নিবদ্ধ থাকিয়া যায়। পুরুষের লিঙ্গের অতি ক্ষীণ প্রতীক সম্বন্ধ রহিয়াছে স্ত্রীলোকের যোনিনালীর খাঁজের উপরিভাগে ভগাঙ্কুর-রূপে।

পুরুষ ও নারী-তত্ত্বের সংমিশ্রণ

স্ত্রী-পুরুষের ভিতর দেহগত, মনোগত, প্রজ্ঞাগত কতকগুলি পার্থক্যের সৃষ্টি করিতে গিয়া, প্রকৃতিদেবী উভয়ের মধ্যে যেমন

অনেকগুলি সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন, তেমনি একের যৌনধর্মের বিশিষ্ট তত্ত্বের কিয়দংশ অন্যের মধ্যেও সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। কথাটা আরো সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয় যে, পুরুষজাতি ষোলো আনা পুরুষত্ব দিয়া এবং নারীজাতি ষোলো আনা নারীত্ব দিয়া গঠিত হয় না।

জগতের নিখিল-পুরুষের সত্বায় সাত আনা তিন পাই হইতে এক পাই পর্যন্ত নারীত্ব মিশ্রিত থাকিতে পারে এবং থাকেও। নিখিল-নারীর মধ্যেও ঠিক এই অনুপাতে পৌরুষভাব সন্নিবিষ্ট থাকে। তদুপরি জন্মগতভাবেই মানুষের শরীরে পার্থতীর্থক, অবটু আদি গ্রন্থি ও বিশিষ্ট যৌনগ্রন্থির আকার ও তন্নিঃসৃত রসের পরিমাণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই মৌল কারণে এত বিভিন্ন আকৃতি ও চরিত্রের মানব-মানবী আমরা জগতে দেখিতে পাই। যে স্ত্রী বা পুরুষকে আমরা স্বজাতিসুলভ স্বভাবসম্পন্ন ও দেহ-মনে আদর্শানুরূপ বলিয়া ধারণা করি, তাহার মধ্যে এক আনা পরিমাণও অপর জাতির স্বভাবধর্ম সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লওয়া কিছুমাত্র অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং নরনারীর প্রত্যেকেই উভযৌনধর্মী ও উভকামী *।

এই মতবাদ ডারউইন্, ভাইস্‌ম্যান্, ভাইনিন্‌গার, ম্যাগ্‌নাস্ হির্শ্‌-ফেল্ড্, ইভান্ ব্লক প্রভৃতি নূতনত্ববিদ্ মনীষিগণ বহুকাল পূর্ব হইতে

* "No man belongs a hundred percent to the sex with which he is identified. We are all basically bisexual. Both sexes are represented in each one of us, even anatomically."—**Critique of Love, Fritz Wittels, p. 107.**

প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সম্প্রতি ফ্রয়েড্ হইতে কার্ল্ আব্রাহাম্ পর্যন্ত মনোবিশ্লেষক মহারথিগণ এই ভিত্তিভূমির উপর অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের বিশাল সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষের বিভিন্ন প্রকারের ছাঁদ্ বা 'টাইপ্'গুলি যদি বাহ্যদৃষ্টি দ্বারাই আমরা বিচার করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, বহু স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষোচিত হাবভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বহু পুরুষের মধ্যে নারী-জনোচিত হাব-ভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান রহিয়াছে।

উভলিঙ্গ বা স্ত্রীপুংস

যাহাদের মধ্যে জন্ম হইতে ঠিক্ বা প্রায় সমান-সমান পুংস্ত্ব ও নারীত্ব সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহারা বৈজ্ঞানিকের নিকট 'উভলিঙ্গ' বলিয়া পরিচিত। ইহাদিগকে আমরা 'হিজ্‌ড়া' বা 'নপুংসক' বলিয়া জানি। কিন্তু ইহারা কেহই আসলে নপুংসক নহে; প্রায় সকলেরই একটা স্পষ্ট ও একটা অস্পষ্ট যৌনযন্ত্র থাকে। বাহ্যত যাহাদের চালচলন ও আকার অনেকটা পুরুষের ন্যায়, তাহাদের থাকে অণ্ডকোষ সঙ্কুচিত ও মুষ্কশূন্য, তদুপরি দুগ্ধপোষ্য শিশুবৎ একটি ক্ষুদ্র পুংলিঙ্গ, অণ্ডকোষ ও লিঙ্গমূলে একটি অগভীর খাদে স্ত্রীজাতীয় যৌনযন্ত্রের একটা ক্ষুদ্র আভাস। আবার যাহারা আকারে ও স্বভাবে স্ত্রীভাবাপন্ন, তাহাদের হয়তো অস্ফুট যোনিনালীর সহিত একটি অস্বাভাবিকরূপ প্রবর্ধিত ভগাঙ্কুর থাকে; কাহারো কাহারো এই বিশিষ্ট যন্ত্রটি এক ইঞ্চি পর্যন্ত বড় দেখা যায়। তথাকথিত হিজ্‌ড়াদেরও কয়েকটি প্রকার-ভেদ আছে। কিন্তু তাহা লইয়া এখানে বিশদ আলোচনা করিতে গেলে চলিবে না।

স্ত্রীত্ব-প্রধান পুরুষ

স্বাভাবিক পুরুষের মধ্যেও আমরা 'মেয়েলি গড়ন' দেখিতে পাই। মেয়েদের মধ্যেও 'মদ্দা ঢং' দেখিয়া বর্ষিয়সী গৃহিণীরা তীব্র সমালোচনা করিতে ছাড়েন না। কোনো কোনো স্ত্রীলোকের কৈশোরপ্রারম্ভে, কাহারো বা বার্ধক্যের সূত্রপাতে, অল্পবিস্তর গুম্ফরেখা বহির্গত হয় ও আকৃতির মধ্যে পুংস্ব-প্রাবল্য ফুটিয়া উঠে। সখের থিয়েটার ও যাত্রা-সম্প্রদায়ে এমন বহু স্ত্রীভূমিকা-অভিনয়কারী বালক, কিশোর ও যুবাপুরুষ আমাদের নয়নপথে পতিত হয়, যাহারা অভিনয়-কালে ভুলিয়া যায় ও দর্শককে ভুলাইয়া দেয় যে, তাহারা পুরুষ। তাহাদের হাব-ভাব-চাল-চলন-কথাবার্তা সবই যেন স্ত্রীভাব-মণ্ডিত।

ইহাদের মধ্যে অনেকেই অভিনয়ের পেশা বা সখ্ ছাড়িয়া দিবার পরও, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত নারী-স্বভাবসিদ্ধ আচার ও আচরণ প্রদর্শন করিতে থাকে। এজন্য বন্ধুবান্ধবেরা তাহাদিগকে বিদ্রূপ করেন, অপরিচিত দ্রষ্টাগণ মনে মনে কৌতূহল বোধ করেন। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে অসংশয়িতচিত্তে সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হইবে যে, এই মেয়েলি হাব-ভাব ও ব্যবহার পুরাপুরিই দীর্ঘদিনের অভ্যাস, মনন ও চেষ্টা-প্রসূত নহে,—উহা প্রধানত তাহার স্বভাবগত। সৃষ্টিকর্তা ইহাদের স্বত্তার মধ্যে নারীভাবের মাল-মশলা এরূপ অধিকমাত্রায় মিশাইয়া ফেলিয়াছেন যে, তাহার কার্যফল জন-সাধারণের নিকট একটু বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়।

এই সকল লোক সাধারণত একটু পুরুষভাবাপন্না, কলহপ্রিয়া ও শাসননিষ্ঠা নারীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয় এবং বিবাহ-জীবনে তাহাদিগকে পত্নীরূপে লাভ করিতে পারিলে সুখী হয়।

রুশো, শেলী, জার্মান্ কবি হাইন্‌রিক্ ফন্ ক্লাইস্ট্-এর মুখাবয়বের মধ্যে নারীসুলভ লালিত্য যথেষ্ট ছিল। পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণ, এমন কি, বুদ্ধদেব, মহাবীর জৈন, শ্রীগৌরাঙ্গ ও নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট-এর চেহারা ও চরিত্রের মধ্যে কম-বেশি 'মেয়েলিয়ানা' ধরা পড়িয়াছে। আমাদের দেশের সমাজ-নেতা, ধর্ম-নেতা, দেশ-নেতা কবি, শিল্পী, ও পণ্ডিতাগ্রগণ্যদের মধ্যে কেহ কেহ নারীর ন্যায় আকৃতি-প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন, এবং এখনো আছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন আযৌবন গোঁফ্-দাড়ি কামানো এবং বড় করিয়া চুল রাখার পক্ষপাতী। কেহ কেহ সারা যৌবনকাল ব্যাপিয়া প্রত্যহ কিছুক্ষণ নারীর ন্যায় গোপনে অঙ্গ-প্রসাধনে ব্যয় করিতেন, এবং চিরকালই পোষাকের পারিপাট্যের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছেন।

যাহাদের মধ্যে নারীত্বের সংশ্লেষ একটু বেশি বিদ্যমান, তাহারা সময়ে সময়ে নিজেদের মনের কোণে এক-একটা নারীসুলভ অদ্ভুত ও অস্বস্তিকর প্রবৃত্তির উৎসেক অনুভব করে। যাহারা বেশি পরিমার্জিত ও প্রতিভাশালী নহে, তাহারা সমাজ-জীবনে অথবা নিজেদের যৌন-জীবনে মাঝে মাঝে স্ত্রীসুলভ এক-একটা আচরণ করিয়া, অন্তরের ওই স্বতস্ফূর্ত এষণার তৃপ্তি-সাধন করে। যাহারা মানসিক শক্তি-প্রয়োগে উহার বাহ্যিক পরিস্ফুরণকে অবদমন করিতে চাহে ও পারে, তাহারা প্রেম-জীবনে কদাচিত সুখী হইতে পারে। অথচ ইহাদের সমজাতীয় বিশ্বস্ত বন্ধু থাকে অনেক, এবং বন্ধুত্ব-শৃঙ্খলে ইহারা মানুষকে বাঁধিতে পারে অবলীলাক্রমে। বিষমজাতীয় প্রেম ও প্রেমিক সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহপ্রবণতা, অস্থিরচিত্ততা, অপ্রাকৃত আবেগের ক্ষণিক উন্মাদনা ও একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ইহাদের

স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলে—তাহাদের পুরুষভাব ও নারী-ভাবের মধ্যে; একটি চাহে আর একটিকে উৎসাদিত করিয়া নিজে প্রবল হইতে। এই দ্বন্দ্বের ফলে কেহ কেহ জীবনে ঘোরতর বীত-স্পৃহ হইয়া, আত্মহত্যা করিতেও প্রলুব্ধ হয়।

কবি ক্লাইস্টের শোচনীয় প্রেম

এ সম্বন্ধে শেলীর জীবনের পরিণতি লক্ষ্য করিবার বিষয়।...কবি ক্লাইস্ট্ও ভরা যৌবনে আত্মহত্যা করিয়া নিজের যশঃসমারোহময় জীবনের অবসান করেন। তিনি এমন একটি প্রেমিকা চাহিতেছিলেন যে, তাঁহার সহিত সানন্দে মরিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। অবশেষে তিনি হেন্‌রিয়েটা ফোগেল্‌কে তাঁহার প্রেমের অভিনব আদর্শে বিশ্বাসবতী করিয়া তুলিলেন। সে তাঁহার হাত ধরিয়া এক তমিস্রাময়ী রাত্রিতে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। বার্লিনের নিকট এক শষ্পপুষ্প-শোভিত পল্লী-ভবনে তাঁহারা দুই দিন দুই রাত্রি পরস্পরের নিবিড় সঙ্গ-সুখ উপভোগ করেন। তৃতীয় দিনে কবি ফোগেল্‌কে গুলী করিয়া হত্যা করিলেন এবং তদ্দ্বারা নিজের জীবনও নিঃশেষ করিলেন।...মনোবিশ্লেষকগণ এই বিয়োগ-বিধুর পরিণতির আভ্যন্তরিক অভিপ্রায়টি চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছেন *। ক্লাইস্ট্ একজন স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন। কেন? শ্রীমতী ফোগেল্—তাঁহার ভিতরকার নারীত্বের রক্তমাংসময় বাহ্যপ্রক্ষিপ্ত প্রতীক; উহাই ছিল যেন তাঁহার ভিতরকার চিরবিকাশোন্মুখ পুরুষত্বের চিরশত্রু।

* **F. Wittels,** Op. Cit., p. 135.

স্ত্রীভাবশালী পুরুষের আচার-ব্যবহার

আবার এমন অনেক পুরুষ আছেন যাঁহারা আকারে ও আচারে পুরুষোচিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, লোকচক্ষুর অন্তরালে কতকগুলি নারীসুলভ আচরণ করিতে বড় ভালবাসেন। ইহারা হয়তো নিজের অন্তরের স্ত্রীসুলভ এষণাগুলিকে জনসমাজের আকৃষ্টি হইতে আবৃত করিবার জন্যই যেন মুখে লম্বা গোঁফ-দাড়ি রাখেন। গাম্ভীর্যের রাংতা দিয়া নিজেদের উপরিতলটি ভালো করিয়া মুড়িয়া রাখেন এবং আফিসে নিম্নতন কর্মচারিগণের প্রতি নির্মম প্রভুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান্। কিন্তু বাড়ীতে তিনি অন্য মানুষ; স্ত্রীর নিকট হয়তো একান্ত বিনীত ভৃত্যবৎ। হরি-সংকীর্তন শুনিয়া আত্মহারা হন্, গঙ্গাতীরে গিয়া দরিদ্র-নারায়ণের মধ্যে চাউল-পয়সা বিতরণে মুক্তহস্ত হন্।...ইহাকে কিন্তু ভক্ত-বিট্‌লামি বা ভণ্ডামি বলা অন্যায় হইবে।...

লেখক একজন মধ্যবয়স্ক পাঁচ সন্তানের জনক, বিত্তশালী ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন। বাটীর ঝি-চাকর—এমন কি স্ত্রীর কাযকর্ম তাঁহার কখনো পছন্দ হয় না। কেহই ঠিকমতো চা প্রস্তুত করিতে পারে না—এই অজুহাতে তিনি প্রভাতে উঠিয়া নিজেই স্টোভ্ জ্বালিয়া, চায়ের সাজসরঞ্জাম লইয়া বসিয়া যান্; এবং নিজে চা পান করিয়া ও স্ত্রীকে এক কাপ চা পরিবেশন করিয়া গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ছেলেমেয়েদের জামায় সেফ্‌টি-পিন্ আঁটা দেখিলেই তিনি রাগিয়া খুন্,—অমনি ছুঁচ্-সুতা লইয়া জামায় বোতাম লাগাইতে সুরু করিয়া দেন।

ভদ্রলোক আফিসে সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটিয়া বাড়ী

ফিরিয়া, প্রথমেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া যদি জানিতে পারেন যে, কোলের ছেলেটিকে সময়মতো দুধ খাওয়ানো হয় নাই, তাহা হইলে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া আপন দুরদৃষ্টকে ধিকার দিতে দিতে, তিনি স্পিরিট্‌ ল্যাম্পে দুধ গরম করিতে বসেন এবং ঘুমন্ত শিশুকে কোলে তুলিয়া বিস্ময়কর নিপুণতার সহিত দুধ পান করাইয়া দেন্‌।

সাধারণ লোকে তাঁহার এইরূপ স্বভাবের কথা শুনিয়া হয়তো মনে করিতে পারেন যে, তিনি নিজের স্ত্রীকে খুব ভালবাসেন অথবা অত্যন্ত খুঁৎখুতে প্রকৃতির লোক। কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক আরো গভীর জলে ডুব দিয়া বলিবেন যে, তাঁহার ধাতুপ্রকৃতির মধ্যে স্ত্রীত্বের যে অংশটুকু নিহিত আছে, তাহাই কর্ম-স্পৃহায় উদ্দীপ্ত হইয়া, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে এইসকল স্ত্রীসুলভ আচরণ করিবার প্রবৃত্তি প্রদান করে।...

দস্যি বা গেছো মেয়ে

যে যুগে মেয়েরা অন্দর-মহলে থাকিয়া, শুধু রন্ধনশালা, সন্তান-পালন ও স্বামীশ্বশুর সেবা-শুশ্রূষা লইয়া জীবন কাটাইত, যখন তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ-গমনের লোকাচার-নির্ধারিত সীমানা ছিল শয়ন-মন্দির হইতে নদীতট পর্যন্ত, তখনো এ দেশে 'দস্যি মেয়ের' বা 'গেছো মেয়ের' অভাব ছিল কি? অনেক দস্যিমেয়েই শ্বশুরকুলে গিয়া নিজেদের স্বভাবের সহিত নূতন পরিবেশের খাপ্‌ খাওয়াইতে পারিত না। শাশুড়ী হাতা পুড়াইয়া ছ্যাঁকা দিত, বিধবা ননদিনী কালে-অকালে চুলের মুঠি ধরিয়া টানিত, স্বামী পুনর্বিবাহের ভয়-প্রদর্শন করিত, তথাপি তাহাদের স্বভাবের বিশেষ পরিবর্তন হইত না। তাহারা ফাঁক্‌ পাইলেই ঘোম্‌টার আড়ালে আত্ম-নির্বাসনের অনুশাসনকে ডিঙ্গাইত, অপরিচিত যুবকদের সহিত কথা

বলিতে ভালবাসিত, রন্নাঘর হইতে এত জোরে কথা কহিত যে, বহির্বাটিতে তাহার সুস্পষ্ট রেশ ভাসিয়া আসিত।

তখনকার মতো এখনো শ্বশুরকুলের প্রাজ্ঞ পল্লী-গৃহিণীরা নাসিকা ঘুরাইয়া নববধূকে কষ্টি-পাথরে পরখ্‌ করেন; কাহারো কাহারো সম্বন্ধে 'মাগো নতুন বউটা কি বেহায়া,' 'সারা অঙ্গে ওর কোনো মেয়েলি ছাঁদ নেই,' 'হাতে-পায়ে পুরুষমানুষের মতো কি চুল দেখেছ', 'ছিঃ, হাঁটুনি যেন পেয়াদার মতো,' 'কথা কয় যেন হাঁড়ির ভেতর থেকে,'...ইত্যাকার টিপ্পনি প্রকাশ পায়। ইহার মধ্যে অতিশয়োক্তি-অলঙ্কারের সংমিশ্রণ থাকিলেও মূলত এইরূপ আকৃতি-প্রকৃতিসম্পন্না বধূ, বাংলা—তথা জগতের সমাজে দুষ্প্রাপ্য নহে। অর্থাৎ চিরকালই কতকগুলি নারীর বাল্যকাল হইতে আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে এমনভাবে পুরুষভাব ওতপ্রোত থাকিতে দেখা যায় যে, তাহা অপরের খরদৃষ্টি ও মন্তব্যবৃষ্টি টানিয়া আনে। বর্তমানকালে পুরুষোচিত শিক্ষা গ্রহণ ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার ওলট্‌পালটের ফলে পুরুষভাবাপন্ন নারীদের সংখ্যা বাড়িয়াছে, ঠিক্‌ এমন কথা বলা যায় না; তবে তাহাদের অন্তরোত্থিত পুরুষোচিত প্রেরণা স্ফূর্তিলাভ করিবার নানারূপ প্রণালী পাইয়া, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আশ্বস্ত ও অস্বস্তিশূন্য হইয়াছে।

পুরুষভাবাপন্না নারীর আচার ও অভ্যাস

পাঠকগণ হয়তো লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, কোনো কোনো মেয়ে শিশুকাল হইতে পুরুষের ন্যায় পোষাক-আশাক্‌ পরিতে বা পুরুষোচিত খেলা খেলিতে ভালবাসে। এই প্রকৃতির মেয়েরা দক্ষিণহস্ত ভালোরূপ চালাইতে পারে, দক্ষিণ পদ আগে বাড়ায়, দক্ষিণ দিকে

কাৎ হইয়া শোয়, অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখায় ও চমৎকার শিস্ দিতে পারে। লেখক একটি দশ বৎসরের মেয়েকে দেখিয়াছেন যে, হাফ্‌প্যাণ্ট্ পরিয়া, সমবয়স্ক ও তাহাপেক্ষা কিছু অধিকবয়স্ক ছেলেদের সহিত গুলী খেলিতে ভালবাসে এবং সে এই খেলাটীতে এরূপ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার সহিত বালকগণ আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

আজকাল অনেক ভারতীয় মেয়েকেই ছোরা খেলা, লাঠি খেলা, ড্রিল, হকি, ফুটবল খেলা, সাইকেল চালানো শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহাদের এই সকল খেলার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তাহারা উহাতে আশ্চর্য নিপুণতা অর্জন করে ও গৃহস্থালী-শিক্ষার প্রতি উদাসীন হইয়া পড়ে। এই জাতীয় বালিকারা পারিবারিক চাপে পড়িয়া বিবাহের কিছুকাল পূর্বে নারীজনোচিত পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে পারে এবং সামাজিক ভব্যতার খাতিরে একটু মেয়েলি আচার-আচরণের অভ্যাস করিতে পারে; কিন্তু অন্তরাত্মা হইতে তাহারা পৌরুষভাবকে কোনমতে ছাঁটিয়া ফেলিতে পারে না।

ইহারা অনেকেই শিক্ষিত হইয়া অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ও স্বমত-প্রধান হইয়া উঠে। যৌবনে প্রায়শ বিবাহ-বিমুখ হয়; নচেৎ বিবাহ-জীবনে স্বামীর উপর একাধিপত্য করিতে চায়। স্বামী একান্ত অনুগত ও আদর্শমতো না হইলে, তদনুরূপ প্রেমিক পাইবার জন্য লালায়িত হয়। কেহ কেহ স্বামী-সহযোগে অথবা স্বামী-ছাড়া বন্ধুদের সহিত কোনো দুঃসাহসিক ভ্রমণে বা শিকারে বহির্গত হয়। তাহাদের অনেকেই সাঁতার দিয়া তরঙ্গসঙ্কুল নদী পার হইতে, ঘোড়ায় চড়িতে, মোটর হাঁকাইতে, এমন কি উড়ো-জাহাজ চালনা করিতে পুরুষের সহিত টক্কর দিয়া শিক্ষা করে।

আকৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ মেয়েলি ছাঁদ ও চাল-চলনে ব্রীড়ানতির চূড়ান্ত চিত্র আঁকা থাকা সত্ত্বেও কোন-কোন স্ত্রীলোক অন্তরে অন্তরে পুরুষোচিত প্রেরণা স্বতঃই অনুভব করে। কিন্তু তথাপি সূক্ষ্মদর্শী বৈজ্ঞানিক ইহাদের একটা-না-একটা অঙ্গের সংগঠনে পুরুষ-সুলভ বৈশিষ্ট্য ধরিতে পারেন; হয় উঁচু কপাল, বড় মাথা, প্রবর্ধিত গণ্ডাস্থি, স্থূল ওষ্ঠ, ঊর্ধ্বাঙ্গের তুলনায় নিম্নাঙ্গের দৈর্ঘ্য, নিতম্বের আপেক্ষিক ক্ষীণতা, স্তনের অপরিপুষ্টি, ললাটে অর্ধোস্ফুট রেখাবলী, গাঢ় স্বর, নচেৎ অন্য কোনরূপ অসামঞ্জস্য।

লাবণ্যবতী কোমলাঙ্গী ললনাও সাহিত্য-বাসরে প্রবন্ধ পাঠ করে, রাজসভায় কূট তর্ক করে—জনসভায় বক্তৃতা করে, যোগ্যতার সহিত জমিদারি শাসন করে, যুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে, বিদ্রোহান্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এই সমস্ত সুযোগ যাহারা না পায়, তাহারা গৃহে স্বামীপুত্রকে কড়া শাসনের আওতায় রাখে; দুঃখে অলৌকিক সহনশীলতা দেখাইতে ও বিপদে অজস্র সুপরামর্শ দিতে সমর্থ হয়। ইহাদের মধ্যেও অধিকাংশই পুরুষের সহিত পরিচয়-স্থাপনে অত্যন্ত অগ্রবর্তী অথচ বিলাস-বিভ্রমশালিনী ও ছলনাময়ী, এবং প্রেমের স্থান-কাল-পাত্র নির্বাচন বিষয়ে অত্যন্ত উৎকট-রুচিগ্রস্ত হয়।

সাদনকামিতা ও মর্ষণকামিতা

স্ত্রী-পুরুষের প্রেম-জীবনের নিগূঢ় রহস্য অধ্যয়নকালে সাধারণ পাঠকপাঠিকাকে আর একটি মহাসত্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সাধারণভাবে পৃথিবীর পুরুষগণ পরিমিত মাত্রায় 'সাদনকামী' ও স্ত্রী-লোকগণ 'মর্ষণকামী'।

সাদনকামী অর্থে—প্রেম-ব্যাপারে ও যৌন-ব্যবহারে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরপক্ষকে অল্পবিস্তর নিপীড়ন করিতে ভালবাসে। সাদনকামিতায় প্রভুত্বভাবের স্ফুরণ। ইংরাজীতে সাদনকামীকে বলে Sadist (স্যাডিস্ট্) ও সাদনপ্রবৃত্তিকে বলে sadism (স্যাডিজ্ম্)।

মর্ষণকামী অর্থে—প্রেম-ব্যাপারে ও যৌন-ব্যবহারে যাহারা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে অপরপক্ষের নিকট হইতে অল্পবিস্তর পীড়ন সহিতে ভালবাসে। এই পীড়ন কায়গত অথবা মনোগত হইতে পারে। মর্ষণকামে দাসত্ব-ভাবের প্রসাদন। ইংরাজীতে মর্ষণকামীকে বলে Masochist (ম্যাসোকিস্ট্) ও মর্ষণপ্রবৃত্তিকে বলে masochism (ম্যাসোকিজ্ম্)।

সাদনকামিতা পুরুষের সহজাত কবচকুণ্ডল ও মর্ষণকামিতা নারীর স্বভাবদত্ত ভূষণ *। এই দুই প্রকার প্রবৃত্তিই পরিমিত মাত্রায় বাক্যে, ব্যবহারে, লেখায়, অঙ্কনে ও যৌনাচারে ফুটিয়া উঠা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মাত্রা ছাড়াইলেই উহারা ব্যাধির মধ্যে পরিগণিত হয়। দৃঢ় আলিঙ্গন, মৃদু নখরাঘাত, চুম্বন ও দংশন—এইগুলি মূল যৌনসম্মিলনে স্বভাব-সঙ্গত সাদনবৃত্তি। যে সংস্কার এইগুলি সহিয়া অন্যপক্ষকে পুলক অনুভব করায়, তাহা মর্ষণবৃত্তি। কিন্তু যাহারা দংশন করিয়া প্রেমাস্পদের অঙ্গবিশেষে রক্তপাত ও ক্ষতসৃষ্টি না করিয়া দিলে, সত্যকার যৌন তৃপ্তি পায় না, তাহাদিগকে ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া ঝগড়া করা, কথায় কথায় দোষ ধরা, চিম্‌টি কাটা, টোকা ও চাঁটি মারা, চুল টানিয়া ধরা, রাগ করিয়া না খাওয়া, অভিমান করিয়া ভূমিশয্যা

* The Riddle of Sex—J. Tenenbaum, M. D., p. 263.

গ্রহণ করা, মদ্যপ স্বামীর হস্তে মাঝে মাঝে নীরবে প্রহার সহ্য করা··· ইত্যাদি প্রেম-জীবনে সাদন ও মর্ষণকামিতার অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত।

মর্ষণকামী নারী

প্রেমে মশ্‌গুল পুরুষ কোনো নারীর পদতল নিত্য অশ্রুজলে ধৌত করিয়া তাহার মন ভিজাইতে পারে না; অজস্র উপহার, সকুণ্ঠ স্তাবকতা ও অকাতর স্বার্থত্যাগেও তাহাকে বাহুডোরে বাঁধিতে অসমর্থ হয়। অথচ অন্য একজন উপেক্ষা দিয়া, বিক্রম দিয়া, আঘাত দিয়া, অতি সহজেই তাহার হৃদয় জয় করিয়া লয়। এই সূত্রে একবার 'শেষ প্রশ্নে'র মনোরমা ও শিবনাথ চরিত্রের উপসংহারটা একবার স্মরণ করুন্। কবি নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সাদনকামী নরের প্রতি মর্ষণকামী নারীর মনোবৃত্তি মনোজ্ঞভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ ছত্রে—

"যারা অসুন্দর বর্বর গর্বভরে চলে,
যারা নারীর বিহ্বল প্রাণ দু'পায়েতে দলে,
যারা লালসা-মদির চোখে নগ্ন করি ধরে,
যারা বেদনার অশ্রুধারে নিত্য স্নান করে,—
রমণীর প্রেম ছোটে তাহাদের পিছে।"

"Ladies love brutes"—কবিতাটি এই ইংরাজী প্রবচনেরই পেলব প্রতিধ্বনি। কিন্তু সকল মহিলাই মর্ষণকামী নয়, অর্থাৎ প্রেম-জীবনে নিপীড়িত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না। সাধারণত দেখা যায়, যে-সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে একটু পৌরুষ-ভাব বেশি আছে, তাহারা হয় সাদনকামী; এবং যে-সকল পুরুষের মধ্যে স্ত্রী-ভাব বেশি আছে,

তাহারা হয় মর্ষণকামী! আবার, চতুর প্রেমিক-প্রেমিকা মর্ষণকামিতাকে অনেক ক্ষেত্রে হৃদয়-জয়ের দিব্যাস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে।

প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর উভকামী

সকলদিক্ দিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া, মনোবৈজ্ঞানিকগণ একটা নূতন অভিমত গঠন করিয়াছেন এই যে, স্ত্রী ও পুরুষ প্রত্যেকের মধ্যেই স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব যেমন অল্পবিস্তর বর্তমান থাকে, তেমনি সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকের মধ্যেই আন্তরিক সাদনকামিতা ও মর্ষণকামিতা ন্যূনাধিক মাত্রায় বিদ্যমান। ঐতিহ্য, বংশক্রমিকতা, পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা, সংসর্গ, গ্রন্থপাঠ, দৃষ্টান্ত প্রভৃতির প্রভাবে মানুষের মধ্যে একটি তত্ত্বই অল্পাধিক পরিপুষ্ট হয়। অন্যটি অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় থাকে, সময় বিশেষে ক্ষণিকের জন্য হয়তো বেশ-একটু মাথা খাড়া করিয়া উঠে।

প্রেমময় স্বামী একসময় স্ত্রীকে সামান্য কারণে যথেচ্ছ গালাগালি দিয়া তাঁহার সাদনকামিতার যেমন পরিচয় দেন, আবার কয়েক ঘণ্টা পরে তাহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়া মর্ষণকামিতার পরিচয় দিতে পারেন। অবশ্য ইহা অপ্রত্যক্ষ ও মৃদু মাত্রার উভকামিতার দৃষ্টান্ত।

স্বামী অনেক ক্ষেত্রে রমণ-ব্যাপারে অগ্রবর্তী হইয়া, পত্নীকে দৃঢ়-পরিরম্ভন করিয়া তাহাকে চুম্বনে-দংশনে সকাতর করিয়া তুলেন; আবার গাঢ় কামাবিষ্টা পত্নী কখনো-কখনো নিদ্রাগত স্বামীকে চিম্‌টি কাটিয়া জাগাইয়া, সক্রিয় রতি-লীলা সঞ্চালনে তাহার পৌরুষকে লাঞ্ছনা করিতে কার্পণ্য করেন না। ইহা প্রত্যক্ষ ও মৃদু মাত্রার উভ-কামিতার দৃষ্টান্ত।

প্রকৃতির অভিপ্রায়

তবে প্রকৃতির একান্ত অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে, পুরুষের ভিতর প্রধানত সাদনকাম ও নারীর ভিতর মুখ্যত মর্ষণকাম পরিমিতভাবে বিকশিত হইয়া উঠুক। নর চাহুক্—আপনার বুদ্ধিমত্তা ও বীর্যবত্তা দিয়া সহস্র প্রতিযোগীকে প্রতিহত করিয়া, উদগ্র আগ্রহে রমণীকে বুকে টানিয়া লইতে; আর নারী প্রদীপ্ত প্রতিভাশালী বীর-কেশরীর সম্মুখে আপন তনুলতাকে তুলিয়া ধরিয়া গাহুক্—'তব চরণ-তলে হৃদয় আমার চাহে মিশাতে মিলন-রাতে!'...বিপ্লব-বন্যা-প্লাবিত বর্তমান যুগ বঙ্গক্ষেত্রে এই রীতির বিপর্যয় ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে; নারীকে সে করিতে চাহে অতিরিক্ত সাদনকামী, পুরুষকে মর্ষণকামী।...দুর্ভাগ্য!

উগ্র মর্ষণকামিতার দৃষ্টান্ত

রাশিয়ার এক নিরক্ষরা কৃষক রমণীর কাহিনী হয়তো কোন-কোন পাঠকপাঠিকার নিকট অজ্ঞাত। একদিন সে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার গৃহ-চিকিৎসকের পরামর্শ চাহিতে আসিল। তাহার অভিযোগ, তাহার স্বামী তাহাকে আর ভালবাসে না। ডাক্তার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে বুঝ্‌লে সে তোমায় ভালবাসে না?" অকপটচিত্তে কৃষকপত্নী উত্তর দিল, "প্রায় রোজই তিনি আমাকে সামান্য অছিলায় বেদম মার্‌ধর্ করতেন; দু'সপ্তাহ হ'ল তিনি আমাকে মারা একেবারে বন্ধ করেছেন।"...এইরূপ কৃষকপত্নীর অসংখ্য সংস্করণ আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।...ইহা হইল নারীর তরফ্ হইতে অপ্রত্যক্ষভাবের উগ্র মর্ষণকামের দৃষ্টান্ত।

এবার পুরুষের তরফ্ হইতে উগ্র ও প্রত্যক্ষ মর্ষণকামের একটা দৃষ্টান্ত দিব।...একত্রিশ বৎসর বয়স্ক কোন ভদ্রলোক সম্প্রতি লেখকের নিকট আসিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রী যেদিন তাঁহার সহিত তুমুল ঝগড়া করেন, সেইদিন তিনি নিশীথ-শয়নে স্বামীর নিকট অতিশয় রমণীয় ও লোভনীয় হইয়া উঠেন। একদিন তাঁহার ক্রোধান্ধ পত্নী উত্তেজনার মাথায় তাঁহার গালে ঠাস্-ঠাস্ করিয়া কয়েকটি প্রকাণ্ড চড় বসাইয়া দিয়াছিলেন; সেদিন তিনি তৎক্ষণাৎ আসঙ্গ-লিপ্সায় এতদূর অভিভূত হইয়া পড়েন যে, অবিলম্বে প্রিয়তমাকে প্রশান্ত করিয়া তাহার দেহোপভোগ করেন। তিনি লেখককে নানা ভাবে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, তাঁহারা উভয়ে উভয়কে ভালবাসেন, এবং যৌনসম্মিলনে অধিকাংশ সময়ই স্ত্রী তাঁহাপেক্ষা অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।...

উগ্র সাদন ও মর্ষণকামের উদাহরণ

এক ভদ্রলোক কোনো রেলওয়ে কোম্পানীতে কেরাণীর কার্য করিতেন এবং কয়েক বৎসর পার্বতীপুর ও সান্তাহারে ছিলেন (বৎসর সাতেক হইল তিনি মারা গিয়াছেন)। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন পল্লীগ্রামের নিরক্ষর গৃহস্থ-কন্যা; দেখিতে কুশ্রী, নিরতিশয় উদ্ধতপ্রকৃতির ও অপ্রিয়-বাদিনী। ছেলেমেয়েদের শাসন-ভার ছিল সম্পূর্ণ ইঁহার নিজের হাতে, স্বামী উহাতে সামান্য হস্তক্ষেপ করিলেই তিনি রাগিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া, আহার বন্ধ করিতেন।

বৎসরের মধ্যে একবার বা দুইবার ছুটি উপলক্ষে কথিত ভদ্রলোকটি সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া, লেখকের কোন নিকট-আত্মীয়ের বাসায়

উঠিতেন। ঐ সময় স্ত্রীর নূতন গহনা গড়াইবার জন্য অথবা পুরাতন গহনা ভাঙার জন্য স্বামীকে দুইবেলা স্বর্ণকারের বাড়ীতে হাঁটাহাঁটি করিতে হইত। তদুপরি, নিজের কাপড়, জামা, আলোয়ানের ফরমাইস্ তো নিত্য লাগিয়া থাকিত। প্রায়ই দেখিতাম, পছন্দসই কাপড় কেনা হয় নাই বলিয়া গোবেচারী পতির মাথায় শ্রাবণের ধারার মতো কটু-কাটব্য বর্ষিত হইতেছে; স্বামী বেলা দ্বিপ্রহরে নিরন্ন অবস্থায় বাসে চড়িয়া বহুবাজারে ছুটিতেন কাপড় বদ্‌লাইয়া আনিবার জন্য। তাঁহার এজন্য কোনো বিরক্তি-বোধ ছিল না, ব্যবহারে বিদ্রোহের বিন্দুমাত্র লক্ষণ প্রকাশ পাইত না; বরং প্রিয়ার নিত্য-নূতন দুঃসাধ্য আব্‌দারের তুমুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস নীরবে মাথায় ধরিয়া তিনি পরম সন্তোষ লাভ করিতেন।... উগ্র অথচ অপ্রত্যক্ষ সাদন-ও-মর্ষণকামের ইহা একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

স্ত্রী-পুরুষে মনের অমিল হয়—দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাধে তখনি, যখন উভয়ের মধ্যেই স্বভাব-বশে একান্তভাবে সাদনকামিতা অথবা মর্ষণকামিতা সমান প্রবল হইয়া উঠে। দুইজনেই হয়তো 'তুম্ বি মিলিটারি, হম্ বি মিলিটারি'—এই মনোভাব লইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হয়; নচেৎ বৈষ্ণব-বিনয়ের অবতার হইয়া রেল্‌গাড়ীর নিকটে দাঁড়াইয়া 'আপ্ উঠিয়ে, আপ্ উঠিয়ে' করিতে থাকে। সেক্ষেত্রে প্রেমের পরিপূর্তি—সত্যকার মিলন হওয়া অসম্ভব। যজ্ঞ-ধূমাচ্ছন্ন বিবাহ-সভায় যজুর্বেদের অস্পষ্টোচ্চারিত সংস্কৃত মন্ত্রাবলী তাহাদিগকে বাহ্যত মিলিত করিয়া দিলেও অন্তরে তাহারা বিচ্ছিন্নই থাকিয়া যায়; বিবাহ-জীবন তাহাদের নিকট অশান্তিময় ও প্রায়শ দুর্বহ হইয়া পড়ে। সেইজন্য উৎকট সাদনকামী বা মর্ষণকামী পুরুষ বারবনিতালয়ে গমন করে; সেখানে

সে মুদ্রার বিনিময়ে সাদনকাম বা মর্ষণকামের প্রত্যুত্তর পাইতে পারে; যথেচ্ছ ঝাঁটালাথি দিতেও পারে—খাইতেও পারে।

পূর্বরাগের অবস্থায় নারীর তরফ হইতে খানিকটা মৃদু-সাদনকামের অভিনয় অভিপ্রেত। কিন্তু তারপর আঘাত খাইয়া আঘাত উপভোগ করা, আঘাতকারীকে গাঢ়তরভাবে ভালবাসা অথবা প্রেমিকের জন্য দুঃখের অনলে তিলে তিলে আত্মদান করা—স্ত্রীলোকের স্বভাবধর্ম। পার্বতী দেবদাসের ছিপের বাড়ি খাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভৃগু-পদচিহ্নের মতো আমরণ সেই ক্ষতচিহ্নকে তাহার অক্ষুণ্ণ প্রেমের পদক করিয়া রাখিয়াছিল কেন, তাহার মীমাংসা বোধহয় এখন সহজ হইয়া যাইবে। যে পুরুষকে তাহার ভালো লাগিয়াছে, সে যদি তাহাকে জোর করিয়া ধর্ষণও করে, তাহা হইলে বেদনার বারাসতের মধ্য দিয়া সে সুখের স্বর্গভূমি দেখিতে পায়।...লিও টলষ্টয় ও মহাত্মা গান্ধীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধও মর্ষণকামীদের তৃপ্তি-সাধনের পলিটিক্যাল্ প্রণালী।

নিতাই যে কলসীর কাণা খাইয়া রক্তাক্ত কলেবরে জগাই-মাধাইকে প্রেম দিতে গিয়াছিলেন, সে প্রেম নারীজনোচিত বা নারীত্বপ্রধান পুরুষের যোগ্য ধর্ম; তাহা উচ্চস্তরের মর্ষণকামের দৃষ্টান্ত। এই কারণে বৈষ্ণব ধর্মাচারে আমরা মস্তকের কেশ-সংরক্ষণ, শ্মশ্রুমুণ্ডন, এত সহনশীলতা, তিতিক্ষা, অনুনয় ও আঁখিজল, গদগদ সখি-ভাব ও আত্মসঙ্কোচের বাড়াবাড়ি দেখিতে পাই। আসল কথা, আমাদের সত্তায় যেটুকু স্বভাবদত্ত নারীত্ব-টুকু প্রচ্ছন্ন থাকে, সেইটুকুকে ধ্যান, ধারণা ও অভ্যাসযোগের দ্বারা ফুটাইয়া তোলা এই ধর্মের উদ্দেশ্য।

—০—

==সপ্তম পটল==

রুচি-বৈচিত্র্যের নিদান-তত্ত্ব

যৌনপ্রেম সম্বন্ধে পাত্র ও ক্ষেত্র-নির্বাচনে মানুষের রুচির এত বিভিন্নতা দেখা যায় কেন, সংক্ষেপে তাহার উত্তর খুঁজিতে গেলে, আমাদিগকে তিনটী প্রাকৃতিক বিধির কার্যকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

(১) মানুষের পুরাপুরি, বেশি বা কম শৈশবানুবন্ধ,—অর্থাৎ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্নেহময় আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অবিস্মরণীয় সংসক্তি।

(২) জন্মগতভাবে ও বিভিন্ন মাত্রায়—নরের মধ্যে নারীত্বের ও নারীর মধ্যে নরত্বের সংমিশ্রণ; ব্যক্তিগতভাবে সকলের দেহে পার্থ-তীর্থক্, অবটু, অধিবৃক্কীয় ও যৌনগ্রন্থিসমূহের অন্তঃস্রাবী রসের তারতম্য।

(৩) স্বভাবত পুরুষের মধ্যে সাদনবৃত্তি ও নারীর মধ্যে মর্ষণবৃত্তির প্রকোপ; এবং গড়্‌পড়্‌তা নরনারীর মধ্যে এই উভয়বৃত্তির অল্পবিস্তর বিদ্যমানতা।

দ্বি-মেরুত্ব বিধি

এই সূত্রে মনোবিজ্ঞানের আর একটি প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে দুই-চারি কথা পাঠকগণকে শুনাইয়া দিতে চাই। তথ্যটির নাম হইল 'দ্বি-মেরুত্ব বিধি' (The Law of Bipolarity) বা 'বিরুদ্ধ-প্রবণতা'।

আমরা কেহই অস্বীকার করিতে পারি না যে, দেবত্ব ও পশুত্ব দিয়া মানুষের সত্বা গঠিত—সু ও কু উভয় বৃত্তির বীজ লইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। বংশ-প্রভাবে ও শিক্ষা-প্রভাবে একটি বৃত্তি জাগ্রত হয়—আর একটি সুপ্ত থাকে, একটি ফলবান হয়—আর একটি নিষ্ক্রিয় থাকে; অথবা ক্ষেত্র ও পাত্র-বিশেষে উভয় প্রকারের বৃত্তিই অল্প-মাত্রায় সক্রিয় থাকিতে পারে (Ambivalence)।

প্রত্যেক মানুষের অন্তরে বিপরীতধর্মী এক জোড়া করিয়া গুণ আছে। কাম ও নিস্পৃহা, ক্রোধ ও তিতিক্ষা, মহত্ব ও নীচতা, লোভ ও ত্যাগ, কান্তিরস ও কদর্যতাপ্রিয়তা, প্রেম ও জুগুপ্সা, দয়া ও নিষ্ঠুরতা, কঠোরতা ও কোমলতা, ভাব-ভূয়িষ্ঠতা ও বস্তুতান্ত্রিকতা, একনিষ্ঠা ও বহুমুখিতা, সাধুতা ও চৌর্য, উচ্চরুচি ও হীনপ্রবৃত্তি প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্মের বৃত্তিগুলি আমাদের প্রত্যেকের ভিতরই বাস করিতেছে,—এক দেউলে সাপ আর নেউলের মতো!

কাযে-কাযেই উভয়ের মধ্যে আধিপত্যের সংগ্রাম চলিতেছে নিত্য। যে বৃত্তিটি জয়ী হয়, সে থাকে সংজ্ঞাত মনে, এবং তাহার বিপরীত বৃত্তিটি বিজিত হইয়া নির্জ্ঞাত মনোলোকে নির্বাসিত হয়। উহা সর্বদা কোনো-একটা অনুকূল ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বাহিরে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গত মনে আসিবার চেষ্টা করে।...কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে হিংসাভাবকে অবদমিত রাখিয়া, ভক্তপ্রেমিক রথ-চালক শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে চালনা করিতেছিলেন। কৌশলী কুরুবৃদ্ধের বাণের প্রভাবে জর্জরিত হইয়া, তাঁহার নির্জ্ঞাত মনোলোক হইতে করালমূর্তিতে সংহার-বৃত্তি বাহির হইয়া আসিল; নিজের প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইয়া, তিনি প্রথম ও শেষবারের জন্য সুদর্শন-চক্র ধারণ করিলেন।

প্রেম ও ঘৃণা—একই পত্রের এ-পিঠ্ আর ও-পিঠ্

ব্যক্তিবিশেষকে যখন আমরা ভালবাসি, তখন তাহার প্রতি ঘৃণার বৃত্তিটিও ক্ষুদ্র বটবীজের মত লাগিয়া থাকে। ঘটনা-সংঘাতে ঘৃণাভাব প্রবল হইয়া উঠিয়া, ভালবাসাকে টুঁটি টিপিয়া মনোবনবাসে পাঠাইতে পারে। সংজ্ঞাত বিভাগে যাহার যে বৃত্তিটি যত প্রবল, তদনুপাতে তাহার বিপরীত বৃত্তিটিও নির্জ্ঞাত বিভাগে প্রবল হয়। যেন উপরে পদ্ম, নীচে পঙ্ক। যে পদ্ম যত বড়, তাহার নিচে তত বেশি পঙ্ক। যে গভীর প্রেমিক, যে উৎকট বিদ্বেষী।

একটা লোক জীবনের একই সময়ে লোক-বিশেষকে বা বস্তু-বিশেষকে অত্যন্ত পছন্দ করিতে, এবং অন্য সকলকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতে পারে; অথবা ইহার বিপরীত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। আবার, কাল যাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতাম, আজ শত্রু-জ্ঞানে তাহাকে পদতলে নিষ্পেষিত করিতে চাই। মন কখনো ধনাত্মক হইতে ঋণাত্মক হয়, আবার ঋণাত্মক হইতে ধনাত্মক স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

আসল কথাটা হইতেছে এই যে, আমরা যাহাকে ভালবাসি, প্রতীয়মানত তাহার দোষগুণ উভয়কেই ভালবাসি; অর্থাৎ তাহার গুণগুলিকে সংজ্ঞাতে রাখিয়া পূজা করি, আর দোষগুলির সংস্কারকে নির্বীর্য করিয়া নির্জ্ঞাতের অন্ধকারায় প্রেরণ করি। প্রেমপাত্র যখনই আমাদের স্বার্থে একটা বৃহৎ আঘাত দেয় কিম্বা ক্রমাগত ক্ষুদ্র আঘাত দিতে আরম্ভ করে, তখন সেই খর্বাকার ঘুমন্ত দোষের সংস্কারগুলি বৃহদাকার হইয়া আমাদের সংজ্ঞাতে আসে; ঘৃণাভাব তখন দুর্ধর্ষ হইয়া ভালবাসার

সংস্কারকে অবদমন করিয়া ফেলে।…"Familiarity breeds contempt"—কথাটা মনোবিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে মাজিয়া খাঁটি বলিয়া প্রতিপন্ন।

দারুণ ঘৃণা বা আন্তরিক অপছন্দ একটা অতি সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া যে অপ্রমেয় প্রেমে পরিবর্তিত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা কেবল উপন্যাসেই পাই না, বাস্তব জগতেও পাই। 'মন্ত্রশক্তি'তে পিতৃধনগর্বিতা বাণীর আকস্মিক পরিবর্তন—বাহ্যত অম্বরনাথের মরণাপন্ন অসুখ ও সম্ভাব্য বৈধব্য-জ্বালার দুশ্চিন্তাকে উপলক্ষ করিয়া ঘটিয়া থাকিলেও, আসলে সম্ভবনীয় হইয়াছিল নির্জ্ঞাত ও সংজ্ঞাতের ওই বৃত্তিগত আদান-প্রদানের ফলে। নিত্যকার জীবন-স্রোতে অনুরূপ ঘটনা যথেষ্ট চোখে পড়ে। 'ভাব' হইতে 'আড়ি'—'আড়ি' হইতে 'ভাব'!

অত্যন্তের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত

যে একটা বৃত্তি-মেরুর চরমপ্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকে, বহুদূর বোধ হইলেও তাহার পক্ষে বিপরীত বৃত্তি-মেরুর চরমপ্রান্তে পৌছানো অতি সহজ। 'সর্বমত্যন্তম্ গর্হিতম্'—এই ঋষিবাক্যটি আধুনিক মনোবিশ্লেষকগণ সর্বান্তঃকরণে মানিয়া লইয়াছেন। সেইজন্য অতিশয় সুবোধ সন্তান, অতি সংসারভক্ত পিতা, বিষম শোকাতুরা মাতা, নিতান্ত বিরহ-কাতর প্রেমিক, অত্যন্ত সেবা-তৎপরা পত্নী—দেখিলেই সন্দেহ করিতে হয় যে, উহাতে সম্ভবত কিছু খাদ্ সংমিশ্রিত। নতুবা, উহাদের ব্যবহার ষোলো আনা খাঁটি হইলেও, কাল হউক বা দশদিন পরে হউক, নিশ্চয় উল্টা রাস্তায় হাঁটিবে এবং অত্যন্ত বিসদৃশভাবেই।…গভীরতম প্রেমিক

পত্নী হারাইয়া, হয় ঘোর সমাজবিদ্বেষী সন্ন্যাসী হন্, নচেৎ আবার বিবাহ করিয়া সংসারী সাজেন। মনোবৈজ্ঞানিক ছাড়া আর কে ধারণা করিতে পারিয়াছিল যে, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-প্রণেতা চন্দ্রশেখরবাবু পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিবেন?

'অত্যন্তে'র প্রতিক্রিয়া 'অত্যন্ত'। মধ্য পন্থাই, মনে হয়, সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। অনেক সময় অত্যন্তের পরবর্তী ধাপ্ হয় কৃতান্তের স্নিগ্ধ পরশ। সামান্য সন্দেহের বশে, ঈষৎ নিরাশায়, একটা উপেক্ষার কথায়, অত্যুগ্র প্রেমিক প্রায়ই প্রেমিকাকে হত্যা করিয়া নিজে আত্মহত্যা করে, নচেৎ ফাঁসির জন্য প্রস্তুত হইয়া থানায় গিয়া আত্মসমর্পণ করে। ঈষৎ তপ্ত মধ্যপন্থী হয়তো অনুরূপ অবস্থায় প্রেমিকাকে পরিত্যাগ করিয়া, অথবা বড় জোর তাহার সন্দেহিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুন্ করিয়া, প্রাণভয়ে পলাইয়া যায়।…

নিম্নগ প্রেম

পূর্বেই একটু আভাস দিয়াছি—কেন লোক যৌবনকালে নিজের বংশমর্যাদা, পদ-গৌরব তুচ্ছ করিয়া, নিম্নশ্রেণীর কোনো স্ত্রী বা পুরুষকে ভালবাসে ও বিবাহ করে—তাহার জন্য অসামান্য দুর্গতিসমূহের সম্মুখীন হয়। এমন লোকও আছে যাহারা নীচজাতীয় কুশ্রী দাস-দাসী, পাচক, মোটর-চালক, খানসামা, আয়া-প্রভৃতিকেই বাছিয়া বাছিয়া পছন্দ করে, এবং উচ্চবংশে বিবাহিত হইয়াও ইহাদের কাহারো সহিত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে আজীবন যৌন-সংসর্গ না করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না।

ইহার আদিম কারণ হইতে পারে,—একদিকে সন্তানের প্রতি

পিতা-মাতার দারুণ অবহেলা, তাঁহাদের নিজেদের দাম্পত্য-জীবনে সুস্পষ্ট গরমিল্, এবং অন্যদিকে ভৃত্যের হস্তে শিশুর যাবতীয় যত্নের ভারার্পণ। শিশু যাহার সেবা পায়, সেই সেবকের রূপ-গুণের প্রতিচ্ছবি আপন অজ্ঞাতসারেই যৌন-জীবনের আদর্শের মধ্য দিয়া শাশ্বত করিতে চাহে। তাহার সংজ্ঞাত মনেও এই বিশ্বাস বাল্যকাল হইতে বদ্ধমূল হইতে পারে যে, একমাত্র দাস-দাসী ছাড়া সত্যকার আদর-যত্ন করিতে—ভালবাসিতে কেহ পারে না; তাহার পিতামাতা শিক্ষিত, উচ্চবর্ণের হইয়াও তাহাকে হতাদর করিয়াছেন—অবহেলা করিয়াছেন। সুতরাং আভিজাত্যের প্রতি বিরাগ জন্মানোয় তাহাদের যৌনপ্রেম নিম্নাভিমুখী না হইয়া পারে না।

দ্বিতীয় কারণ,—যাহারা পিতামাতার অত্যন্ত কড়া-শাসন ও নৈতিক বন্ধনের মধ্যে মানুষ হইয়াছে, তাহারা একটু বড় হইয়াই উহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পরিবার, সমাজ (বা রাষ্ট্র) ও ধর্ম—এই তিনটির কর্তৃত্ব স্বাধীন-চেতা যুবকের স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন বিরাগ উৎপাদন করে। নিম্নবংশের, নীচ-জাতীয় যুবতীর প্রেমে মজিয়া, কোন নিরাশ্রয়া বিধবা অথবা ধর্ষিতা নারীকে বিবাহ করিয়া, তাহারা ওই তিন বস্তুর রূঢ় আচরণের যোগ্য প্রতিশোধ লয়—তিনটির অক্ষুণ্ণ প্রতাপকেই তুড়ি দিয়া তুচ্ছ করে।

তৃতীয় কারণ—নিম্নজাতীয়ের দারিদ্র্য ও দুরবস্থার প্রতি আশৈশব একটা সজাগ সহানুভূতি ও বাল্যকাল তাহাদের উদ্ধার-সাধনের ঐকান্তিক স্পৃহাও অনেক সময় যুবক-যুবতীদিগকে নিম্নশ্রেণীর কোন ব্যক্তিকে ভালবাসিতে প্ররোচনা দেয়। একপক্ষের উপর সাম্যবাদের প্রয়োগ ও তাহার দুরবস্থার উন্নতিসাধন করিতে গেলে, যে দিক্ দিয়া হউক, আত্মপক্ষের অবনতি-সাধন করা ছাড়া উপায় নাই। ইহারা মনে-প্রাণে

বিশ্বাস করে, প্রধানত তাহাদের অনঙ্গ-অনলে পুড়িয়াই ঐ সর্বহারা সৃষ্টি-ছাড়ার দল সংশুদ্ধ হইবে—উচ্চস্তরে উঠিবে। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই, কোন সংরক্ষণশীল পণ্ডিতের পুত্র এক ঝিয়ের মেয়েকে বিবাহ করিতে ব্যগ্র হইতেছে, এক মন্ত্রীপুত্র পিতার নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করিয়া কোনো বারবনিতার অসুন্দরী কন্যাকে পত্নীর আসনে বসাইয়া দিতেছে, এক অধ্যাপকের কলেজগামিনী দুহিতা কোন পঞ্জাবী মোটর-পরিচালকের সহিত প্রেম করিয়া দেশান্তরিত হইয়াছে।

ইংরাজী ও জার্মান দেশীয় মনোবিশ্লেষণ বিষয়ক বহু প্রামাণ্য গ্রন্থে এইরূপ নিম্নগ প্রেমের বহু চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত গ্রথিত হইয়াছে।...বাংলা দেশে অতি সাধারণ ধরণের একটা লোক-প্রবচন চলিত আছে—'যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।'...কিন্তু উচ্চশ্রেণীর লোক হাড়ি-ডোমে কেন মজে, তাহার নিদান নির্ণয় করিয়াছেন ফ্রয়েড্ ও তাঁহার অনুগামী পণ্ডিতগণ। এই নিদানতত্ত্বকে বিশ্বের মনীষিগণ কোন প্রতিকূল যুক্তিবাদ দিয়া নিরসন করিতে সমর্থ হন নাই। উহার সমর্থনমূলক কয়েকটি উদাহরণ গ্রন্থকারের দপ্তরে সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে দুইটি এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

আত্মকাহিনী

বি-বাবু কোন জেলার খ্যাতনামা উকিল। তিনি গ্রন্থকারের যৌন-বিষয়ক গবেষণায় বস্তুগতভাবে সহায়তা করিবার জন্য, নিজের যৌন-জীবনের আমূলতথ্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন; উহা হইতে কতক অবান্তর অংশ বাদ দিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল।...

"আমার যৌন-জীবনের কয়েকটি তথ্য সাধারণের নিকট অত্যন্ত

ন্যকারজনক হইলেও আপনি ঐগুলির দ্বারা কিছু গবেষণার খোরাক্ পাইবেন বলিয়া পূজার ছুটিতে একাকী বাসায় বসিয়া এই আত্মকাহিনী লিখিতেছি। আমার বয়স বর্ত্তমানে প্রায় তিতাল্লিশ বৎসর। * * প্রায় একাদশ বৎসর বয়স হইতে আমি নিয়মিত হস্তমৈথুন করিতে আরম্ভ করি। আমি একটি ছোটখাট জমিদারের আদুরে ছেলে ছিলাম। আমাদের বাটীতে ছয় জন ঝি-চাকর ছিল। একটি খাসিয়া দেশের ঝি বাল্যকাল হইতে আমাদের বাড়ীতে ছিল; তাহার বাপ-মা কলেরায় মারা যায়। মেয়েটার নাম ছিল লা-লী,—ইচ্ছাপূর্ব্বক নাম হইতে মাঝের একটা অক্ষর উহ্য রাখিলাম। সে বোধ হয় আমার চেয়ে সাত-আট বৎসরের বড় ছিল এবং দেখিতে খুব খারাপ ছিল না। মাতার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, এবং বাবার সহিত ভাল বনিত না বলিয়া তিনি ছেলেপিলে ফেলিয়া, অনেক সময় আসামে তাঁহার পিতৃগৃহে থাকিতেন। আমি দুই বৎসর বয়স হইতে উক্ত ঝিয়ের তত্ত্বাবধানে মানুষ হইতাম।

"অনেক সময় আমার পৃথক শোয়ার ঘরে সারারাত্র লা-লী আমার শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিত। আমার বেশ মনে পড়িতেছে, আমি ঘুমের ঘোরে যখন কাঁদিয়া উঠিতাম, তখন সে আমার মুখে মাইপোষ ভরিয়া দিত। ডাক্তার মাইপোষ ছাড়াইয়া লইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু চারি বৎসর বয়স পর্যন্ত মাইপোষের জন্য রাত্রে খুঁৎ খুঁৎ করিতাম। একদিন অর্দ্ধ-ঘুমের ঘোরে লক্ষ্য করিলাম যে, আমি মাইপোষের জন্য আব্দার করিতেই আমার খাটের পার্শ্বে মেঝের উপর শায়িতা লা-লী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া আমার লেপের ভিতর শয়ন করিল, এবং ত্বরায় আমার মুখের ভিতর তাহার সুডৌল স্তনের বোঁটা প্রবেশ করাইয়া দিল। মাইপোষের সহিত ইহার পার্থক্য বুঝিবার মত শক্তি

আমার ছিল; কিন্তু এই নূতনতর অভিজ্ঞতা আমার নিকট অধিকতর আরামপ্রদ বলিয়া বোধ হইল। সেদিন হইতে চাওয়া ও না-চাওয়ার ফলে প্রত্যহ রাত্রে লা-লীর স্তনবৃন্ত আমার মুখে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে একটা স্পষ্ট বোধ জন্মিল যে, লা-লী এতদ্বারা নিজেও খুব তৃপ্তি লাভ করে। অথচ তখন তাহার বয়স চোদ্দো বৎসরের বেশী নয়, এবং তখনও সে অবিবাহিতা।"

"পাঁচ বৎসরের পর হইতে কিছুকাল আমি আমার এক বিধবা খুড়ীমাতার কাছে শুইতাম। লা-লী এক নেপালী দারোয়ানের সহিত পলাইয়া যাওয়ায়, একটি মধ্যবয়স্কা নূতন চাকরাণীর উপর আমার দিনের বেলাকার তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে। সে সুযোগ পাইলেই আমার পুরুষাঙ্গ লইয়া নাড়া-চাড়া করিত। ইহার ফলে একটা অতিক্ষীণ আনন্দের অনুভূতি জাগিত এবং প্রায়ই ইন্দ্রিয়টি উত্থিত হইত; পরমুহূর্ত্তেই প্রস্রাব করিবার অদম্য ইচ্ছা জাগিত।"

"দশ বৎসরের সময় একদিন সন্ধ্যাকালে আমার পড়ার ঘরে আসিয়া ঝি-টি আমার গোপন অঙ্গ লইয়া ক্রীড়া করিবার সময়, হঠাৎ মা আসিয়া সেই দৃশ্য দেখেন। ঝিকে বেদম প্রহার করিয়া, মাহিনা না দিয়াই সেই রাতেই বিদায় দেওয়া হয়। আমিও বাবা-মার হাতে উত্তম-মধ্যম লাভ করি। * * রাত্রে বিছানায় শুইয়া নিজের লাঞ্ছনার কথা ভাবিয়া যত না কষ্ট হইল, তাহার অপেক্ষা বেশি ক্লেশ বোধ করিলাম রাত্রের আঁধারে বিতাড়িতা দাসীর নিঃসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া। ইহার কিছুদিন পরে আমি নিজে নিজেই পুরুষাঙ্গ লইয়া ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হস্তমৈথুনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করি।"

"তারপর আমি সতেরো বৎসর পর্যন্ত নিয়মিত হস্তমৈথুনেই নিরত

থাকি। আঠারো বৎসর হইতে কলিকাতায় কোন বিদেশী মিশনারী-পরিচালিত মেসে থাকিয়া কলেজে পড়াশুনা করিতে হয়। ঐ সময় আমি মাঝে মাঝে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অতি নিম্নশ্রেণীর বারবনিতার গৃহে যাইতাম। কিন্তু তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে কোন কামের প্রলোভন থাকিত না। তাহাদের সহিত আধ ঘণ্টাটাক্ বাজে গল্প করিতাম; বাহির হইয়া আসিবার পূর্বে পারিশ্রমিক হাতে দিয়া, গণ্ডে ও স্তনের উপর ওষ্ঠ স্পর্শ করিতাম মাত্র। উহাদের কাহারও কাহারও সম্বন্ধে প্রেমের কবিতা লিখিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে।

"বাইশ বৎসরে আমার বিবাহ হয়। স্ত্রী খুব উচ্চবংশের ধনীর কন্যা ছিলেন, কিন্তু দেখিতে খুব সুন্দরী ছিলেন না। * * প্রত্যহই আমি তাঁহার সহিত সুরতে প্রবৃত্ত হইতাম বটে; কিন্তু প্রত্যেকবার সংযোগের জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই অপরিহার্য্যভাবে আমাকে তাঁহার স্তনবৃন্ত চোষণ করিতে হইত। একটি সন্তান জন্মিবার পর, স্ত্রীর প্রতি যৌন আকর্ষণ আমার আশ্চর্য্যভাবে কমিয়া গেল। তিনি প্রসূতি-আগার হইতে বাহির হইয়া, আমাদের শোওয়ার ঘরের একপ্রান্তে পৃথক শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। * *

"তখন আইন পাশ করিয়া—সহরে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছি। কিছুদিন পরে একটি ঘটনা ঘটিল। তখন বৈশাখমাস, দারুণ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর প্রাণী আইঢাই করিতেছে। নিজের বৈঠকখানা-ঘরে তক্তাপোষের উপর একাকী শুইয়া ছটফট্ করিতে ছিলাম। স্ত্রী পাশের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছে। এমন সময় বাড়ীর যুবতী ঝি ডিবায় পান লইয়া আসিল। আঁতুড়ে প্রবেশ করিবার পূর্বে আমার স্ত্রী তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল। আমি

তাহাকে পাখা লইয়া একটু বাতাস করিতে বলিলাম। সে শিয়রের নিকট দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল। কয়েক মিনিট এইভাবে কাটার পর আমি তাহাকে তক্তাপোষের উপর বসিয়া বাতাস করিতে বলিলাম। সে জড়োসড়ো হইয়া ও মাথা নিচু করিয়া বসিল। তারপর চক্ষু মুদিয়া নির্দোষ অসাবধানতার ছলে আমার ডান হাতখানা তাহার কোলের উপর রাখিলাম। তাহার তরফ্ হইতে কোনো আপত্তি আসিল না। তারপর আর একটু অগ্রসর হইয়া, তাহার দেহের স্থানবিশেষ লইয়া খেলা করিতে লাগিলাম। শেষে বিনা বাক্যব্যয়ে সে আমার নিকট তাহার দেহখানি দান করিল।

স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার অনেকখানিই এই নীচবংশীয়া দাসী হরণ করিয়া লইল। তারপর প্রায় প্রতিদিনই সুযোগমতো দিনে বা রাত্রে তাহার সহিত যৌনসম্মিলন চলিতে লাগিল। বৎসর খানেক পরে একদিন স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িয়া গেলাম। ফলে ঝি তৎক্ষণাৎ বিতাড়িত হইল এবং স্ত্রীর সহিত আমার প্রায় মাস দেড়েক্ কথা বন্ধ রহিল। এবার মধ্যবয়স্কা, অধিকতর কুৎসিতা নূতন এক দাসী নিযুক্ত হইল। কিন্তু কিছুদিন পরে স্ত্রীর নিকট কঠোর প্রতিজ্ঞাসত্ত্বেও আমি ওই সহজলভ্যা দাসীর দেহ উপভোগ করিতে দ্বিধা বোধ করিলাম না। নিজের বাটীতে জানাজানি হওয়ার আশঙ্কায়, আমি রাত্রি নয়টার পর ঝি'র কুটিরে ঢুকিয়া আমার হীনবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া আসিতাম।

প্রায় তিনবৎসর কাল এই ব্যাপার গোপনে চলিল। শেষে একদিন আমার বড়-সম্বন্ধী আমাকে রাত্রি দশটার পর ঝি'র বাসা হইতে অপরাধীর ন্যায় বাহির হইতে দেখিয়া, সন্দেহপরবশ হইয়া আমার

চালচলনের উপর কয়েকদিন নজর রাখে এবং তথায় যাতায়াতের হীন উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে। স্ত্রী পুনরায় অগ্নিমূর্ত্তি ধরিলেন এবং কাঁদিয়া-কাটিয়া সংসারে একটা বিষম অশান্তির সৃষ্টি করিলেন। দাসী সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাহিনা পাইয়া চিরদিনের মতো বিদায় হইল। দারুণ অনুশোচনায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া শেষে স্ত্রীর মাথা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আর ওপথে যাইব না।...

একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আমি ক্রমে ক্রমে স্ত্রীর নিকট নিস্পৃহ ও ভোগশক্তিহীন হইয়া পড়িলাম। * * অথচ তাহার প্রতি আধ্যাত্মিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার ভাব কিছুমাত্র কমে নাই, ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি।

বৎসর আড়াই পরে আর একটি হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা ঝি বাড়ীতে বহাল হইল। আমার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় বাড়ীতে একটি ছোট-খাট ভোজের আয়োজন হয়। ঐ সময় বৃদ্ধা ঝির এক বিধবা কন্যা তাহার মাতার সহকারিণীরূপে দিন তিনেক আমাদের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিয়াছিল। বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ে আমাকে ঐ কয়দিন বৈঠকখানা-ঘরে সাত বৎসরের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লইয়া রাত্রি যাপন করিতে হয়। দ্বিতীয় দিনে দাসী-দুহিতাকে সামান্য ফুস্‌লানিতে হাত করিয়া ফেলিলাম। রাত্রি বারটার পর, বাড়ী নিঝুম্ হইলে, সে আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। নিজের হ্রাসপ্রাপ্ত ভোগ-শক্তি সম্বন্ধে আমার মনে যে আক্ষেপ ছিল, তাহা ওই নীচজাতীয়া, রূপহীনা কিন্তু স্বাস্থ্যবতী যুবতীর সংস্পর্শে আসিয়া, তখনকার মতো দূর হইয়া গেল। পাত্র-বিশেষে আমার রতিশক্তির তারতম্য দেখিয়া আমি নিজেই অবাক্ হইয়া

গেলাম। * * মেয়েটি তারপর আর আমাদের বাটীতে আসে নাই; কয়েকদিন পরে সে নাকি তাহার শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছিল।

"তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যে আরও তিনটি দাসী এবং পাচিকার এক স্বামি-পরিত্যক্তা ভগ্নীর সহিত আমার অস্থায়ী ও কলঙ্কিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। শেষোক্তের সহিত একটু বাড়াবাড়ি হইয়া পড়ায়, ব্যাপারটা আবার আমার স্ত্রীর কর্ণগোচর হয়। তিনি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করেন, বহুকষ্টে তাঁহাকে বাঁচাই। তদবধি আমি একরকম 'ভালছেলে' হইয়া আছি। কিন্তু তথাপি এখনও মাঝে মাঝে ঈষৎ শ্যামবর্ণা, নিম্নজাতীয়া যুবতীদের দেখিলেই আত্ম-দমন স্বত্বেও আমি মনে মনে চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া উঠি। বিশেষভাবে যাহাদের নাসিকাপ্রান্ত ঈষৎ খর্ব্ব ও চক্ষুতে সরু করিয়া কাজলের রেখা টানা থাকে, তাহাদিগের মুখ আমার জাগ্রৎ-স্বপ্নে কয়েকদিন ধরিয়া আধিপত্য করে। আর একটা জিনিষ আপনার নিকট স্বীকার করিতে চাই যে, স্ত্রীর সহিত সহবাস-কালে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কল্পনার নেত্রে ভূতপূর্বা প্রেমভাগিনী কোন নীচজাতীয়া নারীর সহিত তাহাকে একাত্ম করিয়া না দেখি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার জনন-যন্ত্র আদৌ কাঠিন্য প্রাপ্ত হয় না।"...

এই কেস্‌টি পড়িয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন—ভদ্রলোকের এই বিকৃত রুচির মূল কোথায়, ও কেমন করিয়া তাহা উদ্ভূত হইল। 'যাহাদের নাসিকাপ্রান্ত ঈষৎ খর্ব ও চক্ষুতে সরু করিয়া কাজলের রেখা টানা', তাহাদের প্রতি উহার উদগ্র পিপাসার কারণ রোগী নিজে নির্ণয় করিতে না পারিলেও বৈজ্ঞানিক ওঝার নিকট তাহা স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। খুব সম্ভবত বাল্যকালের সেই খাসিয়া দাসী লা-লীর

নাসিকা ঈষৎ খর্ব ও চক্ষুপ্রান্তে কাজলের রেখা টানা অভ্যাস ছিল।

ধনীকন্যাদের রুচি-বিকার

মেয়েরা বিদ্যালয়ে গিয়া উচ্চ শিক্ষা পাইলেই তাহাদের নৈতিক চরিত্র কলুষিত হয় বা হওয়ার আশঙ্কা থাকে খুব বেশি,—একথা যে সত্য নয়, তাহা আমরা বহু বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা বলীয়ান্ হইয়া বলিতে পারি। আসল কথা হইতেছে, যাহারা ধনীর সন্তান এবং শৈশব হইতে ঝি-চাকরের তত্ত্বাবধানে থাকে, যাহাদের পিতা মদ্যপ ও দুশ্চরিত্র এবং মাতা দুর্বিনীতা ও দুস্তোষনীয়া, যাহারা মা-বাপের প্রত্যক্ষ স্নেহ ও সচ্চরিত্রের সংস্পর্শে আসিতে পায় খুব সামান্যভাবেই, তাহারা বিদ্যালয়ের মুখ না দেখিলেও উত্তরকালে প্রেমিক সম্বন্ধে বিকৃতরুচিগ্রস্তা ও প্রেম-বিষয়ে অব্যবস্থিতচিত্তা হইতে পারে; এরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ আমাদের ফাইলে আছে।...

আবার স্বভাবত ধীশক্তিমতী ও অতিশয় স্বাধীনচিন্তাশীলা কন্যা যদি পিতামাতার সংসারে অত্যন্ত কঠোর শাসন ও দমনের মুষ্টিচাপে মানুষ হয়, সংসারের সুখ-সুবিধার নিমিত্ত আবাল্য যাহারা নিজেদের ক্ষুদ্র সুখসুবিধাগুলি বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়, তাহারাও শত ধর্মশিক্ষা পাওয়া স্বত্বেও সুযোগ পাইলে, হীনপ্রবৃত্তির স্রোতে ঝাঁপ দিয়া অবুঝ পিতামাতার হৃদয়হীন পালনের প্রতিশোধ লইতে পারে। বিবাহিত অবস্থায় সারা-যৌবন নিরাপদে অতিবাহিত হইয়া গেলে, ইহারা বহুলাংশে এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সর্ববিষয়ে মধ্যপন্থাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ।

মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থগণ অর্থনীতি, সমাজ-নীতি ও পারিবারিক নীতির দিক্ দিয়া চিরকালই মধ্যমার্গচারী। ইহাদের কন্যারা চাকরের সংসর্গ পায় অতি অল্প, কর্মব্রতী মা-বাপের সস্নেহ শাসন ভোগ করে যথেষ্ট ও লেখাপড়া শিখিলেও স্বাধীনতা পায় অত্যন্ত পরিমিতভাবে। কাযেকাযেই উহারা প্রায়শ বিকৃতরুচিগ্রস্তা হয় না।

দৃষ্টান্ত

শ্রীমতী শ- পূর্ববঙ্গের কোনো নামজাদা শহরে বিখ্যাত ধনী পরিবারের মেয়ে। আশৈশব সে মা-বাপের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ এক প্রকার পায় নাই বলিলেই চলে; ঝি-চাকরগণই তাহাকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। খুব ছোটকালে বাটীর এক সহিস তাহাকে কাঁধে লইয়া বেড়াইত। অনেক সময় আস্তাবলে বসিয়া সে ঘোড়ার ডলাই-মলাই দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিত। দশ বৎসর বয়সে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এগার বৎসর বয়সের সময় একজন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ভৃত্য একদিন তাহার গোপন অঙ্গ লইয়া ক্রীড়া করে, তাহাতে সে মৌন সম্মতি দিয়াছিল; অতঃপর প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ভৃত্যটি সুযোগ পাইলেই এইরূপ করিত।

বাড়ীর একজন নূতন গৃহশিক্ষক তাহার চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে একদিন তাহাকে সিনেমা দেখাইতে লইয়া গিয়া, গাড়ীর মধ্যে তাহাকে প্রেম-নিবেদন-প্রসঙ্গে চুম্বন করে। তখনকার মতো সে চুপ করিয়া থাকিয়া, বাটীতে ফিরিয়া মাতাকে এই ঘটনা বলিয়া দেয়। বিধবা মাতা শিক্ষকটিকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিয়া বরখাস্ত করেন। কিন্তু পূর্বোক্ত চাকরটির প্রতি তাহার একটা দুর্নিবার মোহ জন্মিয়া যায়। একদিন

অসাবধানতার ছলে ওই সাহসী ভৃত্যটি তাহার বক্ষে হস্তার্পণ করে; তাহাতে শ- তাহার গালে সজোরে একটা চড় বসাইয়া দেয়, অথচ তাহার ধৃষ্টতা বিষয়ে কোন কথাই মাতার নিকট উল্লেখ করে নাই। কয়েক মাস পরে চাকরটি ব্যক্তিগত কারণে চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়।

ঐ সময় একদিন রাত্রে সে তাহার বিধবা মাতাকে বাটীর বলিষ্ঠদেহী বাজার-সরকারের সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পায়।...অতঃপর সে নিজেদের সেরেস্তার এক যুবক গোমস্তার সহিত প্রেমে পড়ে এবং কয়েকদিন গোপনে তাহার সহিত যৌনসংসর্গ করে। কিছুদিন পরে প্রায় একই সময় সে বাড়ীর একজন ছোক্‌রা চাকরকে প্ররোচিত করে এবং মোটর-গাড়ীর চালকের সতৃষ্ণ দৃষ্টির আশাতীতরূপ অনুকূল উত্তর দেয়। মোটর-চালকের সহিত তাহার কদর্য প্রেম কিছুদিন চলিতে না চলিতেই তাহার বিবাহ হইয়া যায়। পাত্র সুপুরুষ, সুশিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন; কিন্তু তিনি শত চেষ্টা সত্বেও শ-য়ের মন পাইলেন না। কিছুদিন বাদে সে স্বামীর মোটর-চালকের সহিত নগদে-অলঙ্কারে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসে। বর্তমানে তাহারা দক্ষিণ কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছে। তাহার প্রেমিক জাতিতে কৈবর্ত, বিশেষ কিছুই লেখা-পড়া জানে না, এবং দেখিতে খুব সুন্দর নয়। তাহারই পয়সায় লোকটা একখানা মোটর কিনিয়া প্রাইভেট্ ট্যাক্সিরূপে ভাড়া খাটাইয়া জীবিকার্জন করিতেছে।...

মোটর-ড্রাইভারের প্রতি আসক্তির কারণ

এই প্রসঙ্গে একটা কথা পাঠকপাঠিকাবর্গকে শুনাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। গৃহের মোটরগাড়ীর ড্রাইভারের প্রতি তরুণীদের

একটা স্বাভাবিক মোহ প্রায় ক্ষেত্রেই জন্মিতে দেখা যায়। এই মোহ অনেক সময় প্রেমে পরিণত হইতে পারে। ধনীগৃহের রূপসী কন্যা এ দেশীয় বা অন্য দেশীয়, হিন্দু বা মুসলমান, বাড়ীর গাড়ী অথবা স্কুলের গাড়ীর ড্রাইভারের হাত ধরিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে, অথবা তাহার সহিত গোপনে প্রেমালাপে মগ্ন অবস্থায় ধরা পড়িয়াছে, এরূপ কেস্ লেখকের দপ্তরে অন্যূন পঁচিশটি জমিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশেও মোটর-ড্রাইভারের সহিত প্রণয়াবদ্ধ হওয়া ও তাহাকে বিবাহ করিবার বাতিক অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।...কেন?

ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দুইটি সত্য আমাদের নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠিতেছে। প্রথমত, বালিকার কল্পনাপ্রবণ খেয়ালী মন গাড়ীর সহিত নারীর (নিজেকে) তুলনা করিতে করিতে উপমান ও উপমেয়ে একাত্ম করিয়া ফেলে; ভাবে—উত্তম গাড়ীর চালক যে, সে উত্তম 'নারী-পরিচালক' না হইয়া পারে না। তদুপরি, যেস্থানে সে পায়ে হাঁটিয়া যাইতে পারে না, অথবা যে প্রিয় বস্তুকে সহজে দেখিতে পায় না, সেই স্থান ও বস্তুকে আদেশমাত্র সুলভ করিয়া দেয় ওই লোকটি। আরো সে প্রসরণোন্মুখ সচঞ্চল মনের তালে-তালে দেহকে গতিশীল করিয়া, একটা স্নিগ্ধ নির্বাধ মুক্তিবায়ুর ছোঁয়াচ্ লাগাইয়া দেয়।

দ্বিতীয়ত, পথিমধ্যে নানারূপ ঘটিলেও-ঘটিতে-পারিত—এইরূপ আকস্মিক বিপদের ছায়া মাড়াইয়া, ড্রাইভারকে সর্বদা অপূর্ব কৌশলে গাড়ী চালাইতে দেখিয়া, সে ধারণা করে যে, তাহার জীবন রক্ষা করিতে—তাহাকে গন্তব্যস্থলে দ্রুত পৌছাইয়া দিতে সে কিরূপ প্রচণ্ড উৎসাহশীল! এই প্রচ্ছন্ন গুণগ্রাহীতা অনেক দূর গড়ায়, যখন ড্রাইভার ঘটনাচক্রে হয় বাহ্যত ভদ্রঘরের যুবক, সে মনিবের বাড়ীতে আহার

ও বাসস্থান পায় এবং মনিব-কন্যাকে একাকী স্কুল-কলেজে ও তাহার বান্ধবী-গৃহে লইয়া যাইবার স্বাধীনতা লাভ করে।...এইসূত্রে পাঠক-বর্গকে শিশিরকুমারের "রীতিমত নাটক" বা "দস্তুরমত টকী"র ঘটনাটা একটু স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

পতিতার প্রতি উৎকট প্রেম-প্রবণতা

বহুক্ষেত্রে দেখিয়াছি, যাহারা সচ্চরিত্র আদর্শ নীতিবাদী পিতামাতার সতর্ক দৃষ্টির নিম্নে কঠোরভাবে মানুষ হইয়াছে, তাহারা একটু বড় হইয়া, সুবিধা পাইলেই, কোনো বেশ্যা বা অর্ধবেশ্যার প্রতি আসক্ত হয়। বাল্য হইতে ইহাদের অনেকেই দেখিতে পায় অথবা ধারণা করিয়া লয় যে, পিতার রুক্ষ মেজাজ ও কড়া শাসনের অগ্নি-বাণে মাতাও জর্জরিতা হইতেছেন, এবং তজ্জন্য মাতার প্রতি পোষণ করিয়া থাকে একটা অপরিসীম অনুকম্পা। সচরাচর মাতার মৃত্যুর পর অথবা একাকী প্রবাস-জীবন যাপন করিবার কালে কোনো বিশেষ একটি দুশ্চরিত্রা ও পতিতার প্রতি তাহাদের গড়িয়া উঠে এক বিশ্বগ্রাসী, আন্তরিক ও উৎকট ভালবাসা। সাধারণত এই আসক্তি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও নিছক্ যৌনাবেগ-প্রসূত না হইতেও পারে।

ফ্রয়েড্ এইরূপ প্রেমিকের দাবি-দাওয়াকে চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন :—

(১) সে এমন একজন স্ত্রীলোককে ভালবাসে, যে এক বা ততোধিক প্রেমিকের সহিত যৌন-অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে; বিধবা ও বিবাহিতা হইলে আপত্তি নাই। সে সর্বদা বিশ্বাস করে যে, উক্ত স্ত্রীলোক প্রেম-জীবনে আদৌ সুখী হইতে পারে নাই, বরং নানাভাবে

নির্যাতিত হইয়াছে বা হইতেছে। ফ্রয়েড্ ইহার নাম দিয়াছেন "ব্যথাহতা তৃতীয় পক্ষ" (injured third party)।

(২) সে সর্বদাই এই উদ্ভট-কল্পনার বশবর্তী হইয়া তাহাকে ভালবাসে যে, এতদ্বারা সে উক্ত নারীর উচ্চতর সুখ, শান্তি ও পবিত্রতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে।

(৩) সে অতঃপর তাহার তথাকথিত সতীত্বের ন্যাস্‌রক্ষক সাজিয়া বসে এবং অন্যান্য প্রেমিকের উপসর্পণ হইতে তাহাকে ব্যগ্রভাবে রক্ষা করে। তাহার যদি স্বামী থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কোন ঈর্ষা ও ক্রোধের ভাব সে পোষণ করে না।

(৪) সে কিছুদিন পর্যন্ত এইরূপ একটি স্ত্রীলোকের প্রেমে নিজেকে নিবিষ্ট রাখে ও সাধ্যমতো তাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া চলে। কিন্তু কিছুদিন পরে আপন অজ্ঞাতসারেই তাহার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে এবং সামান্য ত্রুটি দেখিলেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, অনুরূপ আর একটি পাত্রীতে মনোনিবেশ করে।

এই ভাবে সারা যৌবন-কাল কয়েকটী পতিতার সহিত মাল্যাকারে সম্বন্ধ স্থাপন করিবার পর, তাহারা প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌছিয়া হয়তো সংসারে স্থিতিবান হইতে চেষ্টা করে, এবং একটি দরিদ্র ঘরের বর্ষীয়সী ও সেবাময়ী কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইয়া যায়।

অভিজ্ঞ-প্রেমিক-প্রিয়া নারী

উপরি-উক্ত টাইপের এক শ্রেণীর নারীও আমাদের দেশে দেখা যায়; ভদ্রঘরে ইহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। তবে ঈষৎ শিক্ষা

ও স্বাধীনতা-প্রাপ্তা কুমারী যুবতী ও অতৃপ্তকামা স্বচ্ছল বাল-বিধবাদের মধ্যেই এই ছাঁচ্‌টি বেশি দেখা যায়।

ইহাদের বৈশিষ্ট হইল এই যে, ইহারা সর্বদা বিবাহিত অথবা বিবাহ-পণবদ্ধ অথবা অন্যা নারীর প্রেমভাগী ব্যক্তিদিগকে সর্বাপেক্ষা বরণীয় দয়িতরূপে নির্বাচন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা প্রেমিককে বাধ্য করে—তাহার পত্নীকে পরিত্যাগ অথবা উপেক্ষা করিতে। কিন্তু প্রেমিকের পুত্রকন্যার প্রতি কোন ঈর্ষার ভাব পোষণ করে না, বরং নিকটে পাইলে আন্তরিক আদর-যত্নে তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

প্রেমিক যদি ইতঃপূর্ব একাধিক পাত্রীতে তাহার প্রেমের উপচার প্রদান করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে এই শ্রেণীর নারীর নিকট অধিকতর কাম্য ও প্রেয় হয়। ইহারা প্রেমিকদিগের নিকট সর্বদা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে যে, স্ত্রী বা ভূতপূর্বা প্রেমিকাদের চেয়ে তাহারা রূপে অথবা গুণে শ্রেষ্ঠ, এবং যৌন-সম্মিলনেও তাহারা উহাদিগকে নিবিড়তর আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থা। সুকোমল আপ্যায়নের রেশমী জাল ছড়াইয়া ইহারা ধীরে ধীরে শিকারকে কঠিনভাবে বাঁধিতে চাহে।

ইহারাও প্রেমিকদের তরফ্‌ হইতে সামান্য তাচ্ছিল্য সহ্য করিতে পারে না এবং কিছুকাল পরে তাহাদের ছিদ্র-অন্বেষণে অদ্ভুতভাবে নিপুণ হইয়া পড়ে। তারপর তাহারা নূতন করিয়া প্রেমিকের সন্ধান করে এবং পূর্ববর্ণিতভাবে কিছুকাল যাবৎ তাহারও মনোহরণ করিতে প্রয়াস পায়*। এইরূপ দুই, তিন বা চারিটি প্রেমিক পরিবর্তন করিয়া,

* "Beitrage Zur Psychologie des Liebeslebens" in **Jahrb. fur psycho-analytische Forschungen,** by E. Freud, 1910, (F. Deuticke, Leipzig u. Wien).

ইহাদের প্রেমের প্রতিই একটা বিরাগ জন্মিয়া যায়। প্রৌঢ়কালে ইহারা অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী, ধর্মপ্রাণা, জনহিতৈষিনী হইয়া পড়ে।

অর্থনৈতিক অথবা অন্য কোন সামাজিক কারণে ইহাদের মধ্যে যাহারা বিবাহ করিতে বাধ্য হয়, তাহারা নিজেরাও সুখী হইতে পারে না, কিম্বা স্বামীকেও সুখী করিতে চাহে না। ইহাদের মতে বিবাহ করার অর্থই হইল প্রেমকে যমালয়ে প্রেরণ করা। স্বামীর সদয়-ব্যবহারের মধ্যেও সে খুঁৎ দেখিতে পায় এবং তাহার উপর দুরন্ত আধিপত্য বিস্তার করিতে সচেষ্ট হয়। প্রৌঢ়ত্বের শেষ পর্যন্ত তাহারা বিবাহিত ব্যক্তির সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে; এবং প্রায়শ যৌন-সম্মিলনের সুবিধা গ্রহণ না করিয়াও তাহাদের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং তদ্বারা স্বামীর মনোকষ্ট ও ঈর্ষা উৎপাদন করিয়া কথঞ্চিৎ তুষ্ট থাকে।

—০—

==অষ্টম পটল==

বহুরূপী প্রেমের অন্তরোদ্‌ঘাটন

ব্রহ্মচারী ও চিরকুমারীর মনস্তত্ব

তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, এমন একদল স্ত্রীপুরুষ জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা প্রেম সম্বন্ধে আজীবন শিশু থাকিয়া যায় ; অর্থাৎ শৈশবানুবন্ধ তাহাদের মধ্যে এরূপ দৃঢ়সম্বন্ধ থাকে যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একজন কাহাকেও অযৌন প্রেমে চিরকাল অভিষিক্ত করিয়াই সুখী থাকে, বাহিরের কেহই তাহাদের যৌন-প্রেমের দুর্গ অধিকার করিতে পারে না। এই নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী ও বর্ষিয়সী কুমারীদের মনোবিকলন করিলে দেখা যায়—মাতা ও পিতা, ভগ্নী ও ভ্রাতার প্রতি প্রীতিশ্রদ্ধার রসে ইহারা তন্ময়। এই দৃঢ় সংসক্তি-ভাব থাকে তাহাদের নির্জ্ঞাত মনোবিভাগে লুকাইয়া, অর্থাৎ এতৎসম্বন্ধে তাহাদের কোন সাক্ষাৎ বোধ থাকে না ; সংজ্ঞাতে থাকে দৃঢ় কর্তব্যবোধ, নচেৎ কর্তৃত্বস্পৃহা, নতুবা গভীর বিতৃষ্ণা।

প্রথম দুই শ্রেণীর ব্যক্তিরা সংসারে টিঁকিয়া থাকে এবং পরবর্তী কোন সময় তাহাদের বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার সম্ভাবনাও থাকে। শেষোক্ত ভাবাপন্ন যুবক-যুবতীরা প্রায়ই সংসার হইতে বাহির হইয়া যায়। কৈশোর হইতে সংসারের (অর্থাৎ পিতামাতার জীবনের) অনিত্যতা ও উঁহাদের প্রতি নিজেদের নিরতিশয় দুর্বলতার কথা তাহারা প্রায়ই চিন্তা

করে, এবং আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে উদ্ভট যৌন বিষয়ক স্বপ্ন দেখিয়া আত্মানুশোচনায় ম্রিয়মান হয়। আপনারা জানেন বোধহয় যে, বেশির ভাগ আজগুবি স্বপ্নই আমাদের নির্জ্ঞাত মনের অবদমিত এষণার বিকৃত প্রতিচ্ছবি *।

এই সকল দুশ্চিন্তায় তাহাদের মন হইয়া উঠে তিক্ত, অবসাদগ্রস্ত। তখন তাহারা আত্মীয়ের প্রতি (কন্যা মাতার প্রতি ও পুত্র পিতার প্রতি) ঘোরতর উষ্মা, উদাসীনতা ও অবাধ্যতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে, এবং ধীরে ধীরে ধর্মের নিগূঢ়তার (mysticism) প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেহ বিবাহ-জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্বে, কেহ বা অব্যবহিত পরে স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, তাহারা যৌনভাবে ভালবাসার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। শেষে একদিন তাহারা (বেশির ভাগ যুবকরাই) গৈরিক উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে। তখন লোকমত তাহাদের ধর্মপ্রাণতাকেই এই সংসার-বিরাগের জন্য দায়ী করে।

প্রেমের উদ্‌গতি

বস্তুগতভাবে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হইল বটে ; কিন্তু আধ্যাত্মিক-ভাবে তাহা ছিন্ন হয় না। প্রেমময় পিতার সদ্‌গুণগুলি আরোপিত হয় এক অদৃশ্য ও লোকাতীত পিতার উপর ; প্রেমময়ী মাতার আদর্শ চরিত্র স্থানান্তরিত হইয়া যায় চক্ষুর অগোচর এক অলৌকিক মাতার উপর। বিশ্বপিতা ও জগন্মাতার সে প্রত্যক্ষ সন্তান (পিতামাতা শুধু অতি ক্ষীণ

* (১) স্বপ্ন—ডাঃ শ্রীগিরিন্দ্রশেখর বসু এম্‌-ডি ; (২) **Interpretation of Dreams** by E. Freud ; (৩) **Psychanalysis** by E. Jones (Earnest Benn Ld.)

ও ক্ষণস্থায়ী নিমিত্ত মাত্র)—এই দিব্যজ্ঞানে সে বলীয়ান্ হইতে চায়। আসল কথা ঈশ্বর-ঈশ্বরী হইয়া পড়েন পিতা-মাতার মহত্তর প্রতিকল্প (Substitute)। ইহারই নাম "প্রেমের উদ্গতি" (Sublimation)।

বাহ্যত সন্ন্যাসী তাহার মাতার সকরুণ আহ্বান উপেক্ষা করিলেও, মূলত সে তাঁহাতেই আজীবন অনুরক্ত থাকে। প্রায় সন্ন্যাসীই মাতার মরণাপন্ন অসুখের সংবাদ শুনিয়া গৃহে ছুটিয়া আসে, তাঁহার মৃত্যুতে বালকের ন্যায় উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে ক্রন্দন করিতে থাকে। আত্ম-প্রেমের বস্তুনিষ্ঠ আদর্শের বিনাশ তাহাকে কিছুকালের জন্য সত্যই মুহ্যমান করিয়া রাখে।

সংসারবিরাগী ব্রহ্মচারী কি মাতাকে কি কখনো ভুলিতে পারে? তাহার মাতার প্রতিমূর্তি সে নিখিল-বিশ্বের নারীমণ্ডলের মধ্যে প্রতি-ফলিত দেখে; তাই সে সকল নারীকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া স্বর্গীয় প্রসাদ লাভ করে। কঠিন রোগ-যন্ত্রণায় চৈতন্যহীন হইতে বসিয়াও সে আপনা-আপনি এই একাক্ষরী মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকে; তাহার নির্জ্জীত মন চায় আবার শিশু হইয়া মাতায় কোলে শুইয়া অতল শান্তি-লাভ করিতে। দুর্যোগময়ী নিঃসঙ্গ নিশীথে প্রলাপ-ঘোরে মহাকালেশ্বরকে ডাকিয়া সে সকাতরে আবেদন জানায়—

Backward, turn backward, O Time, in thy flight!
Make me a child again just for to-night....

ব্রহ্মচারিণী সম্বন্ধেও ওই একই কথা। পিতার প্রতি শৈশব-সংসক্তিকে সে সতীদেহের মতো টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছড়াইয়া দেয় নিখিলের পুরুষজাতির মধ্যে; ছেলে-বুড়ো সকলকেই সে 'বাবা' সম্বোধনে আকৃষ্ট করে।...

কিন্তু আগেই বলিয়াছি মানুষের দ্বি-মেরুপ্রবণতার অদ্ভুত কার্য-কারিতার কথা; অত্যন্তের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত হয়। এই সকল সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী তাহাদের মাতা ও পিতার আকৃতি-প্রকৃতিগত কোন অবিস্মরণীয় বৈশিষ্ট্য কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষের মধ্যে লক্ষ্য করিলে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবেগ-চঞ্চল হইয়া উঠে। এইরূপ কোন ভক্তের সান্নিধ্যে থাকিয়া কিছুদিন তাহার নিঃস্বার্থ সেবা-লাভ করিলে, সাধুর অবদমিত যৌন-স্পৃহা অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে। কথিত ভক্তটি অকস্মাৎ একদিন গৈরিক বসনের সকাম আলিঙ্গনের মধ্যে নিজেকে বন্দী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়ে।...প্রধানত এই কারণেই নিষ্ঠাবান প্রকৃত সন্ন্যাসীরা সংসারের আওতায় কোনমতে আসিতে চাহেন না।...

মদন ছদ্মবেশ ধরে, বিপথে চলে, শ্রান্ত শিশুর মতো ঘুমায়, পুড়িয়া ছাই হয়, তবু মরিয়াও মরে না!

শৈশব-সংসক্তির স্বপ্নভঙ্গ

কর্তব্য-বোধে বা পিতা-মাতা-ভ্রাতা-ভগ্নী প্রভৃতির উপর একাধিপত্য করিবার গোপন অভিলাষের বশবর্তী হইয়া যে-সকল নারী আকুমারী ও যে-সকল পুরুষ আকুমার থাকেন, তাঁহাদের কথাবার্তায় সর্বদা দুইটি প্রধান সুর নিত্য ধ্বনিত হইতে থাকে,—লক্ষ্য করিবেন। পুরুষের একটি সুর হইল—'অবস্থা স্বচ্ছল নয়, বিবাহ করিব কোথা হইতে?' লোকটি হয়তো ১২৫৲ মাহিনার চাকুরি করে।...স্ত্রীলোকের একটি সুর হইল—'বাবাকে তা হ'লে যত্ন করবে কে? আমায় শ্বশুর-ঘর করতে হ'লে ওঁর খোয়ারের আর দিশ্‌পিশ্ থাকবে না'। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের হয় মাতা চিররুগ্না, নচেৎ পিতা মৃতদার। উভয়েরই আর

একটি সুর হইল,—'বিয়ে ক'রে তো সুখ কত! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি সত্যিকার ভালবাসা আছে? ওইতো অমুকের স্বামী মাতাল—বউকে দিনরাত মারে।...ওইতো অমুকের বউ দিনরাত বই মুখে ক'রে আছে—স্বামী সময়মতো দুটি ভাত পায় না...ইত্যাদি।'

অথচ, স্থির জানিবেন, যৌবনের প্রেম যখন বহির্মুখী ও প্রবল হয়, তখন সে অর্থ-নৈতিক কারণ, সামাজিক আগড়, গুরুজনের নিষেধবাণী বা অপরের প্রেম-জীবনের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত অগ্রাহ্য করিয়া চলে।...আসল কথা হইল, তাহারা মাতা বা পিতাকে (অথবা বোন বা ভাইকে) ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। ইহাদের জন্য তাহারা স্বতোজাগ্রত যৌনপ্রেমকে নির্মমভাবে দমন করিয়া রাখে। ক্ষণিকের জন্য কচিৎ কামস্পৃহা দুর্দম্য হইয়া উঠিলে, ইহারা স্বমেহনের (masturbation) দ্বারা যান্ত্রিকভাবে উহার নিরসন করে, নতুবা স্বপ্নদোষের মধ্য দিয়া উহা আপনা-আপনি প্রীণন লাভ করে। এই পর্যায়ের পুরুষগণ দেবকাম্যা নারীর চটুল স্তুতিবাদের নিকট সম্পূর্ণ অচঞ্চল, অনুরূপ স্ত্রীলোকগণ যোগ্য পুরুষের সকাতর প্রেম-নিবেদনের সম্মুখে তুহিন-শীতল থাকিয়া যায়।...আমরা ইহাদের নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা দেখিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই।

তাহাদেরও চরিত্র সহজে স্খলিত হইতে পারে—দ্বিমেরু-প্রবণতার কৃপায়। কিন্তু কি ভাবে, কোন্ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া?—যখন তাহাদের আদ্য প্রেমাস্পদ বিবাহ করে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে। ওই ঘটনা তাহাদের প্রেম সম্বন্ধে অবিচল মতবাদের রূপান্তর-সাধন করে। তখন তাহারা অন্তরে-অন্তরে পিতা, মাতা, ভ্রাতা বা ভগ্নীর আচরণকে 'breach of loyalty' বলিয়া জ্ঞান করিয়া,

নিজেও অনুরূপ আচরণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়। একদিনেই তাহারা যৌনপ্রেমে অথবা বিবাহের প্রতি পরম বিশ্বাসবান হইয়া উঠে। তখন পুরাতন মোহের খোলস ত্যাগ করিয়া, তাহার মদনের গোলাপী উত্তরীয় পরিয়া ধন্য হয়।...

কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পলাতকা' গ্রন্থে "নিষ্কৃতি" নামক কবিতাখ্যানে কতকটা এই ধরণের একটি চিত্র আঁকিয়াছেন।...এক ষাট বৎসর বয়স্ক বুড়ার সহিত বিবাহ হওয়ার দু'মাস পরেই মঞ্জুলিকা বিধবা হয়। সুতরাং সে বিবাহ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। সে বাপের বাড়ী ফিরিয়া কঠোর ব্রহ্মচারিণী-ব্রত গ্রহণ করিল। মায়ের মৃত্যুর পর পিতার আদর-যত্নের সমস্ত ভার সে সানন্দে নিজহস্তে তুলিয়া লইল। কিন্তু কিছুতেই সে তো মায়ের অভাব পূরণ করিতে পারে না; "মায়ের সঙ্গে তুলনাতে পদে পদেই ঘটে যে তার ত্রুটি!"...

পুলিন গ্রামের এক স্বচ্ছল গৃহস্থের ছেলে; মায়ের ইচ্ছা ছিল—তাহারই সহিত মেয়ের বিবাহ দেন। বিধবা হইবার কিছুদিন পরে সুযোগমতো পুলিন একদিন তাহার নিকট প্রেম নিবেদন করিয়া বসিল; কিন্তু "ছি ছি" বলিয়া মঞ্জুলিকা ছুটিয়া ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং নিজের ঘরের দুয়ার দিয়া মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অতঃপর সে—

"বাপের সেবায় লাগ্‌ল দ্বিগুণ ক'রে
অষ্টপ্রহর ধ'রে
আবশ্যকটা সারা হ'লে তখন লাগে অনাবশ্যক কাজে,
যে বাসনটা মাজা হ'ল আবার সেটা মাজে।"...

নিঃসঙ্গ পিতার সংসারে তাহার কাজের সীমা নাই, অথচ অতৃপ্তির

লেশমাত্র নাই।...স্ত্রীর মৃত্যুর বৎসরখানেক বাদে পিতা আবার গোপনে গোপনে নিজের বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে কন্যার মন বিদ্রোহ ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। পিতা একদিন বাখরগঞ্জে বিবাহ করিতে চলিয়া গেলেন।

"বৌকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নাই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি প'ড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে ক'রে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চ'লে,
সেইখানেতেই ঘর পাত্‌বে ব'লে।
আগুণ হ'য়ে বাপ্
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।"...

নারীর প্রেমে সংবৃত প্রভুত্ব-স্পৃহা

দুর্বল, আতুর ও পতিতের প্রতি বহু স্ত্রীলোকের একটা স্বভাবগত করুণার ভাব বর্তমান আছে। স্বভাবসম্বদ্ধ মাতৃত্বভাব হইতে হয় এই করুণার পারিস্ফুরণ। কিন্তু এই করুণা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘনীভূত হইয়া কান্তপ্রেমে পরিণত হয়। রমণী যখন স্পষ্ট অনুভব করে যে, ব্যক্তিবিশেষ তাহার আদর-যত্নের একান্ত মুখাপেক্ষী, তাহার সাহায্য ব্যতীত সে এক পা-ও চলিতে পারে না, তাহার উপদেশে সে উঠা-বসা করে, তাহা হইলে যৌন-ব্যাপারে কথিত লোকটি রীতিমত উৎসাহী বা ক্ষমতাশালী না হইলেও সে উহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে

পারে। এ ভালবাসার মধ্যে সংবৃত থাকে—প্রভুত্ব-স্পৃহা, শ্রেষ্ঠত্ব-বোধ এবং "the majestic sense of *mothering* some one."

বেশ্যারা অনেক সময় এক-একটা গুণ্ডার প্রতি বাধ্যতাজনিত ভালবাসার ভাব পোষণ করে। কেহ কেহ সত্য সত্যই কোন গুণ্ডাকে ভালবাসিয়া ফেলে,—স্বার্থরক্ষার খাতিরে এ প্রেমদান হয়তো অপরিহার্য হইয়া উঠে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিত্তশালিনী বারবিলাসিনী একটা অপদার্থ, বয়াটে ও ক্ষীণকায় ছোক্‌রাকে তাহার নয়ন-পুত্তলি করিয়া রাখিয়াছে। তাহার অনন্ত আবদার সে সাধ্যমতো রক্ষা করে; তাহার অসুখে সে দুশ্চিন্তার উত্তাল সাগরে ভাসে; তাহাকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেখিলে, তীব্র ভৎর্সনা করিয়া—চুলের ঝুঁটি ধরিয়া দুই-চারি চড়্ মারিয়া তবে যেন শান্ত হয়।...

দৃষ্টান্ত

আমরা এক ধাত্রীকে দেখিয়াছি যে, কোন মফঃস্বল শহরে সে এক দাতব্য-চিকিৎসালয়ে সংশ্লিষ্ট ছিল। ধাত্রীটির চেহারা মোটামুটি মন্দ ছিল না এবং মাসে ষাট-সত্তর টাকা রোজগার করিত। আটাশ বৎসর বয়সের সময়, সে এক বাইশ বৎসরের লক্ষ্মীছাড়া একচক্ষুহীন যুবককে বিবাহ করে। এই যুবক নিত্য তাহার নিকট হইতে পয়সা চাহিয়া লইয়া গাঁজা খাইত এবং এক থিয়েটারের ক্লাব লইয়া পড়িয়া থাকিত। ধাত্রী-বধূ স্বামীর গঞ্জিকা-সেবনের অভ্যাসের জন্য প্রত্যহই উগ্রভাষায় গালি পাড়িত, আবার সে হাত পাতিলে গঞ্জিকা-সেবনের পয়সা না দিয়াও থাকিতে পারিত না। একদিন হতভাগা তাহার প্রশ্রয়দাত্রী পত্নীর নিকট হইতে কয়েকটি টাকা চাহিয়া লইয়া, পানোন্মত্ত হইয়া জনকয়েক

বন্ধুর সহিত কোন বারনারীর ঘরে স্ফূর্তির উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এই সংবাদ ধাত্রীর কর্ণগোচর হওয়ায় সে মারাত্মক মাত্রায় মর্ফিয়া সেবন করিয়া আত্মহত্যা করে। তৎপূর্বে সে আত্মনাশের কারণ বিবৃত করিয়া পুলিসের নিমিত্ত একখানি চিঠি রাখিয়া গিয়াছিল।...

একাধারে মাতা, বধূ ও প্রভুর ভূমিকা গ্রহণ করিবার নিগূঢ় বাসনায় কোনো কোনো নারী তাহার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট বা অনেক বড়, শিক্ষায় ও সাধনায় নিম্নস্তরবর্তী, জরাগ্রস্ত, ক্লীব, নির্যাতিত, নির্ধন এক ব্যক্তিকে সানন্দে প্রেম নিবেদন করে, বিবাহও করে। ওইরূপ অসমভাবে পরিণয়াবদ্ধা নারী মুখে সুন্দর শাস্ত্রবচন আওড়ায়—লোকে তাহার আত্মপরিভবের জয়গান গাহে; অন্তরে অন্তরে সে কিন্তু আত্মগৌরব ও স্বার্থপ্রসারেরই সুচতুর সাধিকা।

নিঃসন্তান ধনী বিধবার পার্শ্বে অনেক সময় এইরূপ এক-একটি হীনপ্রভ নির্কর্মা উপগ্রহ বিদ্যমান দেখা যায়। লোক-সমাজকে ফাঁকি দিবার ও নিজের সংজ্ঞাত মনকে চোখ্ ঠারিবার জন্য ইহাদের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ স্নেহের সম্পর্কও পাতানো থাকে। যতদিন ইহারা তাহার উপর একান্ত ভরসা ও নির্ভরতার ভাব বজায় রাখে, ততদিন স্ত্রীলোকটি তাহাদের প্রতি বিশ্বস্তা থাকে,—বাহিরের কোন প্রলোভনই তাহাকে কক্ষচ্যুত করিতে পারে না।

দূরত প্রেমের প্রকারভেদ

দূর হইতে কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ভালবাসার মধ্যে থাকে অনাস্বাদিতপূর্ব আত্মপ্রেম, মর্ষণকামিতা ও স্বপ্নসুষমাভরা কল্পনা-প্রবণতা। আমরা প্রেমের বস্তুকে যত উচ্চ স্থানে বসাই, আমরা আপনাদিগকে তত উচ্চে উঠাইবার সাধনা করিতে পারি। দূর হইতে লোকাস্ত ব্যক্তি

সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয় অত্যন্ত উন্নত,—কল্পনা তাঁহার চিত্রে দিব্য বর্ণবৈচিত্র্যের সুষমা লাগাইয়া দেয়। একদল প্রেম-সাধক চায় প্রেমাস্পদ ও তাহাদের মধ্যে দূরত্ব ঘুচাইতে—তাঁহার সমীপে আসিয়া চরণোপান্তে জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ নিবেদন করিয়া দিতে; আর একদল চাহে তাঁহাকে দূর হইতেই আজীবন ভালবাসিতে—তাহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার অঞ্জলি ঢালিয়া দিতে।

দেশপূজ্য প্রতিভাবান মনীষীকে যদি কোনো বর্ষিয়সী কুমারী দূর হইতে ভালবাসে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে যৌন আকর্ষণ থাকে নামমাত্র। দূরত্ব ঘুচিয়া গেলে, সে যৌনাবেগ কতকটা যায় সর্ব ইন্দ্রিয়ে আস্তৃত হইয়া, বাকিটা যায় অতীন্দ্রিয় মনোলোকে সরিয়া।...সে তখন বিলাসবৈভব তুচ্ছ করিয়া আরাধ্যের প্রত্যক্ষ সেবা ও তাঁহার জীবনের মুখ্যব্রতে নিজেকে দেয় একান্তভাবে সঁপিয়া। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি মিস্ স্লেডের (ভারতীয় নাম মীরা বেন-এর) এই প্রকার প্রেম জন্মিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ভগিনী নিবেদিতারও অনুরূপ প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল।...ইহাকেও 'প্রেমের উদ্গতি' বলিতে হইবে।

আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা কবি, ঔপন্যাসিক, চিত্রশিল্পী, থিয়েটার ও সিনেমা-জগতের এক বা একাধিক অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে মনে মনে ভালবাসে। তাহাদের চিত্র সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের প্রেম-জীবনের গোপন কাহিনী শুনিয়া, তাহাদের অঙ্কিত বিপ্লবী প্রেমিক-চরিত্রের সংলাপগুলি বারবার পড়িয়া, দূরত প্রেমিকগণ পুলক-রোমাঞ্চে শিহরিয়া উঠে। ইহাদের গুণই অবশ্য প্রধান আকর্ষণের বস্তু। কিন্তু বারবার চিত্র ও অভিনয় দেখিয়া, যাহারা রূপ ও গুণে সমভাবে আকৃষ্ট হয়, তাহারা ব্যবধানটুকুর বিলোপ-সাধন করিতে ব্যস্ত হয়। এইজন্য

রঙ্গমঞ্চ এখনো রূপোপজীবিনীদের আত্ম-বিজ্ঞাপনের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া পরিগণিত হয়।

এমন কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা অভিনেত্রীর বাটীতে গিয়া গুণগ্রাহিতা-পূর্ণ ক্ষুদ্র একখানা চিঠি, একটি ফুলের তোড়া বা অন্য কোনরূপ উপহার দিয়া আসিতে পারিলেই খুশি হন্—আর কিছু নয়; আবার কেহ কেহ বিবাহের প্রস্তাব-সমন্বিত সুদীর্ঘ প্রেম-পত্র লিখিতেও কুণ্ঠিত হন্ না। বাঙ্‌লার কোন সুদর্শনা সিনেমা-অভিনেত্রী এযাবৎ পত্র-মারফৎ সাত শতাধিক বিবাহের প্রস্তাব পাইয়াছে। আর একজন প্রথিতযশা রূপবান নট তাঁহার গুণমুগ্ধ কোন শিক্ষিতা তরুণীর নির্বন্ধাতিশয্যে তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্য একজন লোকপ্রিয়, বিবাহিত, প্রৌঢ় অভিনেতার নিকট বিগত ত্রয়োদশ বৎসরের যশোজীবনের ভিতর কয়েকজন শিক্ষিতা তরুণী ও স্বাধীনচিন্তা ধনাঢ্য-গৃহিণী শুধু প্রেমনিষিক্ত লিপি প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই,—পূর্ব নির্দেশানুযায়ী কোনো প্রসিদ্ধ হোটেলে গোপনে আসিয়া, তাঁহার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ লাভ করিয়া লঘুচিত্তে ফিরিয়া গিয়াছে।

—০—

গোলাকার চিত্রে পুরুষের দুই নিতম্বের মাঝখান্ দিয়া কটিসমেত তলপেট্ চিরিয়া তাহার একাংশের প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে লম্বালম্বি কাটা শিশ্ন, দুইটি মুষ্ক, দুইদিকের শুক্রকুল্যা ও শুক্রপ্রবা, মূত্রস্থালী, পৌরুষগ্রন্থি ও একদিকের শুক্রাধার প্রদর্শিত। মুষ্ক হইতে শুক্রের গতি-পথ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

Blank page (s)

==নবম পটল==

পুং ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের পরিচয়

এতক্ষণ প্রেমের ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব লইয়াই নাড়াচাড়া করিলাম—যদিও তৎসম্বন্ধে শুধু অক্ষর-পরিচয়েরই চেষ্টা করিয়াছি, এইবার উহার দেহ-তত্ত্ব লইয়া একটু আলোচনা করা দরকার। অবশ্য ক্ষুদ্র একখানি পুস্তকের মধ্যে উভয় বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াও এক দুরূহ ব্যাপার। যাহা হউক, পুরুষ ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা সাধারণ পাঠকমাত্রেরই থাকা উচিত বিবেচনা করিয়া, সর্বপ্রথম উহার বিষয় কিছু বিবৃত করিতেছি। আমাদের দেশের বহু লোকেরই আয়ুর্বেদ পড়িয়া, দেহতত্ত্বের গান ও লোকমুখে গল্প শুনিয়া, যৌনেন্দ্রিয়ের সংস্থান ও উহার বিশিষ্ট ক্রিয়া-পদ্ধতি সম্বন্ধে কতকগুলি আজগুবি ও ভ্রান্ত পরিজ্ঞান জন্মিয়াছে; বৈজ্ঞানিক সত্যের খাতিরে সেগুলির অপনোদন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অণ্ডকোষ ও মুষ্ক

মুষ্ক (Testicles) ও শিশ্ন (Penis)—এই দুইটি পুরুষের আসল যৌনযন্ত্র এবং উভয়েই শরীরের বহির্ভাগে দোদুল্যমান অবস্থায় অবস্থিত। গর্ভে অবস্থান-কালে পুরুষ-শিশুর মুষ্ক দুইটি তলপেটের মধ্যে থাকে; জন্মের অব্যবহিত পূর্বে উহারা দুইটি তির্যক্ প্রণালী বাহিয়া যথাস্থানে

নামিয়া আসে। একটু লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, শিশ্নের পৃষ্ঠদেশ হইতে বহির্গত হইয়া আইলের রেখার ন্যায় একটা সরু রজ্জু অণ্ডকোষের মধ্যভাগ অতিক্রম করিয়া উহার তলদেশ পর্যন্ত আস্তৃত রহিয়াছে। অণ্ডকোষ একটি থলিবিশেষ; উহার ভিতর দুইটি ঈষৎ-কঠিন বীজ থাকে, উহাদের নাম মুষ্ক। মুষ্ক-সমেত সমগ্র থলিটিকেই চলিত কথায় 'অণ্ডকোষ' বলা হয়।

অণ্ডকোষের গাত্রে যে মাংসরজ্জুর কথা বলিলাম, উহার ঠিক্ সোজাসুজি যদি অভ্যন্তরভাগে আসা যায়, তাহা হইলে একটি পাৎলা মাংসময় প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার দ্বারা অণ্ডকোষটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি পৃথক কুঠুরির সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক কুঠুরির মধ্যে একটি করিয়া মুষ্ক থাকে। মুষ্কদ্বয় অবশ্য গ্রন্থি-নামেই পরিচিত। ইহাদের আকার অণ্ডাকৃতি, দুইপাশে কিঞ্চিৎ চ্যাপ্টা। প্রত্যেকটি দৈর্ঘ্যে দেড় হইতে দুই ইঞ্চি, প্রস্থে এক ইঞ্চি ও স্থূলতায় সওয়া-ইঞ্চির বেশি হয় না। একজন পুষ্টদেহী মানুষের একটি মুষ্কের ওজন ছয় ড্রাম হইতে এক আউন্স। বাম মুষ্কটি প্রায় ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত একটু বড় ও ভারি হইতে দেখা যায়। মুষ্কদ্বয় তিন পর্দা চামড়ার আচ্ছাদন দ্বারা সুরক্ষিত। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্দার মধ্যে জল জমিয়াই সাধারণত 'কুরণ্ড রোগ' উৎপন্ন করে।

শুক্রাণুনালিকা

প্রত্যেক মুষ্কের মধ্যে তিন হইতে চারিশত বিভিন্ন আকারের ক্ষুদ্র গুটিকা গায়ে-গায়ে ও স্তরে-স্তরে সাজানো থাকে। গুটিকাগুলির একপ্রান্ত অপেক্ষাকৃত মোটা, অন্যপ্রান্ত ছুঁচালো। প্রতি গুটিকার মধ্যে খানিকটা

করিয়া কোমল সংযোজক-পেশীতন্তু ভরা আছে ও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা ধমনীর জাল বিছানো রহিয়াছে। প্রত্যেকের কেন্দ্রস্থলে তিনগাছি জটিলভাবে নুটি-পাকানো ও গুটানো সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম নল আছে; ঐ নলের ফুটা এক ইঞ্চির দেড়শত ভাগের একভাগের অপেক্ষাও ছোট। এই নলগুলির মধ্যে আসল শুক্ররস ও শুক্রকীট প্রস্তুত এবং কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষিতও হয়। ইহাদের নাম "শুক্রাণুনালিকা" (Tubuli Seminiferi)।

শুক্রাণুনালিকাগুলির গায়েও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা-ধমনী লতাবৎ জড়াইয়া রহিয়াছে। সুতরাং শুক্র যে সরাসরি রক্ত হইতেই এক অজ্ঞাত কৌশলে প্রস্তুত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ফলত এতদ্বারা রক্তের পরিমাণ যৎসামান্য কমে বটে, কিন্তু উহার গুণের কোনোরূপ হ্রাস হয় না। পঞ্চাশ ফোঁটা রক্ত দিয়া এক ফোঁটা শুক্র তৈয়ারি হয়—ইহা কিন্তু গঞ্জিকাসেবীর কল্পনালব্ধ সত্য।...

শুক্রাণুনালিকা ব্যতীত 'Leydig cells' নামক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে একপ্রকার অন্তঃস্রাব কৈশোর-প্রারম্ভ হইতে নিস্যন্দিত হইয়া দেহের কি কি পরিবর্তন আনয়ন করে, তাহা চুয়ান্ন ও পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় পূর্বে বিবৃত হইয়াছে।

শুক্রের উপাদান

শুক্র নামধেয় যে বস্তুকে আমরা মূত্রনালীপথে বাহির হইতে দেখি, উহা কতকগুলি পৃথক পৃথক যন্ত্রোৎসৃষ্ট রসের সমষ্টি মাত্র এবং উহার সহিত অসংখ্য চক্ষুর অগোচর শুক্রকীট মিশ্রিত থাকে। স-কীট শুক্রকে

রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া, উহার মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া গিয়াছে :—

জল	...	শতকরা ৯০ ভাগ
জৈব পদার্থ (Organic matters)		„ ৬ ভাগ
মৃৎলিপ্ত ফস্ফেট্	...	„ ৩ ভাগ
সোডিয়াম ক্লোরাইড্ (লবণ)		„ ১ ভাগ

শুক্রকীটের বিশেষ পরিচয় আমরা পরে দিব।...

শুক্রবাহী নালীদ্বয়—(১) শুক্রকুল্ল্যা

তারপর, প্রত্যেক গুটিকার অভ্যন্তরস্থ তিনটি শুক্রাণুনালিকার মুখ ছুঁচালো প্রান্তের দিক আসিয়া একত্র হয় এবং একটি প্রায়-সরল ও স্থূলতর নালী তৈয়ারি করে। প্রত্যেকদিকের মুষ্কমধ্যস্থ ওই নালীগুলি অণ্ডকোষের পূর্বোক্ত মধ্যপ্রাচীরের অভিমুখে গিয়া কুড়ি-বাইশটি আরো মোটা নলে পরিণত হইয়াছে। এই নলগুলি আবার জড়াজড়ি করিয়া উর্ধ্বদিকে উঠিয়া ও পশ্চাদ্গামী হইয়া, একটি চ্যাপ্টা, চওড়া ও আকুঞ্চিত নলের সহিত যুক্ত হইয়াছে। শেষোক্ত নলটির নাম "শুক্রকুল্ল্যা" (Epididymis)। এই স্থূলকায় নলটি রমণীর মাথার খোঁপার ন্যায় মুষ্কের মাথার কতকাংশ ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

(২) শুক্রপ্রবা

প্রত্যেক দিকের মুষ্কের এইরূপ এক-একটি শুক্রকুল্ল্যা আছে। উহারা উভয়ে মুষ্কের মাথার মাঝামাঝি স্থানে উদ্ভূত হইয়া, প্রায় পাশাপাশি অবস্থায় মুষ্কের গা বাহিয়া নিচের দিকে নামিয়া আসিয়াছে,

এবং ইংরাজী U-এর আকারে বেঁকিয়া "শুক্রপ্রবা" (Vas deferens) নামক নলের সৃষ্টি করিয়াছে। শুক্রপ্রবাদ্বয় উর্ধ্বদিকে উঠিয়া, অণ্ডকোষের গণ্ডী ছাড়াইয়া ও বেড়ীর আকারে দুই দিকে বেঁকিয়া, একেবারে তলপেটের মধ্যে প্রবেশ করে। এইভাবে কিছুদূর উচ্চে অগ্রসর হইয়া, মূত্রস্থালীর (Bladder) উভয় পার্শ্বদেশ প্রায় বেষ্টন করিয়া, "পৌরুষগ্রন্থি" নামক একটি ক্ষুদ্রযন্ত্রের প্রান্তে উভয়ে আসিয়া শেষ হইয়া যায়।

মূত্রস্থালী ও শুক্রাধার

হাওয়া-ভরা একটি ছোট ফুট্‌বলের ব্লাডারের ন্যায় দেখিতে আমাদের মূত্রস্থালী ; উহার পশ্চাতেই মলকোষ্ঠের সংস্থান। দুইটি বৃক্ক (kidneys) হইতে বিশিষ্ট নল-সাহায্যে ফোঁটা-ফোঁটা করিয়া মূত্র আসিয়া ইহার মধ্যে জমা হয়। বেশি পরিমাণে মূত্র জমা হইলে, স্থানীয় নাড়ীতন্তুগুলি উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং আমাদের মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জাগে। যাহা হউক, এই মূত্রস্থালীর একটু নিচের দিকে দুই পার্শ্ব ঘেঁসিয়া দুইটি লম্বাকার থলি আছে। ইহাদের নামই "শুক্রাধার" (Vesiculi seminalis)। নামের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শুক্রাধারের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে শুক্র সঞ্চিত থাকে। এই যন্ত্রের ভিতর-গাত্র হইতে আর এক প্রকার বিশিষ্ট রসও ক্ষরিত হইয়া মূল শুক্রের সহিত মিলিত হয়। ইহাদের প্রত্যেকের একটি করিয়া ক্ষুদ্র নির্গম-প্রণালী আছে ; উহার নাম "শুক্রনির্ঝর"। পূর্বোক্ত শুক্রপ্রবা ও শুক্রনির্ঝরের মুখ একই স্থানে আসিয়া শেষ হইয়াছে। আবার ঐস্থানে মূত্রস্থালী-সংলগ্ন মূত্র বাহির হইবার নলটিরও উৎপত্তি।

পৌরুষগ্রন্থি (Prostate gland) ও মূত্রনালী

স্থানটি যেন তিনটি নদীর সঙ্গমস্থল, ত্রিমোহানা বিশেষ। পৌরুষ গ্রন্থির মাথায় এই সঙ্গমস্থলের সৃষ্টি, এবং এই সঙ্গমস্থলই পৌরুষ-গ্রন্থির দেহ ভেদ করিয়া, মূত্রনালী বা মূত্রপথ নামে লিঙ্গের মধ্য দিয়া আস্তৃত রহিয়াছে। পৌরুষগ্রন্থি দেখিতে যেন দ্বিধা-ভিন্ন ফুলের কুঁড়ি, আয়তনে একটা কাগজী বাদামের মতো। ইহার গাত্রে গুট-পাকানো কোমল পেশী-তন্তু বিদ্যমান, তন্মধ্য হইতে একপ্রকার শ্বেতাভ তরল রস নিষিক্ত হয়। উহাও মূল শুক্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। কামোত্তেজনার প্রথম অবস্থায় দুই এক বিন্দু পৌরুষগ্রন্থি-রস ক্ষরিত হইয়া সমগ্র মূত্রনালীকে সরস, স্নিগ্ধ করিয়া দেয়। কামোত্তেজনা অধিক হইলে ও লিঙ্গ দৃঢ় অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিলে, পৌরুষগ্রন্থি-রসের কতকটা মূত্রনালীর বাহিরে গড়াইয়া আসিতে পারে। উহা আসল শুক্র নয়, এবং এরূপ হওয়া কিছু অস্বাভাবিক ও আশঙ্কামূলক নয়।

লিঙ্গমূলে মূত্রনালীর উভয়পার্শ্বে ছোট মোটরের মতো আরো দুইটি গ্রন্থি আছে; তাহাদের নাম "কর্কর গ্রন্থি" (Cowper's glands)। ইহাদেরও অভ্যন্তরে একপ্রকার বিশিষ্ট রস প্রস্তুত হইয়া শুক্রের সহিত মিশ্রিত হয়। তদ্ব্যতীত সমগ্র মূত্রনালীর চারিদিকে অতিক্ষুদ্র বহু গ্রন্থি আছে, তাহারাও অকিঞ্চিৎকর মাত্রায় রস-নিষেক করিয়া থাকে।

শুক্রের গতি ও ক্ষরণ

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শুক্রাণুনালিকাসমূহের মধ্যে যে স-কীট শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহা চুঁয়াইয়া প্রথমত শুক্রকুল্যার মধ্য দিয়া শুক্রপ্রবায় আসে। এইখানে আসিয়া শুক্রকীটগুলি গতিশক্তি প্রাপ্ত হয়। তারপর

শুক্রপ্রবার গাত্র ঘামিয়া অতিসামান্য মাত্রায় যে রস ক্ষরিত হয়, তাহার সহিত শুক্র মিশিতে মিশিতে শুক্রাধারে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় স্থানীয় রসের সহিত মিশিয়া উহা সময়মতো ক্ষরণের জন্য রক্ষিত থাকে। এই স্থানের রসে শুক্রকীটগুলির জীবনী-শক্তি বাড়িয়া যায়। শুক্র বেশিদিন শুক্রাধারে জমিতে থাকিলে, স্বপ্নসঙ্গমের ফলে. জাগ্রত অবস্থায় গভীর কামচিন্তার ফলে অথবা প্রভাতকালীন্ প্রস্রাবের সহিত উহার বেশির ভাগ ব্যয়িত হইয়া যায়। কঠোর প্রয়াসে শুক্র নিঃসরণ বন্ধ করিলে, শুক্রাণুনালিকাগুলি শুষ্ক, নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

কামোত্তেজনার সময় লিঙ্গগাত্রে মৃদু-মৃদু ঘর্ষণ লাগিলে, তৎসংশ্লিষ্ট সূত্রবৎ নাড়ীতন্তুসমূহ ক্রমাগত একটা সুখানুভূতির স্পন্দন প্রথমত সুষুম্নারজ্জুর নিম্নপ্রান্তে বহিয়া আনে। তাহার ফলে একটি বা দুইটি শুক্রাধার যুগপৎ সঙ্কুচিত হইয়া, তন্মধ্যস্থ বেশির ভাগ শুক্ররস মূত্রনালীর মধ্যে উজাড় করিয়া দেয়। ঐ সময় পৌরুষগ্রন্থি ও কর্কর-গ্রন্থি হইতেও কিয়ৎ পরিমাণে রস শুক্রের সহিত সংমিশ্রিত হয়, এবং সমগ্র মিশ্ররস শিশ্নমুখ দিয়া সবেগে উৎসারিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই হয় কামোত্তেজনার প্রশমন ও শরীর-মনে আসে একটা আবেশমধুর স্নিগ্ধ প্রশান্তি।

শিশ্ন ও তাহার অংশসমূহ

পুরুষের লিঙ্গ বা শিশ্ন 'কর্পোরা ক্যাভার্নোসা' নামক স্পঞ্জের ন্যায় ঈষৎ-ফাঁপা-ফাঁপা ও উত্থানশীল পেশীতন্তু দ্বারা নির্মিত। এই পেশীতন্তু-গুলির ফাঁকে ফাঁকে ছোট-বড় নানা আকারের অসংখ্য শিরা-ধমনী আস্তৃত রহিয়াছে। কামোদ্দীপন-কালে প্রচুর পরিমাণে রক্তপ্রবাহ ধমনীসমূহের

মধ্যে সতেজে প্রবেশ করায়, লিঙ্গ কঠিন হইয়া উঠে ; কিন্তু তৎপূর্বে সুষুম্নারজ্জুর নিম্নপ্রান্তের নিকট হইতে কর্মপ্রেরণা আসা চাই।

মূত্রনালী, মূত্রস্থালীর স্কন্ধদেশ হইতে বাহির হইয়া, শিশ্নের অগ্রভাগ পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, মূত্র ও শুক্র একই পথ দিয়া শরীর হইতে নির্গত হয়।

শিশ্নের অগ্রভাগ লোহিতাভ পাংলা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। এই অংশের নাম শিশ্নমুণ্ড (Glans penis)। আমাদের ওষ্ঠ ও মুখাভ্যন্তর-ভাগও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দিয়া মোড়া। শিশ্নমুণ্ড জীবনের অধিকাংশ কাল অতিশয় স্পর্শসংবেদনশীল থাকে। এইস্থানের ঘনসংবদ্ধ সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম নাড়ীতন্তু দ্বারা রমণজনিত আনন্দানুভূতি প্রথমত সুষুম্নারজ্জুতে ও তথা হইতে মস্তিষ্কে বাহিত হয়। শিশ্নগাত্রের উপরকার চর্ম চারিপার্শ্বে প্রবর্ধিত ও দ্বি-ভাঁজ হইয়া, "শিশ্নাগ্রচ্ছদা"র (Prepuce) সৃষ্টি করিয়াছে ; সংক্ষেপে ইহাকে অগ্রচ্ছদা বলা হয়। কোমল শিশ্ন-মুণ্ডের প্রায় সমস্তটাকে ঢাকিয়া রাখাই অগ্রচ্ছদার উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বাস্থ্যগত ও ধর্মগত কারণে বাল্যকালে কোন কোন জাতির অথবা ব্যক্তির অগ্রচ্ছদা কাটিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে শিশ্নমুণ্ড প্রায় স্ফুটিত হইয়া পড়ে।

অগ্রচ্ছদাহীনতায় সুবিধা ও অসুবিধা

অনেকের ধারণা যে, যাহাদের অগ্রচ্ছদা বাল্যকালে কাটিয়া শিশ্নমুণ্ডটি অনাবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা রমণ-ব্যাপারে অধিকতর পারদর্শী হয়। ইহা সম্পূর্ণ সত্য নয়। শিশ্নমুণ্ড শিশুকাল হইতে খোলা থাকিলে, উহা অধিকতর ঘাতসহ হয় বটে, কিন্তু অন্যদিকে আবার মানুষের সুখানুভূতি-শক্তি কমিয়া যায় ও বাহিরের নানারূপ রোগ-বীজাণুদ্বারা

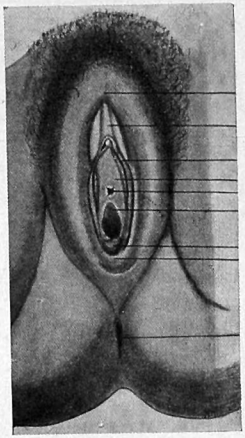

স্ত্রী-যৌনযন্ত্রের বাহ্যাংশ।

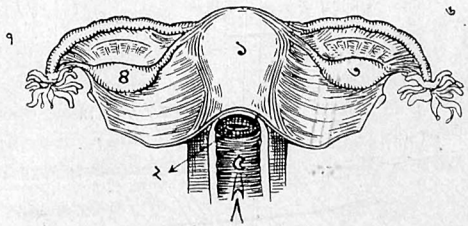

স্ত্রী-যৌনযন্ত্রের ভিতরাংশ।

Blank page (s)

উহা সহজেই আক্রান্ত হইয়া পড়িতে পারে। অগ্রচ্ছদাহীন লোকেদের অধিকাংশই ইচ্ছার উদ্রেক মাত্র অধিকতর অবলীলায় লিঙ্গোত্থান করিতে এবং প্রথম বয়সে সহবাস-ক্রিয়া একটু বেশি বিলম্বিত করিতে পারে সত্য, তথাপি শিশ্নমুণ্ডস্থ শিরাধমনী ও নাড়ীতন্তুগুলি শীঘ্র অকর্মণ্য হইয়া পড়ায়, শেষ বয়সে কামোদ্রেক্‌কালে লিঙ্গ স্বরায় যথারীতি কঠিন হইতে পারে না। সেইজন্য অগ্রচ্ছদাহীন ব্যক্তিদের অনেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়া আংশিক ধ্বজভঙ্গরোগে আক্রান্ত হয়; কেহ কেহ অকালস্খলনেও ভুগিয়া থাকে।...

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়

স্ত্রীলোকদের জননেন্দ্রিয় শরীর-গাত্রে দৃঢ়লগ্ন ও উহার কতকাংশ শরীরের মধ্যে অবস্থিত। ইহাদের জননেন্দ্রিয়ের বহিরঙ্গ প্রাচীন বৈদ্যক-শাস্ত্রে "ভগ" বা "যোনি" নামে কথিত। যোনির খাঁজের উপরিভাগে একজোড়া ক্ষুদ্র কঠিন হাড়ের খুলি আছে; উহা দুই পুরু চর্ম দ্বারা আবৃত। এই স্থানটির নাম "মদনাচল" (Mons Veneris)। কৈশোরের প্রারম্ভ হইতে এইখানে লোমোদ্গম হইতে থাকে। লোমরাজী ক্রমশ অর্ধগোলাকার রেখায় নিম্নদিকে বিসারিত হইয়া থাকে।

ভগাধর গুরু ও লঘু

নারীর বাহ্য জননেন্দ্রিয় উরুপার্শ্বস্থ প্রবর্ধিত কোমল মাংসপেশী-দ্বারা প্রায়-ডিম্বাকারে রচিত। মদনাচলের নিম্নপ্রান্ত হইতে এক জোড়া স্থূল ও চ্যাপ্টা ওষ্ঠের ন্যায় মাংসপেশী উদ্ভূত হইয়া তিন হইতে সাড়ে-তিন ইঞ্চি নিম্নে কোণাকারে একত্র সংবদ্ধ। ইহার ইঞ্চিখানেক নিম্নেই মলদ্বার।

একটা ক্ষীণ মাংসপ্রাচীর এই দুইটি প্রয়োজনীয় বিভাগকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উপরি-উক্ত ওষ্ঠবৎ মাংসপেশীর ফালিদ্বয়ের নাম "ভগাধর-গুরু" (Labia Majora)। প্রত্যেক ওষ্ঠের ভিতরের দিক্ দুইভাঁজ-করা। বাহ্যাংশের প্রান্তভাগ বাদামী রংয়ের, ঈষৎ কর্কশ ও রোমাবৃত, ভিতরাংশ মসৃণ ও সিক্ত।

ভগাধর-গুরু ঈষৎ ফাঁক্ করিলে, উহার ভিতর আর এক জোড়া দ্বিভাঁজ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতর ওষ্ঠ রহিয়াছে দেখা যায়; উহাদের নাম "ভগাধর-লঘু" (Labia Minora)। ইহারা যোনিনালী ও মূত্র-নির্গমনের ছিদ্রটিকে চাপিয়া রাখে। ঊর্ধ্বে যেস্থানে যুক্ত-বন্ধনী-শীর্ষের ন্যায় ভগাধর-লঘুর ওষ্ঠ দুইটি আসিয়া মিলিয়াছে, সেইস্থানে একটী ফোটকাকার উৎসেধ সংস্থিত—যাহার পরিচয় আপনাদিগকে ইতঃপূর্বেই দিয়াছি। উহার নাম "ভগাঙ্কুর" (Clitoris)।

ভগাঙ্কুর

এই উপাঙ্গটি এক টুক্‌রা চামড়ার খাপের মধ্যে অর্ধশায়িত, অর্ধ-লুক্কায়িত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাও স্পঞ্জবৎ উত্থানশীল পেশীতন্তু দ্বারা গঠিত, এবং ইহাকে পুরুষের শিশ্নমুণ্ডের একটি ক্ষুদ্রতম সংস্করণ বলা চলে। উহা সাধারণত এক-তৃতীয়াংশ ইঞ্চির বেশি দীর্ঘ হয় না। যে-সকল স্ত্রীলোক একটু বেশি পুরুষভাবাপন্ন, অথবা যাহারা এই উপাঙ্গটি বাল্য ও কৈশোর হইতে ঘর্ষণ ও পীড়ন করিয়া যান্ত্রিকভাবে অকালজাত কামাবেগ প্রশমন করিয়াছে, তাহাদের ভগাঙ্কুর ⅓ ইঞ্চির—কখনো বা ½ ইঞ্চির বেশিও লম্বা হইতে পারে। বাহ্যাঙ্গের মধ্যে কামোদ্রেকের যতগুলি স্থান আছে, তন্মধ্যে ভগাঙ্কুর হইল সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল

(sensitive) ও হর্ষসঞ্চারক। স্বাভাবিকভাবে নারীর কামোদ্রেক হইলে, ভগাঙ্কুর ঈষৎ উচ্ছ্রিত হইয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়, এবং ইহার মধ্য দিয়া তড়িতের ন্যায় একটা অনির্দেশ্য শক্তি প্রবাহিত হইয়া অগ্রভাগকে দ্রুত স্পন্দিত করিতে থাকে।

ভগাঙ্কুরের অল্প নিম্নেই রহিয়াছে মূত্রনালীর মুখ। স্ত্রীলোকদিগের মূত্রনালী পৃথগ্‌ভাবে মূত্রস্থালী হইতে বহির্গত হইয়া, এইখানে আসিয়া শেষ হইয়াছে। নারীদের মূত্রনালী দেড় ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ নহে। মূত্রনালী ও যোনিনালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, উভয়ের মধ্যে আগাগোড়া একটা পুরু পেশীপ্রাচীরের ব্যবধান রহিয়াছে।

যোনিদ্বার ও সতীচ্ছদ

মূত্রনালীর নিম্নে অর্থাৎ মলদ্বারের আরো সমীপে যোনিনালী বা জননপথের দ্বার। উরুদ্বয় দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে থাকিলে, যোনিনালীর মুখ একটি লম্বালম্বি ক্ষীণ বিদার বা ফাটলের মতো দেখায়; কিন্তু উরুদ্বয় পৃথক করিয়া ঊর্ধ্বে তুলিলে উহা প্রায়-গোলাকার ধারণ করে। শিশুকাল হইতেই যোনিমুখের নিম্নদিক হইতে একটি নাতিস্থূল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রাবরণী উত্থিত হইয়া, ঈষৎ তির্যগ্‌ভাবে যোনিনালির ভিতর দিকটি আবৃত করিয়া রাখে। এই গুটানো ঝিল্লীর ঊর্ধ্বপ্রান্তে ক্ষুদ্র খণ্ডচন্দ্রাকার একটি ছেদ্ থাকে, তদ্দ্বারা কিশোরীদের মাসিক ঋতুস্রাব বহির্গত হইবার সুবিধা পায়। ইহার নাম "সতীচ্ছদ" (Hymen)। সচরাচর প্রথম পুরুষ-সংসর্গ-কালে ইহার প্রায় সমস্তটাই ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, ও তাহার ফলে ঈষৎ রক্তপাত হয়।

পূর্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, অ-রমিতা কুমারীমাত্রেরই সতীচ্ছদ

অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু এক্ষণে অসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রমিতা না হইয়াও যে-সকল কুমারী বাল্যকাল হইতে দৌড়-ঝাঁপের খেলায়, সাইকেল ও ঘোড়ায় চড়ায়, অতিরিক্ত ঢেঁকি চালনায় অথবা দাঁড়াইয়া কাপড় কাচায় (যেমন ধোপার মেয়েরা করে) অভ্যস্ত, তাহারা নির্দোষভাবেই পুরাপুরি বা অংশত সতীচ্ছদ হারাইতে পারে। যাহারা কৈশোরে অঙ্গুলি বা অন্য কোন নলাকার বস্তু অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া কামবাসনা চরিতার্থ করে, তাহারাও সতীচ্ছদহীনা হয়। আবার যাহাদের সতীচ্ছদ একটু বেশি পুরু ও সঙ্কোচপ্রসারশীল, তাহাদের যোনিনালীতে পুরুষের ইন্দ্রিয় কিছুদূর অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে, অথচ সতীচ্ছদ সহজে ছিঁড়ে না।...সতীচ্ছদ ছিঁড়িয়া গেলেও উহার অসম মূলদেশ চিরকাল অল্পবিস্তর অটুট থাকে, ও করাঙ্গুলিস্পর্শে বেশ অনুভব করা যায়।

স্যন্দনী গ্রন্থিনিচয়

ভগাধর লঘুর ভিতর দিকে ও যোনিনালীর দ্বার-সন্নিধানে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালিকার মুখ সংলগ্ন রহিয়াছে। এই স্থানের চাম্‌ড়ার নিচে সীমের বীজের ন্যায় কতকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থি সাজানো থাকে; ঐ নালিকাগুলি এইসকল গ্রন্থির রস সূক্ষ্ম কণায় প্রতিনিয়ত নিঃসারণ করিয়া দিতেছে। গ্রন্থিগুলির নাম "স্যন্দনী-গ্রন্থি" (Glands of Bartolini or Bartholin glands) এবং তন্নিঃসৃত রসের বিশেষ নাম "স্যন্দন রস"। এই রস সর্বদা যৎসামান্য মাত্রায় ক্ষরিত হইয়া যোনিনালীকে সিক্ত রাখে। যোনিনালীর অভ্যন্তরভাগেও এইরূপ রসনিঃস্রাবী কয়েকটি বড় গ্রন্থি আছে। কামোদ্রেক হইলে, স্যন্দনী-গ্রন্থিগুলি ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া অধিক পরিমাণে রসনিষেক করে। তাহার ফলে যোনি-

নালীর আদ্যোপান্ত পিচ্ছিল হইয়া যায়। রতিক্রিয়া অগ্রসর হইলেও যোনিনালীর অভ্যন্তরভাগের সংগুপ্ত গ্রন্থিগুলি হইতে প্রচুর রসনিঃস্রাব হইতে থাকে,—যদিও তৎসম্বন্ধে রমণীর প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান থাকে না।

যোনিনালী

যোনিনালী সাধারণত তিন হইতে সাড়ে তিন ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। উহার শেষপ্রান্ত রীতিমতো চওড়া হইয়া, জরায়ু-মুখের চারিদিক বেড়িয়া রহিয়াছে। যোনিনালীর আগাগোড়া প্রাচীর কোমল ও স্থিতিস্থাপক পেশীতন্তুর দ্বারা প্রস্তুত এবং উপরিভাগ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর দ্বারা মণ্ডিত। নালীর মধ্যে অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিলে বুঝা যায় যে, উহা কোমল হইলেও মসৃণ নয়, চারিদিক বলয়াকারে সরু খাঁজ কাটা। ইহার উদ্দেশ্য—প্রয়োজনমতো উহাকে দুই হইতে চতুর্গুণ পর্যন্ত প্রশস্ত হইতে সমর্থ করিয়া তোলা। অভ্যাস করিলে, স্ত্রীলোকগণ যোনিনালীর প্রাচীরগাত্র কিছুক্ষণের জন্য ঈষৎ সঙ্কুচিত করিতেও পারে। বহুদিন সঙ্গম ও বহুসন্তান ধারণের ফলে যোনিনালীর পেশীতন্তুসমূহ কতকটা স্থিতিস্থাপকতা-গুণ হারাইয়া ফেলে। তদ্ব্যতীত, কামোত্তেজনার সময় প্রত্যেক রমণীরই এই পথটি সাময়িকভাবে অধিক রসাক্ত ও কিঞ্চিৎ প্রশস্ত হইয়া পড়ে।

জরায়ু বা গর্ভাশয়

জরায়ু বা গর্ভাশয়ের মধ্যেই ভ্রূণদেহের উৎপত্তি ও বিকাশ। গর্ভাধানহীন জরায়ুর আকার চ্যাপ্টা কাশীর পেয়ারার মতো; দৈর্ঘ্য সাড়ে-তিন ইঞ্চি ও প্রস্থ আড়াই ইঞ্চির বেশি নয়। গর্ভের শেষ

অবস্থায় উহা ১১-১২ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হইতে পারে। ইহার প্রশস্ত প্রান্তটি ঊর্ধ্বদিকে হেলিয়া আছে এবং সরু দিক্‌টি যোনিনালীর শেষ ভাগে ঝুলিয়া আছে। জরায়ুর ভিতর-প্রাচীর সাধারণত খুব পুরু তিন পর্দা পেশী ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীদ্বারা আবৃত। উহার মধ্যস্থলে ত্রিকোণাকার খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে।

জরায়ুর ঊর্ধ্ব ও পশ্চাদ্‌ভাগে মলকোষ্ঠ (Rectum) ও সম্মুখভাগে মূত্রনালী। আশে পাশে কয়েকটি স্থিতিস্থাপক স্নায়ুরজ্জু দ্বারা যন্ত্রটি যথাস্থানে নিবদ্ধ আছে বটে, তথাপি যোনিনালী-পথে কোনো বস্তুর দ্বারা ধাক্কা খাইয়া ইহা উভয়পার্শ্বে ইঞ্চিখানেক ও ঊর্ধ্বদিকে বড় জোর ইঞ্চি দুয়েক অনায়াসে সরিয়া যাইতে পারে। ইহায় চেয়ে বেশি হঠিবার দরকার হইলে, মূত্রস্থালীতে, অন্ত্রে ও মলকোষ্ঠে আঘাত লাগে; তজ্জন্য জরায়ু-মুখ ও সমগ্র তলপেট্ বেদনাযুক্ত হইতে পারে। এইস্থলে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়া যাওয়া প্রয়োজন যে, যুবতীদিগের যোনিনালী-মধ্যে সাড়ে-পাঁচ ইঞ্চি পর্যন্ত কোনো লম্বাকার বস্তু প্রবেশ করিলে, তাহা ক্লেশদায়ক হয় না।

গর্ভদেহ, গর্ভগ্রীবা ও গর্ভমুখ

জরায়ুর বিস্তৃত ঊর্ধ্বাংশকে "গর্ভদেহ" ও নিম্নের অপ্রশস্ত অংশকে "গর্ভগ্রীবা" (Cervix) বলা হয়। গর্ভগ্রীবার মধ্য দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ ছিদ্র বরাবর গর্ভদেহের মধ্যভাগ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ছিদ্রটি এত সরু যে, স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার মধ্যে একটি ছুঁচ প্রবেশ করানো দুঃসাধ্য; অথচ প্রসব-কালে উহা প্রায় সাড়ে-চারি ইঞ্চি পরিমাণ বিস্ফারিত হইয়া বহুকষ্টে সন্তানদেহকে বাহির করিয়া দেয়।

এক জোড়া পুরু ঠোঁট্ বাহিরের দিকে বাড়াইয়া কতকটা গোলভাবে গুটাইয়া রাখিলে যেরূপ দেখায়, গর্ভগ্রীবার বহিঃপ্রান্তটিও সেইরূপ। ইহার মধ্যস্থলে ছিদ্রপথের দ্বারটি "গর্ভমুখ" (Os uteri) নামে অভিহিত।

সঙ্গমকালে শিশ্নমুণ্ড আসিয়া গর্ভমুখেরই প্রান্তে বারবার ঠেকিতে থাকে। গর্ভমুখ-সমেত গর্ভগ্রীবার বহিঃপ্রান্তটি অত্যন্ত সুখানুভূতিশীল। সহবাসকালীন্ আনন্দের বারো আনা অংশই ইহার দ্বারাই পরিগৃহীত হইয়া সুষুম্নারজ্জু ও মস্তিষ্কে নীত হয়। পুরুষের সুরতে চরমানন্দ লাভের সমসময়ে যেরূপ শুক্র নিষ্কাশিত হয়, রমণীর ঠিক্ সেইরূপ কোন বিশিষ্ট রস (যদ্বারা গর্ভোৎপত্তির সহায় হইতে পারে) নিঃসৃত হয় না বটে; তবে ঐ সময় জরায়ুর মুখ হইতে এক প্রকার তড়িৎশক্তির ন্যায় নাড়ীগত নিষ্কৃতি (nervous discharge) হইল—তাহা স্পষ্ট অনুভব করা যায়। ইহাকে পাশ্চাত্য যৌনতত্ত্ববিদ্‌গণ orgasm বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অনুকূল পরিবেশে সহবাস-ক্রিয়া পাঁচ হইতে দশ মিনিট কাল একাদিক্রমে পরিচালিত হইলে, মোটামুটি সকল স্ত্রীলোক একবার orgasm লাভ করিতে পারেন। সুতরাং সকলের পক্ষে সর্বক্ষেত্রে ইহা লাভ করার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে না।

বিসৃষ্টি রস

সঙ্গম ঘনীভূত হইলে; অথবা চরমানন্দ লাভের সমসময়ে জরায়ুর বহিঃপ্রান্ত চুঁয়াইয়া এক প্রকার পাৎলা রস পড়িতে থাকে। তাহা ছাড়া কোনো কোনো সময় জরায়ু-মুখের অভ্যন্তর হইতে অতিঘন আঠার ন্যায় বা গ্রন্থিল সূত্রবৎ পদার্থ নির্গত হয়। উহার নাম "বিসৃষ্টি

রস" (Kristler's slimy plug)। বহু রমণীই এই রস-নিষেকের অনুভূতি টের পান না, শুধু একটা অসাধারণ, অনির্বচনীয়, চমকপ্রদ, সংজ্ঞাহারী হর্ষ সারাদেহে যেন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল—মাত্র তাহাই বুঝিতে পারেন। রতিক্রিয়া অতিরিক্ত প্রলম্বিত হইলে, তবে বিসৃষ্টি-রসের ক্ষরণ সম্ভবপর হয়, এবং তাহাও সচরাচর হয় না।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, রমণীর জরায়ু-নিঃসৃত কোন রসেই শুক্রকীটের অনুরূপ কোনো অণুদেহী জীব নাই, এবং উহারা গর্ভাধানে বিন্দুমাত্র সহায়তা করিতে অশক্ত।

অণ্ডাণুপ্রবা

জরায়ু-দেহের ঊর্ধ্বপ্রান্তের উভয় পার্শ্বে দুইটি নল সংলগ্ন আছে; এই নল দুইটির নাম "অণ্ডাণুপ্রবা" (Oviduct or Fallopian tubes)। প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য চারি ইঞ্চি এবং উহা উড্-পেন্সিলের ন্যায় স্থূল। শেষের দিকে ইহা অপেক্ষাকৃত চওড়া হইতে হইতে প্রান্তভাগে পাৎলা অসম ওষ্ঠযুক্ত হইয়া, কতকটা ঝুম্‌কো ফুলের আকার ধারণ করিয়াছে। অণ্ডাণুপ্রবার ভিতর দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ প্রণালী আছে; উহা জরায়ুর ফাঁপা স্থলটীর সহিত সংযুক্ত। জরায়ু ও অণ্ডাণুপ্রবার মধ্যবর্তীস্থলে এক-একটি অণ্ডাশয় (Ovary) সংস্থিত। উহার যৎসামান্য পরিচয় আপনারা পূর্বে পাইয়াছেন।

অণ্ডাশয় ও অণ্ডাণু

মৌচাকের মধুকোষের মতো কয়েক হাজার অতিক্ষুদ্র কোষ সাজানো থাকে অণ্ডাশয়ের চারিদিকে—উপরিতলে, এবং গাত্রটি পাৎলা চাদরে

গোলাকার চিত্রে স্ত্রীলোকের দুই নিতম্বের মাঝখান দিয়া তলপেটটি লম্বালম্বি চিরিয়া তাহার একাংশ দেখানো হইয়াছে। নিম্নচিত্রে যোনিনালীর প্রায় সমস্তটা, লম্বালম্বি কাটা জরায়ু, একদিগের অণ্ডাণুপ্রবা ও অণ্ডাশয় প্রদর্শিত। একটি স্ফুটিত অণ্ডাণু কিভাবে অণ্ডাণুপ্রবার ঝালরযুক্ত প্রান্ত কর্তৃক গৃহীত হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

Blank page (s)

মোড়া থাকে। ক্ষুদ্র কোষগুলির মধ্যে থাকে কি জানেন ?—একটি করিয়া অপরিণত অণ্ডাণু (Ovum)। কৈশোরের সূত্রপাত হইতে প্রতি চান্দ্রমাসে (অর্থাৎ ২৮ দিনের মধ্যে) একদিকের অণ্ডাশয়ের এক-একটি কোষের মধ্যে একটি করিয়া অণ্ডাণু পরিপুষ্ট হয়। ঐ সময় অণ্ডাশয়ের গায়ের উপর ফুস্কুড়ির ন্যায় একটা স্থান ফুলিয়া উঠে, এবং পরিণতি সম্পূর্ণ হইলেই অণ্ডাণুটি পাৎলা আবরণী ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে (Ovulation)। ঐ সময় অণ্ডাণুপ্রবার ঝালরযুক্ত প্রান্ত ঈষৎ অবনমিত হইয়া, সেই মুক্ত ও পুষ্ট অণ্ডাণুটিকে আপনার মধ্যে শুষিয়া লয়।... অণ্ডাণুই হইল আসল স্ত্রীবীজ, গর্ভোৎপত্তির অপরিহার্য উপাদান।

অণ্ডাণুপ্রবার ভিতর-গাত্রে এক প্রকার ঘনসন্নিবিষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোম আছে; উহারা অবিরত জরায়ু-গহ্বরের দিকে হিল্লোলিত হইতেছে। সুতরাং শোষিত হইবার পর অণ্ডাণুটি রোমের সাহায্যে, স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায়, জরায়ু-গহ্বরের দিকে অতি ধীরগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। অণ্ডাণুপ্রবার মধ্যে যদি পুরুষের একটি শুক্রকীট আসিয়া অণ্ডাণুর সহিত মিলিত হইতে পারে, তাহা হইলেই গর্ভোৎপত্তির সূচনা হয়। তখন এই সংযুক্ত পুং-ও-স্ত্রীবীজ (এক কথায় 'জীবাঙ্কুর' বলা যায়) জরায়ুর মধ্যে আপতিত হইয়া, উহার কোমল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর গাত্রে প্রোথিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে নানা পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া হয় ভ্রূণের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি।

শুক্রকীট

স্ত্রীলোকের একটি অণ্ডাণু ও পুরুষের একটি শুক্রকীট উভয়েই এত ক্ষুদ্র যে, উহারা স্বাভাবিক-দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়,—উহাদিগকে অণুবীক্ষ্য যন্ত্র-

সাহায্যে দেখিতে হয়। শুক্রকীট দেখিতে একটি সদ্যোজাত ব্যাঙাচির মতো; প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চির ৪০০ ভাগের এক ভাগেরো কিছু কম। মস্তক, কাণ্ড ও পুচ্ছ—এই তিনটি অংশ লইয়া ইহার শরীর। পুচ্ছ দ্বারা সম্মুখভাগে একটা ধাক্কা দিয়া, ইহারা চলিতে-ফিরিতে পারে। খুব শক্তিশালী শুক্রকীট ঘণ্টায় পাঁচ ইঞ্চি স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ। একবার সহবাসের ফলে যেটুকু বীর্যক্ষরণ হয়, তাহার ওজন মোটামুটি দুই কাঁচ্চা; উহার মধ্যে ব্যক্তি ও বয়স-বিশেষে পাঁচ লক্ষ হইতে পঁচিশ লক্ষাবধি শুক্রকীট বর্তমান থাকে। মানুষের দেহ-তাপের মধ্যে শুক্রকীটগুলি সুন্দর বাঁচিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু ঠাণ্ডা জল ও বাতাসের সংস্পর্শে উহারা অল্পক্ষণ-মধ্যে নিষ্প্রাণ হইয়া পড়ে। সহবাসের পর আট্‌চল্লিশ ঘণ্টাকাল ইহারা বেশ সক্রিয় থাকিতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দশ হইতে সতেরো দিন পরও রমণীর গর্ভগ্রীবায় ও জরায়ুর মধ্যে তাজা শুক্রকীট দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

অণ্ডাণু ও ঋতুস্রাব

স্ত্রীলোকদিগের অণ্ডাশয়-জাত অণ্ডাণু শুক্রকীট্ অপেক্ষা প্রায় চার-পাঁচ গুণ বড়, এবং দেখিতে একটি ক্ষুদ্র চাক্‌তির ন্যায়। ইহাদের শরীরের উপরিভাগ আঠালু পদার্থ দিয়া তৈয়ারি, মধ্যস্থলে একটি অতিসূক্ষ্ম কোষাণু-কেন্দ্র (nucleus) সংস্থিত। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুর দেহ আবার সূক্ষ্মতর একটি চাদরে মোড়া থাকে। অণ্ডাণুগুলির ক্রমপুষ্টি ও মুক্তির সহিত স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুর ঘনিষ্ট সম্পর্ক। রমণীর যে বয়স হইতে অণ্ডাশয়ের গাত্রে অণ্ডাণুগুলির পরিণতি-ক্রিয়া আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতে ঋতুস্রাবেরও সূত্রপাত হয়। ঋতুস্রাব যেদিন দেখা

দেয়, তাহার চৌদ্দদিন (মতান্তরে ২।৩ দিন) আগে একটি করিয়া পরিপুষ্ট অণ্ডাণু আপন জন্মস্থানের মায়া কাটাইয়া, নিয়মিতভাবে অণ্ডাণুপ্রবার ভিতর আসিয়া থাকে *।

শুক্রকীট-সংযোগে গর্ভোৎপত্তি হয় তো ভালই, নচেৎ অণ্ডাণুপ্রবা অথবা জরায়ু-মধ্যে কয়েকদিন পর্যন্ত তাজা থাকিয়া, অণ্ডাণু বিকৃত ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। পরবর্তী ঋতুস্রাবের সহিত বেমালুম মিশিয়া, উহা শরীরের বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হয়। ঋতুস্রাবের অর্থ আর কিছুই নয়—জরায়ুগাত্রকে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া সম্ভাব্য জীবাঙ্কুরের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখা। গর্ভোৎপত্তি হইলে, এক বৎসর বা তদধিক কাল অণ্ডাশয়ের বুক চিরিয়া আর অণ্ডাণু বাহির হয় না, ঋতুস্রাবও হয় না।

সাড়ে বারো অথবা তেরো বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ঋতুশোণিত প্রতি চান্দ্রমাসের শেষে (অর্থাৎ ২৯ দিনে) নির্গত হয়। কাহারো কাহারো আটাশ দিনের মধ্যে দুইবার, আবার কাহারো ত্রিশ-বত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ দিন অন্তর একবার ঋতুস্রাব উপস্থিত হইতে দেখা যায়। সুস্থদেহেও প্রতিবারে স্রাবের স্থায়িত্বকাল দুই হইতে আটদিন পর্যন্ত হইতে পারে।...

ছেচল্লিশ বৎসর বয়সের পর গড়্‌পড়্‌তা সকল রমণীর কিছুদিনের জন্য একটা শারীরিক ও মানসিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে "ঋতুসংহার"

* **Sex Hygiene** by Dr. Julia K-von Sneidern & Dr. A. Sundquist; Tr. by Mary E. Collet, PH. D., (George Allen & Unwin), p. 26. Also **Periodic Fertility & Sterility in Women** by Prof. H, Knaus (W. Mandrich, Vienna), p. 15.

(Menopause) সংঘটিত হয়। ইহার পর যৌনাবেগ স্পষ্টত কমিয়া যায়; আর ঋতুও হয় না, গর্ভও হয় না।...একেবারে নিশ্চিন্ত, নিরাপদ!

গর্ভাধান-পদ্ধতি

সহবাসে চরমানন্দ-লাভের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ গর্ভগ্রীবার ঊর্ধ্ব বা নিম্নাংশে, কখনো কখনো গর্ভমুখে সবেগে শুক্রক্ষরণ করিয়া দেয়। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতিবারে ক্ষরিত শুক্রের মধ্যে পাঁচ হইতে পঁচিশ লক্ষ শুক্রকীট থাকিতে পারে। যোনিনালি-নিঃসৃত অম্লাত্মক রসে অবিলম্বে বহু সংখ্যক শুক্রকীট মরিয়া যায় বা মৃতপ্রায় হয়; কিন্তু ঐ সময় যদি রমণীর তরফ্ হইতে চরমানন্দ-লাভের ফলে গর্ভগ্রীবা হইতে ক্ষারধর্মাত্মক রস নিস্যন্দিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রায় সমস্ত শুক্রকীটই সক্রিয় অবস্থায় ঐস্থানে কিছুক্ষণ চলা-ফিরা করিতে পারে।

তারপর শুক্রের আঠালু রস ভেদ করিয়া, কয়েক সহস্র শুক্রকীট জরায়ু-মুখে দল বাঁধিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। জরায়ু-গহ্বরের গাত্রেও শুঁয়া পোকার লোমের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমরাজী আছে; ঐ লোমগুলি তরঙ্গায়িত হইয়া বহিরাগত বস্তুকে মুখের দিকে ঠেলিয়া দেয়—যাহাতে কেহ ভিতরে বেশি দূর অগ্রসর হইতে অথবা আড্ডা গাড়িতে না পারে। এই লোমজ হিল্লোলে পড়িয়া বেশির ভাগ শুক্রকীটই অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। তথাপি কয়েকটি শক্তিশালী ও সাহসী শুক্রকীট্ উজান ঠেলিয়া গহ্বরের ঊর্ধ্বভাগে উঠিয়া, দুইদিকের অণ্ডাণুপ্রবার মধ্যে প্রবেশ করে। অণ্ডাণুপ্রবার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহারা যদি বুঝিতে পারে যে, উহার মধ্যে সেই সময় কোন অণ্ডাণু তাহাদের অভিমুখে আসিতেছে, তাহা হইলে তাহারা অন্ধ আগ্রহে সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলে।

আর যদি সেই সময় কোন অণ্ডাণুপ্রবার মধ্যেই অণ্ডাণু নাই বলিয়া টের্ পায়, তখন তাহারা যেন ভগ্নমনোরথ হইয়া গতিবেগ কমাইয়া দেয়। অণ্ডাণুপ্রবার শেষপ্রান্তে আসিয়া তাহারা চলচ্ছক্তিহীন হইয়া থামিয়া পড়ে,—শেষে অণ্ডাণুর আশায় বৃথা দিন গণিয়া মরিয়া যায়। ইহাদের মৃত-দেহগুলিও পরবর্তী ঋতু-শোণিতের সঙ্গে জরায়ু-মুখ দিয়া নির্গত হয়।

প্রথমোক্ত দল—যাহারা নিজেদের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা সুরু করিয়া দিয়াছিল, তাহারা যখন অণ্ডাণুর প্রায় সম্মুখীন্ হয়, তখন সর্বপ্রথম স্থানাধিকারকারী ছুটিয়া গিয়া নিজের মাথাটি সজোরে অণ্ডাণুর কোমল কেন্দ্রে প্রোথিত করিয়া দেয়। ল্যাজ্‌টুকু কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন পরম ও চরম পুলকলাভের লক্ষণ স্বরূপ দ্রুত স্পন্দিত হইয়া থামিয়া যায়। তখন এই যুক্ত দেহের উপর আপনা-আপনি একটা দুর্ভেদ্য পর্দা পড়িয়া যায়—যাহাতে আর কোন প্রতিযোগীর শুক্রকীট আসিয়া তাহার মধ্যে নিরর্থক মাথা গলাইতে না পারে। তারপর নানা আভ্যন্তরিক রূপান্তরের মধ্য দিয়া হয় নবজীবনের উন্মেষ!

দেখুন,—এই আণবিক কোষাণুর মধ্যেও রহিয়াছে স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন এবং যোগ্যতমের জয়। প্রেমিকাকে চাহিতে চাহিতে প্রেমিক তাহাতে যেন একেবারে চিরতরে তন্ময়, তদ্গত হইয়া গেল।... আর একটা সত্যের আমরা স্পষ্ট আভাস পাই যে, প্রেম-জীবনে বিশ্ব-প্রকৃতির চিরন্তন অভিপ্রায়—একের জন্য একের একান্ত আকর্ষণ, একের সহিত একের মহামিলন; তারপর এই যুগ্ম সত্তা হইতে বহু জীবনের সূত্রপাত!

—•—

==দশম পটল==

বিবাহ ও প্রেমের উৎকর্ষ

মানুষের মধ্যেও একের জন্য একের একান্ত আকর্ষণ, একের সহিত একের মহামিলন—প্রকৃতির সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্যই সম্ভবত বিবাহ-সংস্কারের সৃষ্টি। মনুষ্যেতর উচ্চনীচ প্রাণী-জগতের মধ্যে আমরা যে যৌন আকর্ষণ দেখি—তাহা প্রেমের নহে, তাহা শুধু প্রজাসৃষ্টির অন্ধ, অনির্দেশ্য, সংস্কারগত আকর্ষণ। তাহাদের মিলন আজীবনের নয়, তাহা সাময়িক—যতক্ষণ গর্ভসঞ্চার না হয় বা যতদিন সন্তান না জন্মে, ততক্ষণ বা ততদিনই তাহা সম্ভব। যখন গর্ভধারণের প্রাকৃতিক প্রেরণা অন্তরে আসে, তখন একটি স্ত্রী-প্রাণী, যে-কোন একটি সবল পুরুষ-প্রাণীকেই পাইলেই সন্তুষ্ট। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, সে আর পুরুষটিকে মনে রাখে না; পুরুষও আর তাহার দিকে ফিরিয়া চায় না। আবার তাহারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে করিতে, সময়বিশেষে অপরের সহিত মিলিত হইতে পারে।

মনুষ্যেতর প্রাণীর নিষ্প্রেম কামবৃত্তি

একজাতীয় মাকড়সা আছে, তাহাদের স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি অপেক্ষা আকারে দ্বিগুণেরও বেশি বড়। পুরুষকে এক প্রকার ছলে-বলে বাধ্য করিয়া স্ত্রী-মাকড়সা নিজের যৌনতৃষ্ণা মিটাইয়া লইতে থাকে; যখন বুঝিতে

পারে যে, সে গর্ভধারণ করিয়াছে, অমনি পুরুষ মাকড়সাকে সবলে ধরিয়া তাহার রক্ত চুষিয়া খায়। তাহার মনে একটা সহজ জ্ঞান ভাসিয়া উঠে যে, তাহার তখনকার মতো আশা তো মিটিয়াছে, পরে প্রয়োজন হয় কত পুরুষ মিলিবে। এ পুরুষ যখন আমাপেক্ষা দুর্বল, তখন ইহাকে মারিয়া ফেলিতে দোষ কি!···মাকড়সার মধ্যে প্রেম নাই, বিশ্বস্ততা নাই, কৃতজ্ঞতা-বোধ নাই।

অন্যান্য বহু প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায় যে, তাহারা দলবদ্ধভাবে বাস করে; দলের প্রত্যেক পুরুষই প্রত্যেক স্ত্রীকে ভোগ করিতে পারে—এমন কি, আত্মীয় ও আত্মজগণ পর্যন্ত বাদ যায় না। তারপর, এই ভোগের একটা প্রকৃতি-নির্দিষ্ট সময় আছে। অন্তর হইতে তাহারা পরস্পরের কায়গত জ্ঞান লাভ করিবার একটা স্বতস্ফূর্ত অদম্য আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। ইহাকেই নিছক্ 'কাম' বলা যায়; উহা সম্পূর্ণ দৈহিক তাগিদ, এবং আসেও একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে অথবা নির্দিষ্ট সময়-অন্তে। শুধু গৃহপালিত পশুপক্ষীর মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

আদিম যুগে বিবাহের সূত্রপাত

মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীতে আসিল, তখন সে কিছুদিন তাহার পূর্বাগত প্রাণীদের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল; সে-ও সঙ্ঘবুদ্ধি (herd instinct) ও প্রাকৃতিক প্রেরণা-দ্বারা চলিতে লাগিল। পশুপক্ষীর মতো যৌনোপভোগে ছিল না তাহাদের সরম-বিজড়িত গোপনতা, ছিল না কোনো সামাজিক বিধি-নিষেধের কঠিন নিগড়। নিজের অন্নসংস্থানের চিন্তা রহিল তাহার সংজ্ঞাত মনে, প্রজনন রহিল

তাহার তন্দ্রাচ্ছন্ন অন্তরাত্মার পটভূমিকায়। জীবিকানির্বাহের ক্রমবর্ধমান দুর্ভোগ ক্রমশ তাহাকে ব্যক্তিগত সুখের জন্য এক-একটা সংসার পাতার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিল। তখন তাহারা পাশে চাহিল নারীকে যে তাহার ভিতর দেখিবে ষোলো আনা, দরকারমতো বাহির দেখিবে আট আনা; যে নিকটে থাকিয়া স্বয়মাগত কাম-বহ্নির প্রসন্নতা-সম্পাদন করিবে, সন্তানকে কোলে করিয়া মানুষ করিবে। তখন হইতে হইল কামের যুগজীর্ণ কুটিরে প্রেমের বোধন-ঘটের সংস্থাপন।

বিবাহ বা বধূ-গ্রহণ ব্যাপারের মধ্যে ধর্মের অনুশাসন ও রাষ্ট্রের সমর্থন আসিয়াছে অনেক পরে। কিন্তু পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে, গৃহগত ও যৌনধর্মগত কারণে, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর একজন সঙ্গিনীর সহিত যথাসাধ্য স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা আদিম মানব কয়েক পুরুষের অভিজ্ঞতা-লাভের পর গড়িয়া লইয়াছিল। তখন সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচনে এত রুচি-বৈচিত্র্য ও দুস্তোষণীয়তা ছিল না,—শুধু স্বাস্থ্যসম্পন্ন, নিরলস, সহানুভূতিশীল দুইটি যুবকযুবতী ইচ্ছা করিলেই এক উটজ-বিচ্ছায়ে আসিয়া মিলিতে পারিত।...তারপর যে যোগ্যতম, যে বীরাগ্রগণ্য, সে নিজের সর্ববিধ ভোগসুখের জন্য একাধিক নারীকে আপন আপন বক্ষপুটে টানিয়া লইতে চাহিত। আহার-সংগ্রহে ও আহার-সংরক্ষণে নারী তখন পুরুষকে কায়মনে সাহায্য করিত। সেইজন্য তাহাকে পরিত্যাগের সম্ভাবনা ছিল কম—যদিও হরণের প্রাদুর্ভাব ছিল অত্যন্ত বেশি *।

নারী বুদ্ধিতে ও বীর্যে পুরুষের এক ধাপ নিচে রহিলেও স্বর্ণ-

* "Sex & Primitive Society" (Goldenweiser) in **Sex in Civilisation,** New York, 1929.

ডিম্বপ্রসূ রাজহংসীর মতো ভবিষ্যৎ-বংশধরের ধাত্রীরূপে তাহার একটা কিম্বৎ রহিল; সুতরাং সে প্রিয়-দাসী ও জীবন্ত সম্পত্তিস্বরূপ গণ্যা হইল। গোষ্ঠিপতি ও সমাজনেতৃগণ ইহাদের উপর পুরুষের স্বত্বস্বামিত্ব স্বীকার করিলেন, স্ত্রীধর্ষী ও স্ত্রীচৌরকে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পর আসিয়াছিল নারী-ক্রয়ের যুগ! তখন কন্যার পিতাকে গাভী, জমি ও মুদ্রা দিয়া পত্নী সংগ্রহ করিতে হইত। দরিদ্র জামাতা অনেক সময় শ্বশুরের সংসারে মজুর খাটিয়া পত্নীর মূল্য শোধ করিত।

বিবাহের ক্রমবিকাশ

সভ্যতার সূর্যালোক যেদিন মানুষের প্রজ্ঞাকে প্রস্ফুটিত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, সেইদিন হইতে ওই সঙ্গী-সঙ্গিনীর পারস্পরিক সাহচর্য বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া আরো স্পষ্ট, আরো মধুর, আরো পবিত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর কালের মধ্যে বিবাহের কত যে রূপান্তর হইয়াছে, কত বিপ্লবের অস্ত্রাঘাত উহাকে যে সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। রাক্ষস হইতে প্রাজাপত্য—বহুস্বামীত্ব হইতে বহুপত্নীত্ব, ইচ্ছামতো বিবাহ হইতে ইচ্ছামতো বিচ্ছেদ—বিবাহের কত না লীলা-ছন্দে যোগ দিয়া মানুষ ভাসিল, ডুবিল, কাঁদিল, হাসিল, বাঁচিল ও মরিল! আজিও জগতের বিভিন্ন স্থানে কালস্রোতোভূত সর্ববিধ বিবাহের বিধান-চিহ্ন অল্পবিস্তর বর্তমান রহিয়াছে।

মানুষ যখন হইতে কৃষ্টির উচ্চস্তরে পদার্পণ করিয়াছে, তখন হইতেই উপলব্ধি করিয়াছে যে, বিবাহ তাহার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিজ্ঞতা এবং একবিবাহই (এক-পত্নীত্ব ও এক-ভার্যাত্ব)

সর্বপ্রকার বিবাহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখন পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই একবিবাহ-পন্থী। যে-যুগে ইহুদীরাজ মহাজ্ঞানী সলোমন এক হাজার ভার্যার অধিপতি ছিলেন, তুর্ক অথবা মুসলমান-ভারতে ধনীর হারেম শত শত স্ত্রীর কলগুঞ্জনে মুখরিত হইত, হাঙ্গেরি ও রুম্যানিয়ায় বিবাহার্থী কন্যারা তাহাদের যথাসাধ্য উপঢৌকন সঙ্গে লইয়া প্রকাশ্য হাটে গিয়া পত্নীকামী যুবকদের নেত্রপথে আপনাদিগকে উন্মুক্ত করিয়া ধরিত, সে-যুগ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে।

কিন্তু এখানে বিবাহের ইতিহাস বর্ণনা করিব না। শুধু একবিবাহে স্ত্রী-পুরুষ তাহাদের প্রেম-পিপাসা মিটাইতে পারে কিনা, সেই প্রেমের দ্বারা তাহারা কতখানি শারীরিক, অর্থনীতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে লাভবান হইতে পারে—তাহাই স্বল্প কথায় বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

বিবাহ-নিয়ন্ত্রণে পিতামাতার হাত

বিবাহ-ব্যাপারে 'পরের মুখে ঝাল্ খাওয়া' অর্থাৎ পিতামাতা অথবা অপরের দ্বারা পাত্র বা পাত্রীর মিলন সংঘটন করানো বহুক্ষেত্রে প্রকৃত প্রেম-উপজননের পরিপন্থী, তাহা ইতঃপূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। বিশেষ-ভাবে, যৌবন-বিবাহে ইহার প্রতিক্রিয়া অল্প-বিস্তর অনিষ্টকর না হইয়া যায় না। সেকালের পিতামাতার বোধ হয় প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এমন একটি কন্যাকে পুত্রের জন্য যোগাড় করিয়া দেওয়া, যে শুধু তাহাকে নীরোগ সন্তান উপহার দিবে, শ্বশুর-শ্বশ্রূর যত্নকে জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ব্রত বলিয়া দেখিবে, স্বামীকে বৃহত্তর সাংসারিক ইষ্টের প্রতি

অধিকতর শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিবে, কিন্তু স্বামীকে কোনক্রমে প্রেমের বাঁধনে বাঁধিতে পারিবে না। অনেকটা এইজন্য তখন বাল্য-বিবাহের ছিল এত বাড়াবাড়ি। সেয়ানা হইয়া স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বেশি আসক্ত ও যত্নশীল হইলেই অমনি তাঁহাদের মাথায় পড়িত বজ্রাঘাত।

স্নেহ ও অর্থনীতিক স্বার্থ—দুই তরফ হইতেই তাঁহাদের ঘোরতর আশঙ্কা ছিল। সেই কারণে সংসারের সব ভার চাপাইয়া দেওয়া হইত বাল্যের সেই স্বপ্নবিলাসী সুখাভিলাষী নববধূটির উপর। ঘোম্‌টার শ্বাসরুদ্ধকর ঘেরাটোপে সারাদিন ছুটাছুটি করিয়া মধ্যরাত্রে শ্রান্তকলেবরে সে পাইত স্বামী-শয্যাপার্শ্বে শয়নের ছুটি। পুত্র যে বিবাহ-যাত্রা প্রাক্কালে 'মাতার জন্য দাসী আনিতে যাইতেছে' বলিত, তাহাই অনেক সময় কার্যত ঘটিত। যৌনপ্রেমের জন্য উপযুক্ত পুত্র যদি, বাড়াবাড়ি না করিয়া ও বেহিসাবী না হইয়া, একটি রক্ষিতা পুষিত, তাহা হইলে বহু পিতামাতার বিশেষ আপত্তির কারণ হইত না *। এখনো এ শ্রেণীর পিতামাতা ভারতে অপ্রতুল নয়।

আগে প্রেম—পরে বিবাহ

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে উভয়কে একাধিকবার দেখিয়া অথবা সুষ্ঠুভাবে পরস্পরের পরিচয় লইয়া, তবে বিবাহের কথা চিন্তা করিবে।

* এই প্রসঙ্গে "Good Earth" নামক উপন্যাসের ওয়াং লুঙ্ চরিত্রের কয়টি কথা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সে তাহার ছেলেকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছে, "you have grown fond and too fond of your wife and it is not seemly. It is not meet for a man to love his wife with a foolish and over-weening love as though she were a harlot,"—The **Good Earth** by P. S. Buck. p. 298, (John Day Co., New York).

প্রেমের ফলে বিবাহ স্বাভাবিক, কিন্তু বিবাহের ফলে প্রেম সকল-ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। বাল্য-বিবাহেও সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।··· আজকাল ভাবীপত্নীকে দেখিয়া অথবা তাহার সহিত একটু-আধ্‌টু আলাপ করিয়া যোগ্যতা বিচার করিবার অধিকার কোনো কোন উদারনৈতিক বাঙালী পরিবারে প্রচলিত হইয়াছে বটে; কিন্তু যুবতীদের এ বিষয়ে স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যুগধর্মানুযায়ী উভয় পক্ষ হইতেই একটা সংক্ষিপ্ত, সীমাবদ্ধ ও শালীনতাযুক্ত courtship হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভিন্নগোত্রীয় দূর-আত্মীয় পরিবারে দুইটি যুবক-যুবতীর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ ঘটে অতি সহজে, এবং তাহা বহু ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন যৌন অনুরাগের পরিপোষক হইয়া উঠে। এই দুইটি তরুণ প্রাণের অনুরাগের কথা কাণাকাণি হইয়া যখন উভয় পরিবারের কর্তাদের জ্ঞানগোচর হয়, তখন বিশেষ কোন সামাজিক প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে বিবাহ হইয়া যায়। নতুবা প্রেমিক-প্রেমিকা পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া, ধর্মান্তরিত হইয়া বিবাহ করে, নচেৎ স্বধর্মে থাকিয়া ব্যবহারত স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় বসবাস করিতে থাকে। অর্থ-নৈতিক কারণ অনেক সময় পারিবারিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করার পথে কণ্টকস্বরূপ হইতে পারে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে উভয়েই পাত্রান্তরে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়।···কিন্তু সুখী হয় কি?

বিবাহ-বন্ধনে বিরাগ কেন?

সমাজবিধান-সম্মত ব্রাহ্ম বা প্রাজাপত্য বিবাহের প্রতি একটা আন্তরিক বিরাগ বা বিদ্রোহ-ভাব আধুনিককালের নবজাগ্রত যৌব-

জগতে সুস্পষ্ট দেখা দিয়াছে। পুরাকালেও বহুক্ষেত্রে সমাজের শাসন-দণ্ড বা ভীতিপ্রদর্শন তুচ্ছ করিয়া, প্রেমিক-প্রেমিকা শুধু নবরাগরঞ্জিত দর্পী হৃদয়ের সম্মতিবাণী লইয়াই পরস্পরের গলায় মালা দিত। কাযে-কাযেই সমাজ তখন আপন মান বাঁচাইবার জন্য গান্ধর্ব বিবাহ প্রচলিত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঋষি বাৎস্যায়ন তাঁহার 'কামসূত্র' গ্রন্থে বলিয়াছেন—

ব্যূঢ়ানাং হি বিবাহানামনুরাগঃ ফলং যতঃ।
মধ্যমোঽপি হি সদ্‌যোগো গান্ধর্বস্তেন পূজিতঃ॥
সুখত্বাদবহুক্লেশাদপি চাবরণাদিহ।
অনুরাগাত্মকত্বাচ্চ গান্ধর্বঃ প্রবরোমত।

(৫ম অধ্যায়, শ্লোক ১২-১৩)

—কৃত বিবাহের ফল অনুরাগ। গান্ধর্ববিবাহ স্থায়ীফলপ্রসূ বলিয়া মধ্যম শ্রেণীর হইয়াও, বরণীয়। গান্ধর্ববিবাহ সুখের হেতু; ইহাতে প্রায়শই তত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। ইহাতে বরণ-সম্বিধানও নাই এবং ইহা অনুরাগাত্মক। এইজন্য গান্ধর্ববিবাহ আট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রবর, এইরূপ আচার্যগণ মনে করেন।···

পবিত্র যজ্ঞাগ্নি-সম্মুখে "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনু-চিত্তন্তেঽস্তু"··· (ওগো বধূ! তোমার হৃদয়কে আমার কার্যে নিযুক্ত করিলাম, তুমি একমনে আমার বাক্যের অনুসরণ কর···) ইত্যাদি যে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যুবকগণ কিশোরী বা যুবতীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়, আজীবন সে মন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তারপর, সমাজ বা শাস্ত্র কদাপি ভাবিয়া দেখে না যে, উচ্চারণকারী তাহার অর্থ বুঝিল কিনা, সে উহা সত্যপ্রতীতির

সহিত গ্রহণ করিল কিনা, যে মন্ত্রের বলে তাহারা যুক্তকর হইল তাহা অপ্রেমের কৌশলে বিযুক্ত হইয়া পড়িল কিনা।

আদালতে গিয়া যেমন লোকে হলফ্ পড়িয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে, বিবাহকার্যে তেমনি লোকে অগ্নিসাক্ষ্য করিয়াও কপটপ্রেমিক সাজিতে পারে; পতি পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে পারে, পত্নী পতিকে ছাড়িয়া যাইতে পারে। আইন হয়তো বিপথগামীকে খানিকটা রক্ষা করিতে, অবিচারিতের খানিকটা ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে সমর্থ। কিন্তু পিনাল কোডের মলম—ভাঙা প্রাণ জোড়া লাগাইতে পারে না, বিবাহ-বিরাগীকে ঘোর সংসারানুরাগী করিয়া দিতে পারে না।...

পরস্পরের প্রতি একটা আকর্ষণ ও পূর্বরাগের ভাব লইয়া সুসঙ্কল্প ও স্বাধীনতার পরিবেশে বিবাহ করাই বর্তমানে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সেইজন্য ও-দেশের trial marriage, companionate marriage, civil ও inter-racial marriageএর ধূয়া আমাদের দেশেও ভাসিয়া আসিয়াছে। ব্যষ্টির মন:বুঝিয়া সমাজ ও রাষ্ট্র সম্প্রতি এইগুলিকে আংশিকভাবে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

পণপ্রথা, বর্ণভেদ, জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, স্তরভেদ, ভাষাভেদ, ধর্ম-বিশ্বাসভেদ, অর্থনৈতিকভেদ—বহু মনগড়া ও সৃষ্টিছাড়া ভেদ-বিভেদের জঞ্জাল ভারতীয় বিবাহের মূল উদ্দেশ্য-সাধনের পরিপন্থী হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহ করিয়াই যে অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ তাহার রেশমী জালে আটক থাকিয়া শান্তশিষ্ট ভাবে চিরকাল বসবাস করিতেছে,—সে শুধু দায়িত্বের বোঝায়, সন্তানের মায়ায়, লোকলজ্জার ভয়ে। কিন্তু অনেকেরই অন্তরে বহে বিরক্তি ও নির্বেদের ফল্গুনদী।

বিবাহ-জীবনে বৈচিত্র্যপ্রিয়তা ও অবিশ্বস্ততা

আবার পূর্বরাগ-সঞ্জাত বিবাহেও মানুষ পরস্পরের প্রতি অবিচলিত-ভাবে বিশ্বস্ত থাকিতে পারিতেছে না। সমাজহিতৈষী, দেশের জন্য বহু লাঞ্ছনাভোগী, সুশিক্ষিত, 'পূতচরিত্র' প্রৌঢ়ও গোপনে এক বা একাধিক উপপত্নী রাখিতেছেন; কোনক্রমে ধরা পড়িয়া গেলেও তাঁহার যশঃসূর্য ম্লান হয় না।...উচ্চপদভোগী ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির কয়েক-সন্তানবতী পত্নী, স্বামীর এক দরিদ্র বন্ধুর সহিত গোপন প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন; স্বামী তাহা সন্দেহ করিয়াও কলঙ্কভয়ে চুপ করিয়া রহিয়াছেন।...শিক্ষিত, সুরূপ স্বামী দ্বিপ্রহরে আফিসে গিয়াছেন, আর তাঁহার পত্নী বাতায়ন খুলিয়া পাশের বাড়ীর এক নিষ্কর্মা অর্ধশিক্ষিত যুবকের সহিত স-রাগ দৃষ্টি ও স্মিতহাস্য বিনিময় করিতেছে।...এরূপ দৃশ্য আজকাল বিরল নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাপার ইহাপেক্ষা আরো শোচনীয় বিয়োগান্ত হইয়াও থাকে। মোটকথা, এখনকার স্ত্রী-পুরুষ একবিবাহপন্থী হইয়া বহু বিবাহের অবৈধ আনন্দটুকু আহরণ করিতে সমুৎসুক। একজন ইংরাজ তাই সবিদ্রূপে এই উক্তি করিয়াছেন যে, "we are monogamous people with polygamous offences."

ইহার কারণ কি? এক কথায় ইহার উত্তর—প্রেমে উৎকর্ষের অভাব, প্রেম সম্বন্ধে দারুণ অজ্ঞতা, নচেৎ প্রেমে নূতনত্ব-বিধানের অপারগতা। প্রেমে বহুমুখীনতার কতকগুলি হেতু মনোবিজ্ঞানগত, বাকিগুলি হয় অর্থনীতিক্ বৈষম্যজাত, শিক্ষা ও সঙ্গপ্রভাবগত।...কয়েকদিন মোটর গাড়ী চড়াইয়া বায়োস্কোপ দেখানোর ফলে কোন আমোদপ্রিয়া

দরিদ্র গৃহস্থবধূর মনকে নমনীয় করা বড় বেশি কষ্টসাধ্য নয় —এ কথা অবিশ্বাস করার আর উপায় নাই।...

এরূপ স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা আজ কাল ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে দেখিতেছি, যাহারা প্রেমের দৈহিক উপভোগটুকুকেই আজীবন বড় দেখিতে শিখে, যাহারা আপনাদিগকে অবিশ্বাস করার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত নর বা নারীকেই অবিশ্বাস করে, যাহারা বিবাহের বন্ধনকে ঘৃণা করে—দায়িত্বকে ভয় করে। ইহাদের একদল অবশ্য অবিবাহিতই থাকিয়া যায়,—যদিও পদে পদে অপরযৌনধর্মীর বিভ্রমপূর্ণ প্রেমাভিনয়ের কলুষ বায়ুতে ইহারা শ্বাস না লইয়া থাকিতে পারে না। এবং তজ্জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইহারা চিরকাল ঋণে, আইনে, ব্যাধিতে ও দুর্নামে নিষ্পিষ্ট হইয়া থাকে। এই লোকগুলি অল্পবিস্তর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, অপরিণামদর্শী, ঘোর স্বার্থপরায়ণ,—আমাদের করুণার যোগ্য।

বিবাহের কয়েকটি সুফল

বিবাহ সংস্কারটার মধ্যে এখনো অনেক-কিছু গলদ রহিয়াছে সত্য, কিন্তু যতদিন বিবাহ অপেক্ষা আর কিছু প্রেয় ও শ্রেয় বস্তু না পাওয়া যায়, ততদিন উহার যে-কোন একটা রূপকে আমাদের বরণ করিয়া লইতেই হইবে—আপন স্বার্থের জন্য, বংশধরদের স্বার্থের জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য। বিবাহ যতই তিক্ত হউক, উহাতে নিম-নিষিন্দা-পলতার মতো আয়ু-বৃদ্ধিকর গুণ আছে—বহু মানসিক ক্ষত শুষ্ক করিবার শক্তি নিহিত আছে।

ত্রিশ বৎসরের অবিবাহিত যুবক যদি বাঁচে সাড়ে একত্রিশ বৎসর

পর্যন্ত, সে ক্ষেত্রে ত্রিশ বৎসরের বিবাহিত যুবক বাঁচিবে প্রায় সাঁয়ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত। অবিবাহিত অপেক্ষা বিবাহিত পুরুষ প্রায় ছয় বৎসর বেশি পরমায়ু-ভোগ করে। আবার চিরকুমারী অপেক্ষা বিবাহিতা নারীরা গর্ভে কয়েকটি সন্তান ধারণ করিয়াও গড়্‌পড়তা আট বৎসর বেশি বাঁচিয়া থাকে। ইহা মন-গড়া থিওরি নয়, নানাদেশের সেন্সাস্ রিপোর্টের তথ্য-হিসাব-সমুদ্র-মন্থন-লব্ধ ফল।

বিবাহিত জীবন মানুষকে জীবনের বহু অজ্ঞাত সত্য উপলব্ধি করায়, বহু জটিল প্রশ্নের উত্তর যোগাইয়া দেয়। উহা মানুষকে দায়িত্বশীল, সহনক্ষম, সহৃদয়, অনুকম্পাবান করে। মানুষ অল্পে তুষ্ট, অধর্মে পরাঙ্মুখ, কল্পনায় সীমাবদ্ধ হইতে শিখে। তাহার আহার অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যপ্রদ, বিহার সুলভ, নিদ্রা সুখকর হয়; স্নেহ ও প্রেমের সংস্পর্শে সে বাহিরের অনেক আঘাতের বেদনা ভুলিতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তি ভোগের সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করিতে শিখে—ভালবাসার গণ্ডীকে ছোট হইতে ক্রমশ বড় করিতে পারে। অসুখে পায় সে অকাতর সেবা, দুঃখে পায় সে অতল শান্তি, শোকে পায় সে অমোঘ সান্ত্বনা। বিবাহিত ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত কম অপরাধপ্রবণ ও বিপ্লববাদী হয়; আকাশের চাঁদ ছাড়িয়া তাহারা ধরার মাটি আঁকড়াইয়া স্থিতিশীল ও স্থিরবুদ্ধি হয়*। বহু স্বাধীনতা-কাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রবিপ্লববাদী যুবক বিবাহ করিয়া, তাহাদের ক্ষুদ্র কুটীরের স্নিগ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে স্বাধীনতা-স্বপ্নের সমাধিমন্দির রচনা করিয়াছে।

আবার দেখিবেন, যাহারা বিবাহ-জীবনে মনেপ্রাণে অসুখী, অথচ

* "Family life lends specific gravity which keeps one's spirit earth-bound. Deeply rooted in the soil, man becomes not only more fertile, but also more balanced."—**J. Tenenbaum M. D.**, Op. Cit., p. 163.

সামাজিক বা পারিবারিক কারণে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে না, তাহাদের অনেকেই—বিশেষভাবে স্ত্রীলোকগণ—স্বর্গের স্বপ্নে বিভোর হইয়া পড়েন প্রৌঢ়ত্বের অনেক পূর্বেই। অন্তরে-অন্তরে স্বামীকে অস্পৃশ্য করিতে গিয়া, তাঁহারা বাহিরে নিজেকেই অস্পৃশ্য করিয়া তুলেন। তাঁহাদের আচার-বিচার, গঙ্গাস্নান, গুরুকরণ, শুচিতাবোধ, তীর্থযাত্রা ও পূজার্চনার বাড়াবাড়িতে স্বামী-সমেত পরিবারের ছোটবড় সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে।...

বিবাহ-জীবনে কিভাবে প্রেম অটুট থাকে

যাহা হউক, সাধারণত যে-যে গুণের অভাবে বিবাহ-জীবন বিষময়, প্রেমস্পর্শশূন্য হয়, তাহারই গুটি কয়েক এখানে উল্লেখ করিয়া যাইব। আমাদের দৃঢ়-বিশ্বাস, যদি দুইটি প্রাণ পূর্ব হইতে অন্য কাহারো প্রতি অধিক দিন সংসক্ত না হইয়া, যৌবনে স্বেচ্ছায় বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হয়, তাহা হইলে ওই গুণগুলির অনুশীলন করিলে, তাহারা জীবনে কখনো বীতস্পৃহ, উদাসীন ও বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। এতৎসত্ত্বেও যাহারা মিলিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে বন্ধন ছিন্ন করাই যুক্তিসিদ্ধ। সামাজিক্ বা রাষ্ট্রিক্ বিধি যদি তাহাদিগকে অধিকার দেয়, তাহা হইলে তাহারা পুনরায় বিবাহ করিয়া দেখিতে পারে; কিন্তু না করাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা সমীচীন। অনেকক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার বিবাহ "from the frying pan into the fire"—এই সুপরিচিত ইংরাজী প্রবাদবাক্যের যাথার্থ্যই প্রমাণ করিয়া দেয়।

বিবাহের সর্বপ্রথম ও প্রতীয়মানত সর্বপ্রধান বিচার্য বিষয় হইল যৌন-সম্মিলন। উহাই হইল বিবাহ-সৌধের ভিত্তি-পাষাণ। এই বিষয় লইয়া একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার জন্য পরের অধ্যায়টি পৃথক রাখিয়া দিলাম।

পরস্পরকে জানা ও বুঝার অভাব—অনেক সময় দম্পতির মিলনের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। উভয়ের চরিত্রের কি-কি বৈশিষ্ট্য, কাহার কিসে পছন্দ, কিসে অপছন্দ, কোন বিষয়ে উৎসাহ, কিসে দুর্বলতা, কিসে হর্ষ, কিসে বিরক্তি, সে বিষয়ে কেহই ভাল করিয়া খোঁজ রাখেন না। স্ত্রী কোন্ তরকারি ভালবাসেন, কোন্ পাড়্‌টী পছন্দ করেন, কোন্ আত্মীয়ের প্রতি মনে মনে ঈর্ষাভাব পোষণ করেন, তাহা অনেক স্বামীই যেমন জানেন না; তেমনি স্বামী আফিসে কি কায করেন, কেন তিনি এক-একদিন বিমর্ষ হইয়া বাড়ী ফিরেন, কেন তিনি বাড়ীতে বেশি হট্টগোল পছন্দ করেন না—তাহা অনেক স্ত্রী বুঝিতে চেষ্টা করেন না। এমন কোনো লোকের স্ত্রী আছেন, যাঁহারা স্বামী মাসে কত টাকা উপার্জন করেন, তাহার খবরও সঠিক বলিতে পারেন না। হাত-বাক্সের চাবি থাকে স্বামীর নিকট; তিনি প্রত্যহ সকালে সংসার-খরচের জন্য ১৲, ২৲ বা ৩৲ স্ত্রীর হাতে ফেলিয়া দিয়াই খালাস। স্ত্রী রাখেন না স্বামীর বহির্জগতের মোটামুটি খবর, স্বামী রাখেন না স্ত্রীর গৃহ-জগতের কোন তত্ত্ব; সময় পাইলেও শুনিতে চান্ না। চিরকাল তাঁহারা পরস্পরের নিকট আংশিকভাবে অপরিচিত, অজ্ঞাত ও রহস্যপূর্ণ রহিয়া যান্।...ভিতর-বাহিরের কোন তত্ত্ব বা তথ্য পরস্পরের নিকট গোপন রাখা আদৌ অনুচিত।

ত্যাগশীলতা, সহিষ্ণুতা ও প্রশ্রয়গুণের অভাব বা অতিরিক্ততার জন্যও দাম্পত্য প্রেম অনেক ক্ষেত্রে তিক্ত হইয়া উঠিতে পারে। স্বামী-স্ত্রী অনেক সময় ভুলিয়া যান্ যে, তাঁহারা উভয়েই যুক্ত স্বার্থের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন,—ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত আরামটাই তাঁহাদের নিকট বড় নয়।...স্ত্রী সন্তানকে দুধ খাওয়াইতেছেন, এমন সময়

স্বামী যদি একটা পান্ বা এক গ্লাস জল চাহিয়া না পান্, তাহা হইলে অমনি তাঁহার মেজাজ বিগ্‌ড়াইয়া যায়।...নিজের কাপড় নাই—স্ত্রী স্বামীকে বলিয়া দিলেন এক জোড়া নূতন কাপড় আনিবার জন্য ; সেদিন বৃহস্পতিবার, বিলাতী ডাক পাঠাইবার দিন,—সারাদিন আফিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া তিনি কাপড় কিনিতে ভুলিয়া গেলেন। স্ত্রী রাগ করিয়া সে রাত্রে আর আহার করিলেন না।...

স্বামীস্ত্রীর মধ্যে নিবিড় ভালবাসা জন্মিলেই যে, তাঁহাদের মেজাজ সকল সময় স্থির ও শীতল থাকিবে, এমন কথা নাই। স্বভাবত দুই-জনের মধ্যে একজনের মেজাজ অল্পবিস্তর উগ্র হইতে পারে, অথবা কোন বাহ্যিক কারণে একজনের মেজাজ সাময়িকভাবে উত্তপ্ত থাকিতে পারে ; সেক্ষেত্রে বা সেই সময় অপর পক্ষের উচিত—নিজের মেজাজকে সংযত রাখা। নচেৎ গৃহের শান্তিও নষ্ট হয়, প্রেমও ফিঁকে হইয়া পড়ে। মহাভারতের একস্থলে আছে—

"পরুষাণ্যাপি চোক্তা যা দৃষ্টা ক্রুদ্ধেন চক্ষুষা।
স্বপ্রসন্ন স্বথী ভর্তুর্যানারী সা পতিব্রতা।"

—পতি রাগান্বিত হইয়া কটু কথা কহিলেও যে নারী সহাস্যবদনে তাহা সহ্য করিতে পারেন, তিনিই পতিব্রতা।...পতি সম্বন্ধেও এই কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য।

একখানি পুস্তকে একটি সুন্দর গল্প পড়িয়াছিলাম।...কোনো গৃহে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে সামান্য বিষয় লইয়া প্রায়ই কলহ লাগিয়া থাকিত। গৃহিণী সর্বদা স্বামীর দোষ দেখিতেন। তিনি ক্রমাগত বিবাদে পরাস্ত হইতে থাকায়, অনন্যোপায় হইয়া, পরিশেষে স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য এক ওঝার শরণাপন্ন হইলেন। ওঝা আসিয়া একপাত্র জল

মন্ত্রঃপূত করিয়া দিয়া উপদেশ দিলেন, "তোমার স্বামী আফিস হইতে আসিবামাত্র এই পবিত্র জলের ছোট এক চুমুক গোপনে মুখে দিয়া রাখিবে এবং তিনি হাত-মুখ ধুইয়া বিশ্রাম না করা পর্যন্ত মুখের জল ফেলিবে না। তিনি তোমার প্রতি কোনো কটু কথা বলিলেও কথার জবাব দিতে যাইও না, তাহা হইলে মুখের জল পড়িয়া গিয়া তোমার মহা অকল্যাণ সাধন করিবে। এক সপ্তাহ কাল এইরূপ করিলে তোমার স্বামী নিশ্চয়ই বশীভূত হইবেন।"...ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া স্ত্রীর এইরূপ শান্ত, নিস্তব্ধ ভাব দর্শন করিয়া, স্বামীরও স্বভাবের পরিবর্তন হইল *।

অতিরিক্ত প্রশ্রয়-দানেও অনেক সময় কুফল ফলে। স্ত্রীদের মুক্ত বিচরণের স্বাধীনতা, মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারের আব্‌দার, থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখার বাতিক অনেক সময় স্বামীর আর্থিক ক্ষমতা ও সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। প্রথম হইতে এ বিষয়ে স্বামীদের যেমন স্ত্রীকে মিষ্টভাষে ও সদয় উপদেশে একটু সংযত করিয়া রাখা উচিত, তেমনি স্ত্রীদেরও বুঝা উচিত, তাঁহাদের এই ব্যবহার সংসার ও স্বামী উভয়কেই তাঁহাদিগের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে। অপব্যয়ের প্রতিক্রিয়া স্বামীর জীবিতাবস্থায় বা জীবনান্তে তাঁহাদিগকেই বেশি করিয়া ভোগ করিতে হয়।

পরস্পরের সাহচর্যের অভাব—অনেক ক্ষেত্রে দাম্পত্য সম্বন্ধকে শিথিল ও দুঃসহ করিয়া তুলিতে পারে। কোনো কোনো স্বামীকে নিজের আফিস্, নিজের ব্যবসা, নিজের বন্ধুবান্ধব লইয়া এরূপ মশ্‌গুল থাকিতে দেখা যায় যে, তাঁহারা দিবসরজনীর অধিকাংশ সময় ভুলিয়া থাকেন—গৃহে তাঁহাদের স্ত্রী বলিয়া একটি প্রেমাস্পদ সামগ্রী আছে।

* "গৃহিনীর কর্তব্য"—শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত, (ষষ্ঠ সং, ১৩২০), পৃষ্ঠা ৫৮।

স্ত্রী যখন তাঁহাকে ভালবাসে, এবং তিনি যখন স্ত্রীকে ভালবাসেন, তখন আর চিন্তা কি? স্ত্রী তাঁহাকে ছাড়িয়া পুত্রকন্যা-দাসদাসীপূর্ণ সংসার বুকে করিয়া সুখেই থাকিবে।...কিন্তু ইহা মিথ্যা ধারণা। স্ত্রীর চেয়ে স্বামীর কাযের প্রতি অধিকতর আসক্তি ও তাঁহার প্রতি অনভিপ্রেত উপেক্ষা দেখিয়া নারী মনে মনে ঘোর বিরক্ত হইয়া উঠেন।...শুধু কায আর কায! ভালবাসার আফিসে কি প্রত্যহ কিছু করিবার মতো—বলিবার ও শুনিবার মতো কায নাই?...তদুপরি, স্বামী হয়তো স্ত্রীকে ফেলিয়া মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য বন্ধু-সহযোগে শিকারে, বন-ভোজনে বা দেশভ্রমণে যান। স্ত্রীর আপ্‌শোষের আর অন্ত থাকে না,—খেলার পুতুলের মতো শুধু অনুগত দাসদাসী, ফুট্‌ফুটে ছেলে-মেয়ে দিয়াই কি তাঁহাকে সব সময় ভুলাইয়া রাখা যায়?

স্বামী নিকটে থাকিতেও তাঁহার প্রত্যক্ষ সমাদর ও সাহচর্যের অভাব—তাঁহার মৌন ভালবাসার লীলাভূমিতে উপেক্ষার শীতল আব্‌-হাওয়া, কোনো কোনো আবেগময়ী নারীকে যেমন ম্রিয়মান করে—ক্ষিপ্ত করে, তেমনি হয়তো কোন দুর্বল মুহূর্তে একজন সহানুভূতিশীল স্বামিবন্ধুর প্রতি প্রসন্ন করিয়া দেয়।...প্রসিদ্ধ কথাচিত্রের যাদুকর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু মহাশয় তাঁহার "রমলা" নামক উপন্যাসে এই মনোবৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া এক সুন্দর আখ্যান গড়িয়া তুলিয়াছেন।...

স্বামীর উচিত স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া মাঝে-মাঝে আত্মীয়স্বজনের বাড়ী বেড়াইতে যাওয়া; পয়সার স্বাচ্ছল্য থাকিলে, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, সার্কাস বা প্রদর্শনীতে লইয়া যাওয়া, এবং শত কাযের মধ্যেও একটু ফুর্সৎ করিয়া স্ত্রীর সহিত দুই-চারিটি মিষ্ট কথার বিনিময় করা। স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্যত্র কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হইলে, তাঁহাকে সঙ্গে না

লইবার একটা যুক্তি প্রদর্শন করা ও যাইবার পূর্বে তাঁহার সহিত সুপরামর্শ করা চাই।

আজকাল কলিকাতা শহরে দেখিতে পাই ভদ্রঘরের যুবতী ও মধ্য-বয়স্কা স্ত্রীলোকগণ ট্রামে বা রিক্‌সায় চড়িয়া একাকী, অথবা একটি ছোট ছেলে বা একজন প্রতিবেশিনী সাথে করিয়া, দ্বিপ্রহরে (স্বামী আফিসে যাওয়ার পর) অন্য পাড়ায় কোন আত্মীয়া বা বান্ধবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন; নতুবা সন্ধ্যাকালে পাড়ার কোনো পরিচিত মহিলার সহিত সিনেমা বা সখের থিয়েটার দেখিতে বা যাত্রা শুনিতে যাইতেছেন। চন্দ্রগ্রহণের সময়ও এইভাবে স্বামী ও বাটীর লোকের সহায়তা ব্যতীত বহু মহিলা রাত্রে গঙ্গাস্নানে বাহির হন্। সকলক্ষেত্রে যে তাঁহারা স্বামী বা বাটীর লোকদের এড়াইয়া যান্—তাহা নয়। প্রায় ক্ষেত্রেই স্বামী বা বাটীর লোকদের সময় হয় না; কখনো তাঁহারা আফিসের কাযে ব্যস্ত থাকেন, কখনো বা ক্লাবে-মজলিসে তাস খেলায়—গল্পগাছায় নিমগ্ন থাকেন। কিন্তু ইহাতে যে কত সাংঘাতিক বিপদ ঘটিতে পারে, তাহা অনেকের নিকট অজ্ঞাত।

দৃষ্টান্ত

সম্প্রতি এইরূপ একটি ঘটনার বিষয় গ্রন্থকারের কর্ণগোচর হইয়াছে।... কলিকাতারই দক্ষিণাংশে কোন পাড়ায় একটি প্রৌঢ়া প্রসূতি-ধাত্রী, পার্শ্বের বাড়ীর একজন ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে লইয়া উত্তর কলিকাতার একাধিক চিত্র-গৃহে মাঝে মাঝে বাণীচিত্র দেখিতে আসে। ভদ্র-মহিলার বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশি নয়; গৌরবর্ণা, টানাটানা চোখ, দেখিতে মোটামুটি সুশ্রী। ইঁহাদের সঙ্গে কখনো কখনো যুবতীর মেজ জা'ও আসেন; উঁহার বয়স ২৭।২৮য়ের কম নয়।...

সদর রাস্তার উপর একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকার সুসজ্জিত বৈঠকখানার সম্মুখে, ফুটপথের কোলে, ট্রাম থামিবার স্থান। বৈঠকখানা হইতে এক ৩৫।৩৬ বৎসরের শিক্ষিত সুরূপ যুবাপুরুষ প্রায়ই ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করেন। এক কথায় পরিচয় দিতে গেলে, তিনি Don Juan শ্রেণীর লোক। তাঁহার পাপদৃষ্টি কনিষ্ঠা বধূটির প্রতি পতিত হইল। অচিরে তাঁহার দালাল ধাত্রীটীকে একটু মোটা রকমের পারিতোষিকে বশীভূত করিয়া ফেলিল।...

একদিন ধাত্রী দুই জা'কে লইয়া সিনেমা-প্রদর্শনের পর চিত্রগৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় দ্বিতল হইতে পূর্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী ঐ ভদ্রলোকটি নামিয়া আসিয়া, তাঁহার প্রকাণ্ড মোটর-গাড়ীর অভিমুখে যাইতে যাইতে ইঁহাদের নিকট থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ধাত্রী নমস্কার করিয়া বলিল, "এই যে -বাবু, ভালো আছেন? আপনার স্ত্রী কোথায়—কোলের ছেলেটি ভালো তো?" -বাবু মৃদু হাসিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, সবাই ভালো আছে। আপনি অনেক দিন আমাদের বাড়ী যান্‌নি। বউদির বোধহয় সামনের মাসে ছেলে-পিলে হবে। একদিন যাবেন কিন্তু।...এখন বাড়ী যাচ্ছেন তো? চলুন না আমার গাড়ীতে।"

মেজ জা মৃদুস্বরে ধাত্রীর নিকট ভদ্রলোকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে দু'চারি কথায় তাঁহার পরিচয় দিল, এবং -বাবুকে কহিল, "না, ট্রামেই যাব; পাশের বাড়ীর দু'টি বউ আমার সঙ্গে আছেন।" -বাবু বলিলেন, "তা বেশ তো, ওঁদেরো নিয়ে চলুন না, গলির মোড়ে নামিয়ে দেব'খন। আমি তো ড্রাইভারের সিটে ব'সে গাড়ী চালাব, আপনারা স্বচ্ছন্দে পেছনের সীটে বসে' যেতে পারবেন।"...বধূ দুইজন ইহা অত্যন্ত নির্দোষ

প্রস্তাব মনে করিয়া, ও ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে মনে-মনে আপ্যায়িত হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ধাত্রী সম্মুখের সীটে -বাবুর পার্শ্বে বসিল।

গাড়ীতে সকলে চড়িয়া বসিলে পর, দুরভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তিটি পানের ডিবা খুলিয়া বধূ দুইজনকে পাণ লইতে বলিল। তাঁহারা সলজ্জভাবে উহা গ্রহণ করিলেন; ধাত্রীর পাণ খাওয়া অভ্যাস নাই—সে লইল না। মোটর হুঙ্কার দিয়া কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটের বুক বিদীর্ণ করিয়া দক্ষিণদিকে ছুটিয়া চলিল। পাণে ঈষৎ পরিমাণে সুগন্ধি কিমাম্, মৃগনাভি ও বোধ হয় কয়েক ফোঁটা গঞ্জিকার আরক মিশ্রিত ছিল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই উভয় মহিলাই ঈষৎ নেশাগ্রস্ত হইলেন। সেজবধূর দোক্তা খাওয়া অভ্যাস ছিল, তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ রহিলেন। তথাপি শীতের মধ্যে উভয়েরই ললাটদেশ ঘর্ম-কণিকায় সিক্ত হইয়া উঠিল।

পেট্রল লইবার অছিলায় মোটর লিণ্ডসে স্ট্রীটের দিকে বেঁকিল। তারপর বরাবর ল্যান্স্‌ডাউন রোড্ ধরিয়া, রাসবিহারী এভিনিউ অতিক্রম করিয়া, গাড়ী থামিল লেক্-সন্নিকটস্থ তিমিরাবৃত মুদিয়ালীর মাঠে। গন্তব্যস্থান হইতে অন্যদিকে আনীত হইতেছেন দেখিয়া উভয় বধূই আপত্তির সুর তুলিয়াছিলেন; কিন্তু সুচতুরা ধাত্রী একটা ভূয়া হেতু-বাদ দিয়া তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তারপর ড্রাইভারের আসন হইতে লম্পট -বাবু পশ্চাতের সীটে আসিয়া নিজমূর্তি ধরিলেন। বধূ দুইটি নিজেদের অসহায় অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, অথচ সাহায্যের জন্য চেঁচামেচি করিতে সাহস করিলেন না। তাহা হইলে, এই মিথ্যা-কলঙ্ক-কাহিনী পুলিসে জানিবে, বাড়ী পৌছিবে, পাড়াময় রাষ্ট্র হইবে। সুতরাং তাঁহাদিগকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নীরবে সব হজম করিতে হইল।...

একের উপর অন্যের আধিপত্যের প্রয়াস—অনেক সময় বিবাহ-জীবনকে অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তুল্য-মূল্য। স্বীয় কর্মগণ্ডীর মধ্যে উভয়েই প্রধান, এবং পরস্পর পরস্পরের সুখ-শান্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য পরস্পরের মুখাপেক্ষী,—এই কথাটি ভুলিলে চলিবে না। আমরা দুইজন আমরণ অচ্ছেদ্য বন্ধু, প্রীতিডোরে বাঁধা জীবনসঙ্গী,—এ বিশ্বাসকে দম্পতি যেন কখনো শ্লথ-মূল না করেন। সংসারই সাম্যনীতি প্রদর্শনের উপযুক্ত স্থান,—একথা যেন মনে থাকে। একের বিপদে অন্যের অংশ গ্রহণ, একের সুখ অন্যকে বণ্টন, উভয়েরই এক লক্ষ্য অথবা অন্যের লক্ষ্যের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি, জীবনের নানা সমস্যার প্রতি উভয়েরই একপ্রকার মতবাদ-পোষণ ও দৃষ্টিপাতের ক্ষমতা—এইগুলি প্রেমকে পূর্ণতা ও স্থায়িত্ব দিতে পারে।

কর্মিষ্ঠতা, উদারতা, মিতব্যয়িতা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, বুদ্ধি-কৌশল ও রোমান্সের অভাব—এইগুলিও প্রেম-বিকাশের পরিপন্থী।

অলসতা, শক্তি থাকিতেও কার্যে গাফিলতি—কোন প্রেমিকই পছন্দ করেন না। স্ত্রী অসুস্থ, দ্বিপ্রহর রাত্রে স্বামী জাগিয়া বলিলেন 'ওগো, একগ্লাস জল গড়িয়ে দাও তো!' ইহা অন্যায়।...বন্ধু আসিয়াছেন, চাকর বাজারে গিয়াছে, স্বামী বলিলেন, 'এক কাপ্ চা ক'রে দাও'; স্ত্রী শুইয়া মাসিকপত্র পড়িতেছিলেন—পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদিলেন। ইহাও অন্যায়।...স্বামী চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া বাড়ী বসিয়া ল্যাজ নাড়েন, পাড়ায় সার্বজনীন পূজার পাণ্ডা হন্, নচেৎ ক্লাবে গিয়া গলা সাধেন। স্ত্রী বলিলেন, 'আমার হাতের চুড়ি ক'গাছা বেচে একটা ছোটোখাটো দোকান কর না। দু'পয়সা জম্‌লে আবার তখন দু-দু'সেট্ চুড়ি গড়িয়ে

নেব।' স্বামী সে কথায় কর্ণপাত করেন না। এদিকে মুদির তাগাদা, বাড়ীভাড়ার নালিশ, দুগ্ধবঞ্চিত শিশুদের কান্না!...

অমিতব্যয়িতা ও সাধ-করিয়া-টানিয়া-আনা দারিদ্র্য সম্বন্ধে বোধ হয় বিশেষ কিছু না বলিলেও চলিবে। অগ্নিপুরাণ অমিতব্যয়িনী ভার্যাকে পরিত্যাগ করার পর্যন্ত উপদেশ দিয়াছেন। অমিতব্যয়ী স্বামীরো স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, স্ত্রীপুত্রদের ষোলোআনা সুখের ব্যবস্থা ও কিছু ভবিষ্যতের সঞ্চয় করিয়া, তবে তিনি ইচ্ছামতো দুইহাতে খরচ করিবার অধিকারী।

স্ত্রী অশিক্ষিতা হইলেও তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করা বা তাঁহার বুদ্ধি-হীনতাকে সকলের (বিশেষভাবে ঝি-চাকর ও আপন শিশুদিগের) সমক্ষে বিদ্রূপ করা উচিত নয়। স্বামীর যদি স্ত্রী-শিক্ষার দিকে ঝোঁক্ থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সন্তোষ-বিধানার্থ স্ত্রীর উচিত লেখাপড়ার দিকে মন দেওয়া, নচেৎ তাঁহার প্রিয় শিক্ষা-বিষয় লইয়া মোটামুটি আলোচনা করা, তাহার লেখাপড়ার কার্যে অবসরমতো সাহায্য করা, অন্ততঃপক্ষে তাঁহার লাইব্রেরি ঘরখানিও প্রত্যহ নিজের হাতে ঝাড়পোঁছ্ করা।...স্বামী যদি ভোজনবিলাসী হন্, বাটীতে পাচক বা বাবুর্চি থাকা সত্ত্বেও নিজের হাতে প্রত্যহ একটি তরকারিও প্রস্তুত করা আবশ্যক।

প্রেম যেখানে পূর্ণ, বিশ্বাসকে সেখানে খাটো করিলে চলে না। সন্দিগ্ধচিত্ততা অনেক সময় অভিমান-বশে ভালোকে খারাপের দিকে যাইবার প্রবৃত্তি দেয়। ঈর্ষান্বিত কুচক্রীর প্ররোচনা, পরের লাগানি-ভাঙানি,—অনেক সময় প্রেমিকের বিশ্বাসকে শিথিল করিয়া দেয়, শান্তিনীড়ে তুষের আগুন জ্বালাইয়া দেয়। সাবধান!...স্মরণ রাখিবেন,

চরিত্র বিষয়ে একপক্ষ যখন ক্রমাগত বিশ্বাস ভাঙিয়া চলেন, তখন অপর পক্ষ গোপনে সেই বিশ্বাসভঙ্গের প্রতিশোধ দিতে সচেষ্ট থাকেন, নচেৎ প্রকাশ্যে একদিন একটা নাটকীয় বিদ্রোহ বাধাইয়া বসেন। অভিজাত লম্পটদের পর্দানশীন্ পত্নীগণ অনেক সময় বাটীর নিম্নতন কর্মচারীদের সহিত গুপ্তপ্রণয়ে লিপ্ত হন্—দেখা যায়। বহু ক্ষেত্রেই ইহা সম্ভব হয় দুরতিক্রম্য কামাবেগ-বশত নয়, অবিশ্বস্ত স্বামীর হৃদয়হীন তাচ্ছিল্যের বৈরশুদ্ধি-মানসে।

বিবাহের প্রাক্কালে পরস্পরের প্রতি যে আবেগমাখা আবেশমধুর উচ্চ ধারণা থাকে, তাহা যেন সারা-জীবন নষ্ট না হয়। সে যেন একটা সর্বদুঃখ-ভোলানো, হৃদয়-দোলানো মাদকতামাখা চিরন্তন স্বপ্ন—বাস্তবের মধ্যেও কল্পনারঙিন্ অচ্ছোদ কুয়াসা। বেশভূষার যৎকিঞ্চিৎ পারিপাট্য, নিত্যপ্রসাধন, নিয়মিত ক্ষৌরকার্য, ব্যক্তিগত ও গৃহগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুমিষ্ট ব্যবহার, সরস রহস্যালাপ, প্রবাসে আসিয়া প্রেমপূর্ণ পত্রের আদান-প্রদান—যেন বার্ধক্য পর্যন্ত সমানটানে চলে।···দুই-একটি সন্তান জন্মানোর পর বাঙালী-ঘরের স্বামী-স্ত্রী একেবারে যেন ত্রিকালজ্ঞ হাড়-পাকা 'কর্তাগিন্নী' বনিয়া যান্। ছিন্ন-মলিন সাড়ী আর খোঁচা-খোঁচা দাড়ির মধ্যে দিনরাত চলে গম্ভীর মুখে কেবল সংসারের হিসাব-নিকাশ, কুটুম-বাড়ীর তত্ত্ব, খোকার পড়াশুনার আলোচনা, তুচ্ছ বিষয়ে কথা-কাটাকাটি!···যৌবনের রোমান্স্‌কে এমনিভাবে আমরা টুঁটি টিপিয়া যেন না মারি!

—০—

=একাদশ পটল=

যৌন-সম্মিলন

কান্তপ্রেমের এক অবিচ্ছেদ্য উপকরণ ও বরণীয় পরিণতি—যৌন-সম্মিলন। যৌবন আসিলেই বা বিবাহ হইলেই এই ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষ আপনা-আপনি পারদর্শী হইয়া উঠে,—একথাটা কখনই সুধী-সমাজে স্বীকৃত হয় নাই, এখনো শিক্ষিত-মহলে স্বীকৃত হইতেছে না। জলে নামিলেই সাঁতার শেখা যায় না, মাঝির ছেলে হইলেই অবলীলাক্রমে দাঁড় টানিতে পারে না, বন্দুক ধরিতে পারিলেই পশুপক্ষী শিকারে সমর্থ হওয়া যায় না। প্রত্যেক কাজেরই শিক্ষা-প্রণালী আছে, কৌশল আছে, অভ্যাসযোগ আছে,—আর যৌন-সম্মিলনের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় কি কিছু নাই? কতখানি শিক্ষার বস্তু আছে, তাহার সুন্দর আভাস পাওয়া যায় সেকালের "কামসূত্র", "অনঙ্গরঙ্গ", "Ars Amarandi", "Rose Garden of Persia", অথবা একালের "Psychology of Sex" (Havelock Ellis), "Ideal Marriage" (Th. H. Van deVelde), "Happiness in Marriage" (Miss Margaret Sanger), "Sex Factor in Marriage" (Helena Wright) "Marriage Manual" (Drs. Hannah & Abraham Stone) প্রভৃতি শত শত গ্রন্থ হইতে।

আহার-কৌশলটা আমরা প্রকৃতি মায়ের দৌলতে জন্মক্ষণ হইতে

শিখিয়া আসি ; কিন্তু তাই বলিয়া কি "খাদ্যবিজ্ঞান" আমাদের আহার সম্বন্ধে স্বাস্থ্যোন্নতিকর নূতন নূতন জ্ঞানের বারাসত খুলিয়া দেয় নাই ? বিহার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই প্রয়োগ করা চলে। উহা একাধারে কলা ও বিজ্ঞান। দেহতত্ত্বের দিক্ দিয়া, জীবতত্ত্বের দিক্ দিয়া উহাকে অধ্যয়ন করিতেই হইবে। কারণ, জীবনের বারো-আনা সুখই যে ইহার মধ্যে নিহিত। প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক তৃপ্তিকর যৌন-অভিজ্ঞতা হইতেই তাহাদের ভালবাসার ভিত্তিমূল স্থায়ীভাবে গঠিত হয়,—এ কথা কোন্ সত্যদ্রষ্টা অস্বীকার করিতে পারে * ?

বিবাহ-জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব হইতে এ সম্বন্ধে প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষের একটা সুস্পষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত বিদ্যা অধিগত করিয়া লওয়া উচিত। এই বিশ্বাসে বলীয়ান্ হইয়া তাঁহাদিগকে জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে যে, নিয়মানুগভাবে যৌন-আকাঙ্ক্ষা ও তাহার প্রীণনের মূলে কোন লজ্জা ও অপরাধের ভাব বিজড়িত নাই—আছে বিশ্ব-প্রকৃতির স্থিতিবিধানের মহদুদ্দেশ্যে সহায়তা-দানের স্পৃহা, আর আছে প্রেমকে আনন্দঘন ও অবিনশ্বর করিবার একটা সুনির্দিষ্ট প্রয়াস।

রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাস

বিবাহের পর প্রেমের অন্যান্য দাবি মিটাইয়া ও উপকরণগুলি হাতের কাছে পাইয়াও স্বামীস্ত্রী পরস্পরের সহিত পরিপূর্ণভাবে মিলিত হইতে পারে না শুধু যৌনসম্মিলনে অজ্ঞতা, উদাসীনতা বা অতিসঙ্কোচের

* "Mutully satisfactory sex experiences, more than any other one thing, create an enduring attachment between a husband and a wife."—The **Possibilities of Modern Marriage** by H. M. Grant in 'Marriage Hygiene', Vol. II. No. 3. p. 315.

বশে। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা প্রেমের এই বস্তুতান্ত্রিক্ দিক্‌টির প্রতি রীতিমতো সজাগ্ হইয়াও বিবাহ-জীবনে প্রবেশ করিয়াই একেবারে 'ভালমানুষটি' হইয়া পড়ে, অর্থাৎ যৌন-সম্মিলনে আগ্রহ প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয়।...সত্যকার প্রেমে যৌন-সম্মিলনের স্থান নাই, উহা পশুধর্ম মাত্র,—এইরূপ একটা প্রতীতি বহু সুশিক্ষাপ্রাপ্তা বিবাহিতা কন্যার মনেই নীড় রচনা করিয়া থাকে।

বিবাহিতা কন্যার কথাই বা বলি কেন, বিবাহিত পুরুষ—যাহারা বিবাহের পূর্বে বহু বালিকার সহিত অবৈধ মিলনের সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও স্ত্রীকে আন্তরিক ভালবাসিয়া, যৌনসংযোগ-স্পৃহা প্রাণ-পণে দমন করিয়া রাখে। তাহারা মনে করে যে, সতী-সাধ্বী স্ত্রী হইলেই সে হইবে 'হীন' কামভাব-বর্জিতা, তাহার উপসর্পণকে হয়তো সে মনে মনে করিবে ঘৃণা, নতুবা তাহার বহুদর্শিতালব্ধ দুষ্প্রসাদ যৌনাবেগের সে কোন-মতেই সমকক্ষতা করিতে পারিবে না।...

এমন কি, কোনো কোনো অতিশয় যৌন-বেগবান অবুঝ পুরুষ বিবাহিত স্ত্রীকে আধাত্মিকভাবে ভালবাসিয়া ও তাঁহার স্বাভাবিক আসঙ্গ-লিপ্সাকে প্রায় অপূর্ণ রাখিয়াই, চিরকাল অন্য স্ত্রীলোককে কাম-চরিতার্থ-তার কার্যে নিযুক্ত রাখেন *। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের সংখ্যা আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও একেবারে নামমাত্র বলা চলে না।...

নরনারীর নিকট রতিক্রিয়ার বিশিষ্ট মূল্য

কোনো কোনো ভদ্র-রমণী ঘটনাচক্রে পড়িয়া স্বেচ্ছায় দেহদান করিয়াও যে হৃদয়-দান করেন না, অথবা আজন্ম প্রাণঢালা প্রেমের সুধা

* Vide **The Sexual Question** by August Forel, Tr. by C. F. Marshall, 1928. p. 91.

সিঞ্চন করিয়া দেহ-দানটা বাকি রাখিয়া দেন,—তাহা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, তারপর আরো ভালোভাবে করেন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র।

রূপ ও যৌবন দেখিয়া পুরুষলোক শুধু যৌবনকালে কেন, বৃদ্ধ বয়সেও নারীর দেহকে আকাঙ্ক্ষা করে, এবং অনেক সময় দূর হইতে এক ঝলক্ দেখিয়াই। কিন্তু রূপ ও যৌবন দেখিয়া নারী চিরদিনই চায় পুরাপুরি মানুষটাকে, এবং প্রায় ক্ষেত্রেই একাধিকবার তাহার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া। বহু নরের ভালবাসার পরিণতি হয় যৌন-সম্মিলনে, বহু নারীর ভালবাসার সূত্রপাত হয় দেহদানে,—প্রেমিকের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের প্রথম বাস্তব প্রমাণ সে দেয় ইহার মধ্য দিয়া। পুরুষ ইহার মধ্যে পায় তাহার প্রেমের সর্বার্থসাধক—তাহার সাধনার শেষ সোপান; নারী যৌনসংযোগ ছাড়া ও উহার পরেও অনেক কিছু দিতে চায়—পাইতে চায়। পুরুষ যুগযুগান্ত ধরিয়া নারীর দেহ লইয়া sport করিয়াছে; এই নারী জাগরণের যুগে তাহারই প্রতিশোধাত্মক প্রতিবিম্ব চারিদিকে ঝলসিয়া উঠিয়াছে। ইহা কিন্তু তাহার সত্য শাশ্বত মূর্তি নয়।

যৌবন-প্রেমের প্রথম উদ্দিষ্ট

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিবাহের পূর্বে বা পরে, কৈশোরে বা যৌবনে প্রেম সম্বন্ধে একটা ভাবগত অস্ফুট ধারণা জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই অধিকাংশ নর যৌন-অভিজ্ঞতার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে; তখন প্রেমের প্রধান ও প্রথম উদ্দিষ্ট হয় যৌন-সম্মিলন। কিশোরী বা যুবতী নারী যাহারা বস্তুগতভাবে রমণ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই লাভ করে নাই, তাহারা কিন্তু ব্যগ্র

হয় মনোমতো পুরুষকে কাছে টানিয়া আনিবার, তাহার অভিনব স্পর্শসুখ অনুভব করিবার, বড় জোর তাহার চুম্বনালিঙ্গনে তৃপ্ত হইবার। মূল যৌনসম্মিলন সম্বন্ধে তাহাদের ভাবগত ধারণা থাকিলেও তজ্জন্য তাহারা গোড়াগুড়ি হইতে ব্যস্ত হইয়া উঠে না। এমন কি, সদ্য-বিবাহের পর স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিয়াও সে প্রথম প্রথম উহা নিবিড়ভাবে কামনা করে না, বরং তৎসম্বন্ধে একটা শঙ্কা ও লজ্জামিশ্রিত ক্ষীণ কৌতূহল পোষণ করে মাত্র।

যৌন-পূজার প্রথম অঞ্জলি

প্রেমিক বা পতি যখন উপযাচক হইয়া নিজের তাগিদে প্রথম রতি-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, তখন সে তাহাতে বিরক্ত বা ব্যথিত হইতে পারে,—বিশেষভাবে সতীচ্ছদ ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় তাহার যোনিনালী অল্পবিস্তর আহত হয়। পতি (বা প্রেমিক) প্রথম অভিমর্ষণের পূর্বে যথোপযুক্ত মিষ্ট বচনে ও মনোহর উপহার দ্বারা যদি পত্নীর (বা প্রেমিকার) বিশ্বাস উৎপাদন না করিয়া এবং প্রগাঢ় চুম্বনালিঙ্গনে তাহাকে রীতিমতো উত্তপ্ত না করিয়া, অবিবেচকের ন্যায় আচম্বিত বল প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া রমণী-জীবনে বহুদূর-প্রসারী হইতে পারে।

উহার ফলে প্রেমিকপ্রবর সঙ্গে-সঙ্গেই বরখাস্ত হইতে পারেন।... পতিপ্রবর নব-পরিণীতা স্ত্রীকে কিছুকাল বিদ্রোহী ও কয়েক বৎসর যাবৎ উহার কথায় ও ব্যবহারে এক-একটা আকস্মিক্ বেদনা-দানের প্রবৃত্তি উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে—দেখিতে পাইবেন। তারপর, স্ত্রীর যৌনবোধ যখন স্বাভাবিক স্ফুরণ-প্রণালী চিনিয়া লয়, তখন সে সময়ে-অসময়ে সুরত-ব্যাপারে অগ্রণী হইয়া, এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীকে উত্যক্ত

করিয়া, তাঁহার মধুযামিনীর সেই বিস্মৃত নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ লইতে দ্বিধা করে না।

নর-নারীর যৌন ক্ষুধা ও তাহা মিটাইবার রীতি-পদ্ধতি একরূপ নয়; বরং স্থান-কাল-পাত্রভেদে তাহা এত বিচিত্র হয় যে, একটা সর্বজনগ্রাহ্য নিয়মসূত্র রচনা করা কঠিন। এই সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্বে একখানি গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি ও বহু চিত্তাকর্ষক উদাহরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি *। এক্ষণে যৌন-সম্মিলন সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণকে সাধারণভাবে কয়টি উপদেশ দিয়া, গ্রন্থের উপর যবনিকা টানিয়া দিব।

সুপ্রতিষ্ঠিত প্রেমে আসঙ্গ-লিপ্সা

প্রেম যত নিবিড়তা বা গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়—বয়স যত বাড়িয়া চলে, যৌনসম্মিলনের চাহিদা তত পশ্চাদ্‌ভূমে সরিয়া যায় সত্য; কিন্তু একেবারে দূরীভূত হয় না। সংসারের ঝঞ্ঝাট্, অর্থচিন্তা, মানসিক অশান্তি, সন্তানদের কঠিন রোগ, সুযোগের অভাব, স্ত্রীর জরায়ুঘটিত ব্যাধি, পুরুষের যৌনযন্ত্রের ক্রমহ্রস্বমান উত্থানশক্তি প্রভৃতি কারণ হয়তো অধিক-বয়স্কা স্বামী-স্ত্রীর যৌনসম্মিলনের পথে স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারে; তথাপি কাহারো যৌনবেগ শুকাইয়া যায় না। তদুপরি, একপক্ষের আকাঙ্ক্ষা যতখানি কমিয়া আসে, অন্যপক্ষের ততখানি হয়তো না-ও কমিতে পারে। রমণীর অধিক সংখ্যক্ সন্তান হইলে কামাবেগ অত্যন্ত হ্রাস পায়,—একথা বহুদর্শনসিদ্ধ সত্য নহে।

সাধারণত রমণীর পঞ্চাশ ও পুরুষের ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত যৌন-উপভোগের স্পৃহা স্পষ্ট থাকিতে দেখা যায়। ষাট বৎসর বয়সের বৃদ্ধ

* "নরনারীর যৌনবোধ"—শ্রী নৃ. কৃ. ব. ও শ্রীমতী আরাধনা দেবী; মূল্য ২৲।

পুনরায় এক যুবতীকে বিবাহ করিয়া, তাহাকে নিয়মিত সুরত-রসে অভিষিক্ত করিতেছেন,—এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে একেবারে বিরল নহে। ইঁহাদের দুই-একটি সন্তানও হয়,—যদিও গর্ভোৎপাদন-ক্ষমতার সহিত সহবাস-শক্তির কোন নিকটসম্পর্ক নাই। আমাদের দেশে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির (এমন কি, ডিগ্রীধারী ডাক্তারেরও) বদ্ধমূল ধারণা যে, যে-লোক যত অধিক সন্তানের জন্ম দিয়াছে, সে সুরতকার্যে তদনুপাতে পারদর্শী। এ ধারণা যেমন ভ্রমাত্মক, তেমনি মারাত্মক।

রমণ-ক্ষমতা ও সন্তান-জনন

সচরাচর মানুষের শুক্রে চৌদ্দ-পনেরো বৎসর হইতে সত্তর-বাহাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত তাজা শুক্রকীট থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং কোন বৃদ্ধ সম্বৎসরের মধ্যে একবার উত্তেজিত হইয়া কোনমতে তাঁহার চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর বা তদপেক্ষা অল্পবয়স্কা স্ত্রীর সহিত অর্ধ মিনিটকাল সংযোগ-সাধন করিয়া, তাঁহার যোনিনালী-মধ্যে শুক্রক্ষরণ করিলে, তৎফলে গর্ভসঞ্চার হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। অর্ধোত্থিত লিঙ্গ-দ্বারা যোনিনালীর দ্বারপ্রান্তে শুক্রক্ষেপ করিলেও তন্মধ্য হইতে শুক্রকীটসমূহ পুচ্ছ সহযোগে নড়িয়া-নড়িয়া গর্ভমুখ-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

যে-কোনো সুস্থ পুরুষের বহির্নিক্ষিপ্ত বীর্য হইতে কণামাত্র প্লাটিনাম-নির্মিত তারের মাথায় লাগাইয়া লইয়া, উহা কোনো বয়ঃপ্রাপ্তা নির্ব্যাধি রমণীর গর্ভগ্রীবায় ঘষিয়া দিলেও গর্ভসঞ্চারের দশ আনা সম্ভাবনা থাকে। এই উপায়ে কৃত্রিম গর্ভসঞ্চারের ব্যাপক পরীক্ষণ চলিতেছে, এবং জীববিজ্ঞান সত্য সত্যই 'test tube

babies' সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে *। শুধু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্ত্রীলোকের ঋতুসংহার হইয়া গেলে, কোনভাবেই গর্ভসঞ্চারের আর সম্ভাবনা থাকে না। আর একটি সত্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যাই; তাহা এই যে, সুস্থ স্ত্রী-পুরুষে যত কম বার সহবাস করে, সাধারণত তাহাদের সন্তানোৎপত্তির সম্ভাবনা তত অধিক হয়।

কামপরায়ণ বেশি কে—স্ত্রী না পুরুষ?

গড়্‌পড়তা কষিয়া, স্ত্রীলোকগণকে না পুরুষগণকে অধিকতর কাম-পরায়ণ দেখা যায়—এই প্রশ্নের উত্তর বাহির করা একটু কঠিন; কারণ স্ত্রী ও পুরুষ একরূপ আবেষ্টনী, কর্মক্ষেত্র, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা, সামাজিক সুবিধা, শিক্ষা ও বাহ্যপ্রভাব কখনো ভোগ করিতে পারে না। যদি পারিত, তাহা হইলে তাহারা গড়্‌পড়তা পুরুষ অপেক্ষা যৌনজীবনে অধিকতর আবেগময়ী ও সচেষ্ট হইয়া উঠিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহারা আত্মপ্রস্ফুরণের স্বাধীনতা যুগযুগান্ত হইতে অতি অল্প পাইয়াছে এবং তাহাদের যৌনাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি পুরুষের মর্জি ও শক্তির উপর চিরকাল নির্ভর করিয়াছে। এই কারণে, বংশানুক্রমিকভাবে তাহারা উহা দমন করিতে, বিলম্বিত করিতে, চিন্তা-বিলাস ও কার্যান্তরের মধ্যে বিস্রস্ত করিয়া দিতে শিক্ষা করিয়াছে। তদুপরি, তাহাদিগকে গর্ভধারণের

* (1) "Artificial Insemination" (Herbert Brewer) in **Marriage Hygiene**, Vol. II, No 4.; (2) "Eugenics in Practice: Cross Artificial Insemination" (F. I. Seymour), Ibid., Vol III, No. 1.; (3) **Human Sterility** by R. Meaker (1934) p. 254; (4) **La Fecundation Artificielle dans L'Espece Human Gynecologie et Obst.** (XV, 2.) by A. A. Schorohowa. 1927.

দুঃখ ও তৎকালীন রতি-বিরতি সহিতে হয় বলিয়াই সৃষ্টিকর্তা সহবাস-কার্যে তাহাদিগকে বৃহত্তর সুখানুভূতি অর্জন করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন।

রমণীর কামকেন্দ্রের ব্যাপকতা

আর একটা কথা। রমণীর কামকেন্দ্র শুধু যোনিনালীর মধ্যে নয়, প্রায় তাহার সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া আছে; বিশেষভাবে, তাহার ওষ্ঠে, গণ্ডে, স্তনবৃন্তে ও ভগাঙ্কুরে। কাযেকাযেই প্রেমিকের পুনঃপুন গাঢ় আলিঙ্গন বা দৃঢ় চুম্বনেই কোনো কোনো সূক্ষ্মানুভূতিময়ী রমণী সহবাসানুরূপ হর্ষ পাইতে পারে।...কোনো বহুদর্শী প্রেমিক হয়তো লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন,—কোনো যুবতী ভাবে-ভঙ্গীতে-আলাপে-আলোচনায় কয়দিন তাঁহার উপসর্পনের যোগ্য উত্তর দিয়া তাঁহাকে সাহসী করিয়া তুলিল, শেষে একদিন নিভৃতে প্রেমালাপ-প্রসঙ্গে কয়েকটি উত্তপ্ত চুম্বন-দানের পর সে অধিক দূর অগ্রসর না হইতে দিয়াই তাঁহাকে ঠেলিয়া দিয়া পলাইয়া গেল।...ইহার চারিটি কারণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। প্রথমত, সে বোধ হয় সহবাস ব্যাপারে পরিপক্কা নয়; দ্বিতীয়ত, কয়েকটি চুম্বনেই সে তদনুকল্প আনন্দ লাভ করিয়াছে; তৃতীয়ত, সে তাহাকে আরো ক্ষিপ্ত ও প্রতীক্ষমান করিয়া তুলিয়া তবে মূল ব্যাপারে স্বাধীনতা দিতে চাহিয়াছিল; চতুর্থত, সহবাসের সম্ভবনীয় পরিণাম (গর্ভসঞ্চার) সম্বন্ধে তাহার সুবুদ্ধি জাগ্রত থাকায় উহাকে সে সত্য-সত্যই এড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছিল।.....

এইবার মূল সহবাস-ক্রিয়া সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য বিবৃত করিব। এই ব্যাপারটিকে বৈজ্ঞানিকগণ তিনটি ক্রম বা পারম্পরিক অবস্থায় বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—আদ্য (পূর্বরাগ), মধ্য (রত্যারম্ভ) ও অন্ত (রত্যবসান)।

আদ্যক্রম—পূর্বরাগ

আদ্য অবস্থায় অপর পক্ষের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে তাহাকে কায়িকভাবে উপভোগের ইচ্ছা জাগে। কোনো চিত্র দেখিয়া, পুস্তক পাঠ করিয়া, পূর্বস্মৃতি মনে আনিয়া, বিস্রম্ভালাপ-রত প্রেমিকমিথুন বা জীবজন্তুর সঙ্গম-দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া, সহবাসের আকাঙ্ক্ষা জাগা কিছু আশ্চর্য নয়। অপর পক্ষ কাছে না থাকিলে, নানা ছলে বা কৌশলে তাহাকে নিকটে টানিয়া আনা অথবা নিজে তাহার নিকটে গমন করা এবং তাহাকে সহবাসের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলা আদ্য অবস্থার এলাকাভুক্ত।

পূর্বরাগযুক্তা রমণী কতকগুলি উন্মাদনা-জনক লীলাবিভ্রম প্রদর্শন করিতে পারে; যথা—বক্ষের বসন উন্মুক্ত করা, মুখের কাছে মুখ আনিয়া শিশুর ন্যায় বাজে ও প্রায়শ প্রেম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করা, গায়ে সুড়সুড়ি দেওয়া, আঙ্গুল মটকাইয়া দেওয়া বা চুলের ভিতর হস্ত চালনা করা, বক্ষের উপর স্তনদ্বয় ন্যস্ত করা…ইত্যাদি। এই সকল প্রক্রিয়া রাগোন্মুখ পুরুষকে পূর্ণজাগ্রত করার পক্ষে যথেষ্ট। মহাজনদিগের উপদেশ,—এই সময় পুরুষ সুড়সুড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া মৃদু মৃদু চুম্বন, আলিঙ্গন, চোষণ, দংশনাদি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবে এবং নারী তাহার আংশিক উত্তর দিতেছে কিনা লক্ষ্য করিবে।

চুম্বনের স্থান

মুনি বাৎস্যায়ন আলিঙ্গন, দংশন, চুম্বন প্রভৃতির বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও তাহাদের পরিভাষা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। চুম্বন কয় প্রকার ও শরীরের কোন্ কোন্ অংশে তাহা প্রযোজ্য, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া বলিতেছেন—ললাট, অলক, কপোল, নয়ন, বক্ষ, স্তন, ওষ্ঠ,

জিহ্বা—এই আট্‌টি স্থলে চুম্বনদান প্রশস্ত। উরুসন্ধি, বাহুমূল ও নাভি-মূলদেশে (টীকাকার 'বরাঙ্গ' বলিয়া ইহার অর্থ করিয়াছেন) লাট্ নামক জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে*। চুম্বন, দংশন, চোষণ প্রভৃতি প্রেমোপচর্যা আমরা শৈশবে স্তন্যপান ও স্নেহদানের মধ্য দিয়া নির্দোষভাবে শিক্ষা করিয়া আসি। বাল্যে প্রিয়জনদের নিকট হইতে যাহা আমরা পাই, যৌবনে প্রেমভাজনদের সহিত তাহারই আদান-প্রদান করিতে চাই। চুম্বনাদি পাইতে রমণীগণই বেশি ভালবাসে, কেন না শৈশবে তাহাদের ভাগ্যে স্নেহচুম্বন জোটে পুরুষশিশুর তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প। যাহা তাহারা পায় অল্প, তাহা দেয়ও অল্প।

একপক্ষের ঘোরতর অনিচ্ছা থাকিলে অথবা তিনি অতিশয় ক্লান্ত, নিদ্রিত বা পীড়িত থাকিলে, অন্যপক্ষের ইচ্ছা দমন করাই সঙ্গত। সুস্থ ও জাগ্রতাবস্থায় একপক্ষ উদাসীনতা বা অগভীর অনিচ্ছা প্রদর্শন করিলে, উপচর্যা দ্বারা তাহাকে সম্মত ও উদ্দীপিত করা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। রমণীগণ অনেক সময় ইচ্ছা থাকিলেও অনিচ্ছার ভান্ দেখান্—মৌখিক 'না-না' বলেন—শুধু পুরুষের মন বুঝিবার বা তাহাকে অধিকতর আগ্রহান্বিত করিবার নিমিত্ত। কিন্তু চতুর প্রেমিকের নিকট তাঁহাদের সে ছদ্মবেশ অবিলম্বে ধরা পড়িয়া যায়।

মধ্যক্রম—রত্যারম্ভ

কিছুক্ষণ উপচর্যার পর মধ্যাবস্থায় আসিতে হয়, অর্থাৎ রত্যারম্ভ করা উচিত। ইহার অব্যবহিত পূর্বে পুরুষের সাধনযন্ত্র রীতিমত কাঠিন্যপ্রাপ্ত ও অণ্ডকোষ সঙ্কুচিত হইয়াছে; রমণীর সম্বাধ ক্লিন্ন ও ভগাঙ্কুর স্পন্দিত হইতেছে। উভয়েরই শরীরে একটা তপ্ত ও দুঃসহ

* কামসূত্র—সাম্প্রয়োগিকাধিকরণম্, ৩য় অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক।

ব্যাকুলতা বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। তখন উভয়েই নিবিড়তর সংযোগের জন্য উদ্যোগী না হইয়া পারে না।...এই সময় সাধারণত স্ত্রীলোক উত্তানভাবে শয়ন করিয়া উরুদ্বয় ভাঙ্গিয়া ও উর্দ্ধে তুলিয়া অবস্থান করে; পুরুষগণ তাহার সাধন-যন্ত্র নারী-সম্বাধে প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং আপন হাঁটু ও কনুইদ্বয়ের উপর দেহভার রক্ষা করিয়া, রমণীর দেহ আবৃত করিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ে। ইহার পর নারী তাহার হস্তদ্বয় পুরুষের গলে বা পৃষ্ঠদেশে বিজড়িত করিয়া দেয়; ইচ্ছা করিলে সে আপন পদদ্বয় সমকোণাকারে ভাঙিয়া পুরুষের নিতম্বদেশে চাপিয়া রাখিতে অথবা পুরুষের পদদ্বয়ের নিম্নপ্রান্তে লতায়িত করিয়া দিতে পারে। ইহাই সর্বজন-পরিচিত প্রচলিত প্রথা।

সহবাসে অঙ্গ-বিন্যাসের বিভিন্ন মুদ্রা

বাৎস্যায়ন, কল্যাণমল্ল, আরবীয় শেখ নেফ্‌জাউই, ওমর হালেবি আবু ওস্‌মান্ প্রভৃতি সেকালের যৌনতত্ত্ব-বিশারদগণ রতিক্রিয়া-কালীন্ বহুবিধ মুদ্রা বা অঙ্গবিন্যাসের উল্লেখ করিয়াছেন। নূতনত্ব বা রুচি-পরিবর্তন হিসাবে উহার কতকগুলির কদাচিৎ প্রয়োগ সমীচীন বলিয়া মনে হয়; কারণ কামরাগদীপ্ত স্ত্রীপুরুষের কিছুদিন পরে একঘেয়েমিতে মনে মনে বিরক্তি জন্মিতে পারে। সেইজন্য সুরত-ব্যাপারে কখনো কখনো স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের ন্যায় আরোহ-প্রাণালী অবলম্বন করিতে দেওয়া উচিত। গ্রন্থকারের মতে,—প্রত্যেক সহবাসের প্রথমার্ধে স্ত্রীর আরোহ-প্রণালী ও শেষার্ধে পুরুষের আরোহ-প্রণালী অবলম্বন করাই ভালো পন্থা। ইহাতে রমণীর চরমানন্দ (orgasm) অপেক্ষাকৃত শীঘ্র আসে ও পুরুষের চরমানন্দ অপেক্ষাকৃত বিলম্বে প্রকাশ পায়।

উভয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় রতিক্রিয়া করা কাহারো কাহারো পক্ষে শ্রেষ্ঠ

সুখাবহ বলিয়া গণ্য হয়। স্বামী সম্মুখভাগে পা ছড়াইয়া (পদদ্বয় ঈষৎ পৃথক করিয়া) কিম্বা পা মুড়িয়া বসে; স্ত্রী তাহার কটি-পার্শ্ব দিয়া পদদ্বয় সোজাসুজি প্রসারিত করিয়া দেয় অথবা বেড়ীর আকারে আঁকড়াইয়া ধরে। স্বামী পশ্চাদ্ভাগে ঈষৎ হেলিয়া, একটি বা দুইটি হস্ত দেহকাণ্ড হইতে তির্যগ্‌ভাবে শয্যাতলে ন্যস্ত করিয়া ভার রক্ষা করিতে পারে। কটি-হিন্দোলে উভয়েই অল্পবিস্তর যোগ দিতে পারে।

আবার কেহ কেহ স্ত্রীকে পশুবৎ নিম্নমুখী করিয়া, তাহার উদর-নিম্নে একটা উচ্চ কঠিন উপাধান রক্ষা করে এবং হামাগুড়ির আকারে তাহার অঙ্গবিন্যাস করাইয়া পশ্চাদ্দেশ হইতে ক্রিয়া করেন। এই অবস্থায় স্কন্ধ-সমেত মস্তকদেশ কটি অপেক্ষা নিম্নতর থাকিবে। মুখচুম্বনের অসুবিধা সত্ত্বেও ইহা বহু নারীর পক্ষে প্রীতিকর হয়।...উভয়ে পার্শ্বশায়িত অবস্থায় রতিকার্য-চালন সম্ভবপর হইতে পারে, এবং গর্ভের পরিণত অবস্থায় এই প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করাই বিধেয়।

মোট কথা, একই দম্পতি পারস্পরিক সম্মতিজনিত খেয়ালে এক-একদিন এক-একরূপ মুদ্রা গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দণ্ডায়মান অবস্থায় রতি রমণীর পক্ষে কষ্টকর ও উভয়ের ঘোরতর স্বাস্থ্য-হানিকর।

যে কারণেই হউক, যে ক্ষেত্রে পুরুষ আপন যৌনযন্ত্রের তুলনায় যোনিনালী বেশি প্রশস্ত ও গভীর বলিয়া অনুভব করে, সেক্ষেত্রে রমণীর উচিত নিজের যোনিনালীর পেশীময় প্রাচীর যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা করা, সহবাসের উদ্যোগ-কালে ও মধ্যবর্তী সময়ে কোমল, পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা অভ্যন্তরদেশের অতিরিক্ত আর্দ্রতা দূরীভূত করা এবং উরুদ্বয়ের উর্দ্ধভাগ যথাসাধ্য একত্র করিয়া রাখা। পুরুষের যৌনযন্ত্রের ক্ষুদ্রতায় রমণী কোন অসুবিধা বোধ করিতে থাকিলে,

অথবা গর্ভাধানের সম্ভাবনাকে সুনিশ্চিত করিতে হইলে, নিতম্ব-নিম্নে একটি বালিশ রাখা ও হাঁটু-সমেত উরুদ্বয় ভাঙ্গিয়া যথাসম্ভব উদরের দুইপার্শ্বে টানিয়া আনা কর্তব্য *।

রমণী কি নিষ্ক্রিয়, মূক অংশীদার ?

প্রত্যেক স্বামীকেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অতিরিক্ত-কামাবেগবিহীনা রমণী সহবাসের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে পুরুষ অপেক্ষা একটু বেশি সময় লয়। এমন অনেক ক্ষেত্র জানি, যেখানে পুরুষ যখন তাঁহার চরমানন্দ লাভ করিলেন, নারীর তখন চরমানন্দ আসা দূরের কথা, তিনি তখন সবেমাত্র উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সেইজন্য পুরুষ তাহার সহবাস-ক্রিয়া যতই বিলম্বিত করিবে, ততই তাহা নারীর পক্ষে যেমন মঙ্গলজনক, তেমনি নিজের পক্ষেও সুখকর হইবে। সম্ভোগ জিনিসটায় শুধু পুরুষের একচেটিয়া অধিকার নাই, নারীরও সমান অধিকার আছে।

সেইজন্য সকল মনীষীই আদ্যক্রমের কাল প্রলম্বিত করিতে ও তখন বিভিন্ন প্রকারের উপচর্যা প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন ; তাহা হইলে নারী সহবাসের জন্য রীতিমতো উৎসুক হইতে ও চরমানন্দ অপেক্ষাকৃত শীঘ্র লাভ করিতে পারে। দংশন-চুম্বনাদি উপচর্যাগুলি মূল সুরতক্রিয়ার সময়ও উভয় তরফ্ হইতে চালানো কর্তব্য। প্রেমিকা নারী আশানুরূপ সুখানুভূতি পাইলে, পুরুষের ন্যায়, এবং পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর আবেগভরে অঙ্গ-আন্দোলন করিতে ও উপচর্যার প্রত্যুত্তর দিতে পারে।

নিবিড় আনন্দের সময় কখনো কখনো অস্ফুট কাকলি, ছোট্ট এক টুক্‌রা সোহাগবাণী অথবা মৃদু সীৎকার-ধ্বনি নিঃসৃত হইতে থাকে। যে নারী

* Vide answer by Lt. Col. W. C. Spackman, I. M. S. of Grant Medical College, Bombay, in **Marriage Hygiene**, Vol. II, No. 4, p. 408.

নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন এবং কোনরূপ আদরের বিনিময় করিতে উদাসীন থাকেন, তিনি সম্প্রয়োগে নামমাত্র সুখ পাইতেছেন, অথবা কোন সুখই পাইতেছেন না বলিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে হয়। এ বিষয়ে নারী পুরাপুরি passive factor বলিয়া যাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা নারীকে আদৌ চিনিতে পারেন নাই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখিয়াছি যে, যৌন-সম্মিলনে স্ত্রী যথাযোগ্য সক্রিয়তা ও বিলাসবিভ্রম দেখাইতে পারেন না বলিয়াই স্বামী বাহিরের দিকে পা বাড়ান্।

অকালস্খলন ও নিস্খলন

অকালস্খলনের প্রতিকার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে "যৌবনের যাদুপুরী" নামক গ্রন্থে। স্খলনের উপক্রম দেখিলে, তৎক্ষণাৎ কটি-হিন্দোল স্তব্ধ করিয়া দিয়া ও নিজের উপরৌষ্ঠ বা জিহ্বা কামড়াইয়া ধরিয়া, রমণীর ললাটের সহিত নিজের ললাট কিছুক্ষণ কঠোরভাবে চাপিয়া থাকিতে হয়।...কয়েকটি ধীর ও গভীর শ্বাস টানিয়া, মলদ্বারের (Sphincter Ani ও Levator Ani নামক) পেশীদ্বয় ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে রীতিমতো সঙ্কুচিত করিতে পারিলেও সুফল দর্শে। Tincture Cannabis Indica (গঞ্জিকার সুরাসার) রমণের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ১০-২০ ফোঁটা আউন্স দুই জলে মিশাইয়া পান করিলে, অথবা সন্ধ্যাকালে পাণের সহিত ৪।৫টি কাবাব-চিনির দানা ও যৎসামান্য শুষ্ক সিমুল-মূলচূর্ণ খাইলেও কায হয়।...

রমণকালে রমণীর বিসৃষ্টি রস ক্ষরিত হয় না, অথবা তদ্ব্যতিরেকেও সে নাড়ী-নিস্তারগত চরমানন্দ লাভ করে না,—এরূপ ঘটনা সর্বদেশে দাম্পত্য-জীবনে ভূরি-ভূরি ঘটিতেছে। ইহার জন্য স্বামীর অকালস্খলনই দায়ী, সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ রমণেই পুরুষের শুক্র স্খলিত হয় না,

এমন দৃষ্টান্ত কি পাওয়া যায়? গ্রন্থকার এযাবৎ মাত্র চারিটি কেস্ পাইয়াছেন—যেখানে কুড়ি মিনিট্ হইতে অর্ধ ঘণ্টাকাল পর্যন্ত রতিক্রিয়া পরিচালিত করিয়া উভয়েই অবসন্ন হইয়া পড়েন, অথচ পুরুষের বীর্যক্ষরণ হয় না। পত্নীর একবার বা দুইবার চরমানন্দ প্রাপ্তির পর, তিনি বিরক্ত ও খিন্ন হইয়া প্রায়শ স্বামীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বাধ্য হন্।...সুষুম্না-রজ্জুর নিম্নপ্রান্তে অবস্থিত স্খলন-কেন্দ্র (ejaculatory centre) ও উহা হইতে বীর্যাধার পর্যন্ত বিসর্পিত নাড়ীতন্তুর বিশৃঙ্খলতা বশত এইরূপ ঘটিয়া থাকে।...ইহা যেন উপসংহারহীন নাটকের অভিনয়ের মতো,—কখনই অভিপ্রেত নয়; দেহমনেরও ক্ষতিকারক। ইচ্ছা করিয়া নিস্খলনের রীতি অভ্যাস করা উচিত নয়।

যাহাহউক, রমণকালে উভয়ের যুগপৎ চরমানন্দ লাভ—ফলিত প্রেমের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। রমণীর দ্বারা অগ্রে চরমানন্দ লাভও নিন্দনীয় নয়। কোনো কোনো কামাবেগশালিনী যুবতী-স্ত্রী আপন চরমানন্দ প্রাপ্তির পূর্বে স্বামীর শুক্রক্ষরণ হইয়া গেলেও তাঁহাকে উঠিতে দেন না—সাগ্রহে বাহু ও পদ-বেষ্টনে ধরিয়া রাখিতে চাহেন। ক্রমাগত স্বামীদিগের একদেশদর্শী ও সম্মতি-নিরপেক্ষ যৌনসম্মিলন এবং নিজেদের সুরতানন্দ অপূর্ণ থাকার ফলে, রমণীর প্রেম বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে পারে। কেহ কেহ সুযোগ পাইলে, অন্য পুরুষেও প্রলুব্ধ হইতে পারেন। কাহারো কাহারো শিরঃপীড়া, হৃদিদৌর্বল্য, অনিয়মিত রজ, রজোহীনতা, বাধক-বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অম্লশূল, বিবমিষা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও তৎসহিত অর্শ, বিমর্ষতা ও বিমনাভাব, হিস্টিরিয়া প্রভৃতি রোগ আক্রমণ করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, অধিক দিন রতি-বঞ্চিত থাকিলেও বিবাহিতা যুবতীগণের উপরি-উক্ত নানারূপ মানসিক ও দৈহিক ব্যাধি দেখা দিতে পারে।...কতদিন

বিবাহিতা যুবতীগণ স্বচ্ছন্দে সহবাস-বঞ্চনা সহ্য করিতে পারে—এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। তথাপি একটা স্থূল ও সাধারণ প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিতে গেলে বলিতে হয়,—ষোলো হইতে ত্রিশ (কোনো কোনো রমণীর পক্ষে ছত্রিশ) বৎসর বয়স পর্যন্ত পত্নীগণ ছয়মাস কাল এবং গর্ভিণী হইলে এক বৎসর কাল রতি-বিরতির অভাবে কাতরতার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করে না। কিন্তু স্বতঃসঞ্জাত কামস্পৃহা পুরুষ অপেক্ষা রমণীগণ দমন করিতে পারেন অল্পায়াসে এবং তাহার ছদ্মবেশ ধারণ করাইতে পারেন অতি মনোজ্ঞভাবে।...

অন্তক্রম—রত্যবসান

শুক্রক্ষরণ হইলেই পুরুষের বিযুক্ত হওয়া উচিত নয়। সংলগ্ন অবস্থায় মিনিট দুই অবস্থান করা উচিত। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে, উঠিয়া, অপর পক্ষ তৃপ্তি পাইয়াছে কিনা—মৃদুমধুর ভাষে তাহা জিজ্ঞাসা করা ও তাহার গাত্রে কিছুক্ষণ হাত বুলানো উচিত। পরে কোনরূপ শুষ্ক কোমল বস্ত্রখণ্ড-দ্বারা উভয়ের জনন-যন্ত্র মুছিয়া ফেলিতে হয়। এই সময় কাহারো শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে যাওয়া উচিত নয়।

কেহ কেহ (বিশেষভাবে স্ত্রীলোকগণ) জলদ্বারা না ধুইলে যেন অস্বস্তিবোধ করেন; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর প্রথা। দারুণ উত্তপ্তাবস্থার পর (বিশেষত শীতকালে) এই অঙ্গে ঠাণ্ডা জলের প্রয়োগ অনুমোদন-যোগ্য নয়। তদুপরি স্ত্রীলোকের জরায়ু-মুখে ও যোনি-প্রাচীর-গাত্রে পুরুষের নিষিক্ত বীর্যের যেটুকু লাগিয়া থাকে, তাহা হইতে যৎসামান্য পরিমাণ তাঁহাদের শরীরে সারারাত্র আশোষিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা শরীরের উন্নতি বিধানও হয়—অপ্রত্যক্ষভাবে উভয়ের মিলনও পরিপূর্ণতা লাভ করে।

রতিক্রিয়ার পাঁচমিনিট কাল পরে উভয়েরই এক গ্লাস জল, অল্পমাত্রায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, কোনোরূপ তরলিত মলটেড্ ফুড্, সুরুয়া বা কয়েকটি আঙ্গুর খাওয়া বাঞ্ছনীয়।...প্রতি সহবাসের পর অন্তত তিন ঘণ্টাকাল নিদ্রা আবশ্যক। নিদ্রা বা পূর্ণ-বিশ্রামের সুবিধা থাকিলে, দ্বিপ্রহরেও রতি চলিতে পারে। কঠিন শ্রমের পর অথবা পূর্ণভোজনের অব্যবহিত পরে উহা অনিষ্টকারক।

কতবার ও কতদিন অন্তর ?

একরাত্রে কতবার ও বিবাহিত-জীবন-কালে কতদিন অন্তর যৌন-সম্মিলন করা উচিত, তৎসম্বন্ধে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে একটা ধরাবাঁধা নিয়ম করা চলে না। এবিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমাদের ব্যবস্থা-পত্র হইল এই যে, বিবাহের পর প্রথম-যৌবনে একরাত্রে দুইবার পর্যন্ত মাঝে-মাঝে যৌন-সম্মিলন চলিতে পারে এবং কদাচিৎ তিনবারে উঠানো যায়—তদপেক্ষা বেশি বার কিছুতেই নয়। সুস্থ, সবল দম্পতির পক্ষে প্রথম দুই-এক বৎসর প্রত্যহ একবার করিয়া (অবশ্য সপ্তাহে একদিন করিয়া বিশ্রাম লইয়া) সহবাস পরিচালনে আপত্তির কারণ নাই। অবশিষ্ট যৌবনকাল সপ্তাহে দুই হইতে তিনবার। প্রৌঢ়কাল হইতে যত কম করা যায়, ততই মঙ্গল। প্রথম-বয়সে একটু সংযম অভ্যাস করিলে, বহুদিন পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ভোগসামর্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে—একথা ভুলিলে চলিবে না!

নিতুই-নব, নিরবসন্ন দাম্পত্য প্রেম

যৌন-সম্মিলন ব্যাপারে যেন চিরকাল একটা সূক্ষ্ম রসবোধ, একটা

চিরনব গোলাপী মাদকতা, একটা রোমাঞ্চকর আগ্রহের সমাবেশ থাকে। উহা যেন একটা আপন অধিকারলব্ধ, সুলভ, গন্ধময়, স্থূল কদভ্যাসে পর্যবসিত না হয়। উভয়ে ফাঁক্ পাইলেই কিছুকালের জন্য বিচ্ছিন্ন থাকিয়া, বিরহের জ্বালা ও রতিবিরতির ক্ষোভ সহ্য করিবেন। প্রথম যৌবনের ফেনিল উচ্ছ্বাস কাটিয়া গেলে, পৃথক শয্যায় বা পৃথক ঘরে শয়ন করাও অভিপ্রেত। পুরুষই প্রতিবার সহবাসের জন্য তাগিদ না জানাইয়া, কিছুদিন আত্মদমন করিয়া স্ত্রীকে উন্মুখ ও অগ্রবর্তী করানো উচিত।

স্বামীস্ত্রী বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অভিগমনের পূর্বে পরিস্কৃত পরিচ্ছদ, সুকোমল শয্যাদ্রব্য ও অঙ্গে কিছু গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিবেন। শয্যার নিকট টাট্‌কা ফুল-গোঁজা ফুলদানি রাখিবেন, নচেৎ ঘরে সুগন্ধি ধূপ পোড়াইবেন। বিবাহ-বন্ধন যখন পাকা ও পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তখন আর পরস্পরের মনোহরণের এই বাহ্য উপকরণই বা কেন—এত কবিত্বপূর্ণ আড়ম্বরই বা কেন, যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে, গায়ের ঘাম, মুখের দুর্গন্ধ, গণ্ডের ক্ষৌর-বঞ্চিত দাড়ি, স্নানবিশেষের পুঞ্জীভূত কেশ, তৈলাক্ত মলিন বসন—বহু পতি ও পত্নীর বিবাহ-জীবনের রোমান্স্ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

বাঙালীর ঘরণীগণ আজীবন মনে রাখিবেন যে, তাঁহাদিগকে পতির নিকট শুধু কার্যে মন্ত্রী, করণে দাসী, স্নেহে মাতা সাজিলেই চলিবে না, সীতার মতো "শয়নেষু বেশ্যা রঙ্গে সখী চ" হইতে হইবে, নচেৎ হয়তো কীর্তিনাশার কিনারার মতো প্রিয়ের অন্তরের তলে-তলে ভাঙন্ ধরিবে।...ঠিক এই কারণেই আজকাল ভদ্রপরিবারের মেয়েদের লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-গীত-বাদ্যে অল্পবিস্তর পারদর্শী করিয়া তোলা হইতেছে।

প্রেম কখন্ হয় সার্থক ও সংসিদ্ধ ?

যৌন-সম্মিলনের মধ্য দিয়া প্রেমের বাঁধনকে অক্ষয়, অটুট্ ও চির-অভিরাম করা যায়—যদি পতি পায় পিতৃত্ব আর পত্নী পায় মাতৃত্ব। বিবাহের কয়েক বৎসরের মধ্যেই দুই-একটি সন্তান লাভ দম্পতির প্রিয় সাধনা হওয়া উচিত। বংশধারার মধ্যেই জাগিয়া থাকে নশ্বর মানবের প্রেমের অমরত্ব। অধিক সন্তানে অর্থনৈতিক বিপত্তি, মানসিক অশান্তি ও সংসার-বৈরাগ্য আসিতে পারে; কিন্তু যৌনানন্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রজননানন্দ চাই-ই। নহিলে বিধাতার সৃষ্টি ব্যর্থ—প্রেমিকের জীবনের লক্ষ্য যে ব্যর্থ হইয়া যায়!···

প্রেমিক-প্রেমিকা সন্তানকে মাঝে রাখিয়া, পরস্পরকে আরো নিবিড়-ভাবে কাছে টানিয়া লইয়া, বলিতে পারে—'তোমারই কৃপায় আমি ভাবিসম্ভাব্য রবীন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্রকে পেয়েছি—তোমারই দৌলতে আমি ভাবি-সম্ভাব্য স্বর্ণময়ী-সরোজিনী নাইডুকে পেয়েছি!...জয় হোক্ প্রেমের. জয় হোক্ পরিণয়ের!'

=শেষ

পরিশিষ্ট

সমকামিতার বিচিত্র বিকীরণ

পূর্বেই বলিয়াছি যে, স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব, সাদন-কাম ও মর্ষণ-কাম প্রত্যেক স্বাভাবিক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর থাকে। একটি থাকে অধিকতর মাত্রায় ও সুপরিস্ফুটভাবে; অন্যটি থাকে অতি সামান্যমাত্রায় ও প্রচ্ছন্নভাবে, —ফল্গু নদীর মত। উহা কচিৎ-কখনো একটা ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সংজ্ঞাত রাজ্যে প্রকাশ পায়। এইজন্য প্রত্যেক সাধারণ স্ত্রী বা পুরুষের প্রকৃতিসত্তার মধ্যে স্বজাতিকে ভালবাসিবার কিংবা স্বজাতীয় এক বা একাধিক ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইবার একটা প্রবৃত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে।

এই কারণে বালিকায় বালিকায়, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে, বালকে বালকে, পুরুষে পুরুষে বন্ধুত্ব হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। এবং এই বন্ধুত্ব যদি সুদৃঢ় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ও আমরণ স্থায়ী হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বভাব-সঙ্গত মনে করা কিছু অন্যায় হইবে না। অল্পবিস্তর যৌন আমেজ-মাখা নারীতে নারীতে যে ভালবাসা, অথবা পুরুষে পুরুষে যে প্রীতি, তাহারই নাম "সমকাম"। নারী ও পুরুষ পরস্পরের মধ্যে প্রেমের নাম "বিষমকাম"।

সমকামের ব্যাপারেও লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন,—একজন অপরজন অপেক্ষা অধিকতর স্ত্রী বা পুরুষভাবাপন্ন, বয়সে অল্পবিস্তর ছোট বা বড়, প্রেমসাধ্য আচার-ব্যবহারে অধিকতর সক্রিয় বা সঙ্কোচশীল হয়। সুতরাং সমকামের মধ্যেও বিষমকামের একটা ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

শিশু জন্মিয়াই প্রথমে নিজেকে ভালবাসিতে শিখে। মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী সকলের স্নেহাদর সে যত উপভোগ করে, ততই তাহার নিজের প্রতি প্রীতি ও বিশ্বাস বাড়িয়া যায়। পিতা, মাতা প্রভৃতিকে সে ভালবাসে অথবা ভালবাসার ভাণ করে এবং তাহাদের উপর নির্ভর করে—কেবল আপন স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে। ইহার নাম "আত্মকাম"।

প্রথমে আত্মকাম, তারপর সমকাম,, পরিশেষে বিষমকাম—এই তিনটি হইল মানুষের প্রেম-জীবনের ক্রম-পরিণতির এক-একটি ধাপ বা স্তর। মানুষ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক ধাপ হইতে আর এক ধাপে উঠিলেও, পূর্ববর্তী ধাপটির কথা একেবারে ভুলিতে পারে না ; সংজ্ঞাত মন হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিলেও অসংজ্ঞাত মন তাহাকে সযত্নে নিজের পালনাগারে পুষিয়া রাখে। সেইজন্য আমরা জীবনের মধ্য বা শেষভাগেও লোক বিশেষের মধ্যে আত্মকাম ও সমকামের আধিপত্য দেখিতে পাই।

সত্যকার আত্মকামী প্রায়ই অতিবাহিত বা অবিবাহিতা থাকেন। কেহ কেহ ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণীর বেশে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। কেহ Don Juan হইয়া ফুলে ফুলে মধু খায়, তৃপ্তি পায়ও না—দেয়ও না। কেহ গণিকা হইয়া ভালবাসার অভিনয় করে—শত পুরুষের উপর প্রভুত্ব করে। ইহারা একমাত্র নিজেকে ছাড়া আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না—বিশ্বের সমস্ত জীবকে ইহারা ঘৃণা বা করুণার চক্ষে দেখে। সাধারণতঃ আত্মকামীর যৌনক্ষুধা প্রশমিত হয় সুষুপ্তিগত ক্ষরণে নতুবা জাগ্রৎ স্বপ্নের কল্পনা বিলাসে এবং আত্মমেহনে (self-abuse). আত্মকামী ক্বচিৎ ক্ষণিক উন্মাদনায় সাময়িকভাবে সমকামী হইতে পারে,—একাধিক ব্যক্তির প্রতি সমমেহনের দ্বারা নিজের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে ; কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্থায়িভাবে কোন সম বা বিষম যৌনধর্মীর সহিত প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না। বিবাহিত আত্মকামী নিজেও সুখী হইতে পারে না, বন্ধু বা স্ত্রীকেও সুখী করিতে পারে না।

সমকামীদের প্রকার-ভেদ

সমকামীদের (Homosexuals) মধ্যে শ্রেণীভেদ ও প্রকারভেদ আছে ; যথা,—আসল, নকল, কায়িক ও আধ্যাত্মিক···ইত্যাদি। নকল সমকামীরা কায়মনে শতকরা ৮০-৯০ ভাগ বিষমকামী ; কেবল অবস্থা-বৈগুণ্যে কিছুকাল নারীসঙ্গ-বর্জিত হইয়া থাকিলে, সমজাতীয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় ও সমমেহনের দ্বারা কাম চরতার্থ করে। কুলিবস্তি, মঠাধিবাসী, বোর্ডিং হাউসের অধিবাসী, জেলকয়েদী, ফৌজ ও পুলিস-ব্যারাকের মধ্যে নকল সমকামীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।

সত্যকার সমকামী যাহারা, তাহারা জীবনে কখনও বিষম-যৌনধর্মীর প্রতি আকৃষ্ট হয় না ; বরং তাহাদিগকে অপর জাতির প্রতি একটা নিদারুণ ঘৃণার ভাব পোষণ করিতে দেখা যায়। আত্মকামী ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়া অথবা বিভিন্ন বিষমধর্মীর প্রতি প্রেমের অভিনয় করিয়া, যেমন অনেকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে, প্রকৃত সমকামীর পক্ষেও ইহার যে কোন একটি পন্থা দায়ে পড়িয়া অবলম্বন করা দুঃসাধ্য নহে। কিন্তু তাহা তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় নহে। অথচ বর্ধিত বয়সে মনোমত সমকামী প্রেমিকের সহিত একত্রে যৌনজীবন যাপন করাও সামাজিক শালীনতার দিক্ দিয়া তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয় না! বর্তমান মনঃসমীক্ষণ-বিদগণ ক্যাসানোভা, ডন জুয়ান, মেসালিনা, ক্লিওপেট্রা প্রভৃতির চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা আসলে সমকামী ছিলেন।

ইহারা প্রায়ই বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে না। পিতামাতা জোর করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলেও স্ত্রীকে সর্বদা সে শত্রুবৎ জ্ঞান করে, নতুবা সভয়ে তাহাকে এড়াইয়া চলে। ক্বচিৎ উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজের ইচ্ছায়, এবং প্রায়শঃ স্ত্রীর নির্বন্ধাতিশয্যে নিতান্ত নির্বেদ সহকারে সমকামী পুরুষ স্ত্রী-সহবাস করে। আবার সমকামী স্ত্রীলোকও পুনঃ পুনঃ অনিচ্ছা প্রকাশ, আন্তরিক বাধাদান ও একটানা অশান্তিপূর্ণ কলহের শ্রান্তিকর অবকাশে ক্বচিৎ-কখনো নিতান্ত দায়ে পড়িয়া মুখ বুঁজিয়া স্বামীর কামনা-বহ্নির ইন্ধন যোগাইয়া থাকে। তাহার ফলে অবশ্য তাহাদের পক্ষে পুত্রকন্যার পিতা ও মাতা হওয়ার বাধা ঘটে না। তথাপি তাহারা কখনও সত্যকার স্বামী-স্ত্রী বা স্বেচ্ছাবৃত মাতাপিতা হইতে পারে না।

কামিক ও ভৌগিক

সত্য বা তথাকথিত সমকামীদের মধ্যে একদল থাকে কামিক বা সক্রিয় এবং একদল থাকে ভৌগিক বা নিষ্ক্রিয় ; অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে একজোড়া সমকামীর মধ্যে একটি পতি ও অন্যটি পত্নীর ভূমিকা গ্রহণ করে। অবশ্য রুচি-পরিবর্তনের খাতিরে ও একটু নূতনত্ব বিধানের লোভে কামক্রীড়ায় মাঝে মাঝে ভৌগিক কামিকের—কামিক ভৌগিকের ভূমিকা

গ্রহণ করিতে পারে। স্ত্রী সমকামী সম্বন্ধেও ঐ একই পরিস্থিতি। কাজে কাজেই নিষ্ক্রিয় বা ভৌগিক সমকামী পুরুষ এবং সক্রিয় বা কামিক সমকামী স্ত্রীলোক বিবাহের প্রতি স্বতঃই বিরূপ হয়; বিবাহ করিলেও তাহাদের জীবন প্রায়ই ব্যর্থ, বিষময় হয়।

আসল ও কায়িক সমকামী

যাহারা আসল কায়িক সমকামী, তাহারা জীবনের কোন অবস্থায়ই বিষমকামী হইতে পারে না। বিবাহিত হইয়াও তাহারা সমজাতীয় প্রিয়ের প্রতি আসঙ্গ-লিপ্সা পোষণ করে এবং সুযোগ পাইলেই তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে কিংবা তাহার দ্বারা আলিঙ্গিত হইতে সচেষ্ট হয়। যদি কোন আসল কায়িক সমকামী পুরুষ বাল্যে বা কৈশোরে কোন পুরুষ সমকামীর প্রতি আসক্ত হইয়া নিয়মিত কিছুকাল ধরিয়া তাহার সহিত অস্বাভাবিক কামক্রীড়া করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার স্মৃতি শ্রেষ্ঠ বামাকে পত্নীরূপে পাইয়াও অথবা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াও সে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। মধ্যবয়সে বা বৃদ্ধবয়সেও যদি তাহাকে নিকটে পায়, তাহা হইলে তাহাকে কায়িকভাবে উপভোগ করিতে সে মনে মনে ব্যগ্র হয়—পাইলে কৃতার্থম্মন্য হয়।

তদ্ব্যতীত বাল্যের ন্যায় পরবর্তীকালে অস্বাভাবিকভাবে সে যদি প্রতিনিয়ত কাম চরিতার্থ করিতে না পায়, তাহা হইলে তাহার সাংসারিক জীবন যেমন ব্যর্থ তেমনি তিক্ত হইয়া উঠে। স্ত্রীর সহিত তাহার কখনও বনিবনাও হয় না। মেজাজ তাহার থাকে সর্বদা রুক্ষ, সামাজিক পরিমণ্ডলে সে প্রায়শঃ অসহিষ্ণুতা, অসৌজন্য ও আত্মম্ভরিতার জন্য নিন্দিত হয়। সাধারণতঃ নিজের অস্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তিকে লোকসন্দেহ হইতে সংবৃত রাখিবার জন্য সে একদিকে যেমন অমিশুক ও আত্মসঙ্কোচশীল হয়, অন্যদিকে তেমনি সংরক্ষণবাদী ও কপট-ধর্মাচারী হয়। কেহ কেহ সুস্পষ্টভাবে সাদনকামিতারও পরিচয় দেয়।

'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডং' হইয়াও কায়িক সমকামী তাহার বাল্য-কৈশোরের কদভ্যাসকে পরম রমণীয় সত্যানুভূতি জ্ঞানে মনে মনে পূজা করে। ইহারা কখনো স্ত্রীপুত্রের প্রতিও আন্তরিক-

ভাবে আসক্ত হইতে পারে না, ভগবৎ প্রেমেও অনায়াসে পরিপূর্ণভাবে মজিতে পারে না। আমি যে কয়টি প্রাপ্তবয়স্ক, সত্যকার কায়িক সমকামীর রিপোর্ট পাইয়াছি, তাহাদের অধিকাংশই অত্যন্ত সংরক্ষণশীল পরিবারের সন্তান। বাল্যে সমকামে তাহারা দীক্ষা পাইয়াছে কোন নিকটাত্মীয়ের (এমন কি সহোদর ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠতাত-বা খুল্লতাত-পুত্রের) কাছে অথবা ধর্মসম্পর্কিত কোন বন্ধুর কাছে। তাহারা হয় সাধারণতঃ বাল্যে মাতৃহারা, নচেৎ অতি অলস, দুশ্চরিত্রা বা চিররুগ্না মাতা কর্তৃক আবাল্য অনাদৃত। তাহারা কয়েকটি কন্যা-সন্তানের পর পিতার শেষ বয়সে অথবা তরুণী ভার্যার গর্ভে জন্মিয়াছে।

এমন কয়েকটি ঘটনা আমার গোচরে আসিয়াছে, যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক কামিক বা ভৌগিক সমকামী অনিচ্ছুক বা উদাসীন অংশীদারকে তাহার প্রতি চিরসংসক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহার স্ত্রী (এমন কি কন্যাকেও) বন্ধুর লালসা-বহ্নির ইন্ধন যোগাইতে স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া দিয়াছে।

আধ্যাত্মিক সমকামিতা

আধ্যাত্মিক সমকামিগণও অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞাতসারেই এই পথের পথিক হয়। বাল্যকাল হইতেই যদি তাহাদের উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতি অল্পকালের জন্য তাহারা নবপ্রবুদ্ধ যৌনাবেগের তাগিদে সমকামের বাস্তব দিকটির সহিত পরিচিত হয় (না-ও হইতে পারে)। কালক্রমে ঐ অভ্যাস তাহারা পরিত্যাগ করে; অনেক সময় এইরূপ কার্যকে গর্হিত মনে করিয়া লজ্জা ও অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। তারপর তাহাদের প্রেমের অনেকটা উদ্গতি লাভ হয়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও একজন থাকে সক্রিয় ও অন্যজন নিষ্ক্রিয়। একজন অল্পবিস্তর স্বার্থত্যাগী, আবেগপ্রবণ, বাহিরে কঠোর ও অন্তরে নিতান্ত কোমল; অপর জন প্রায়ই ইহার বিপরীত গুণসম্পন্ন হয়—স্বল্পভাষী, অতি হিসাবী ও সৌকুমার্যের ভাণকারী! কায়িক সমমেহনের ইচ্ছা তাহারা অবদমনের চেষ্টা করিয়া অল্পায়াসে কৃতকার্য হয় বটে, কিন্তু তাহাকে একেবারে বিদূরণ করিতে পারে না। এই অবদমিত ইচ্ছা অনেক সময় সাদনকামিতা, স্ত্রীর সহিত অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে রমণের প্রবৃত্তি

প্রভৃতির মধ্য দিয়া স্ফুরিত হইয়া উঠে। আধ্যাত্মিক সমকামীরা স্ত্রীকে অনেকটা পরিমাণে ভালবাসিতে পারে—কিন্তু বন্ধু অপেক্ষা কখনই অধিকতর পরিমাণে নহে! আধ্যাত্মিক সমকামীর সংখ্যা শিক্ষিত সমাজে অত্যন্ত অধিক বলিয়া জানিতে পারা যায়।

প্রেমের ত্রিকোণক্ষেত্র

এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হইল—প্রেমের ত্রিকোণক্ষেত্র রচনা (Triangle of love)। এই ত্রিকোণক্ষেত্রকে কেন্দ্র করিয়া বিদেশে ও এদেশে শতসহস্র নাটকোপন্যাস রচিত হইয়াছে। সাহিত্যে সাধারণতঃ দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক অথবা দুই জন স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষকে লইয়া প্রেমের একটি ত্রিকোণক্ষেত্র নির্মিত হয়। বিশেষভাবে প্রথমটিতে সাহিত্যের রস যেমন সুন্দর জমাট বাঁধে, মনোবিজ্ঞানিকের দৃষ্টিও তেমনি তদুপরি প্রখরতরভাবে নিপতিত হয়।

আধ্যাত্মিক রাজ্যের দুই সমকামী বন্ধু—বাল্য-কৈশোর-যৌবনে একত্রে খেলাধূলা করিয়াছে, একত্রে লেখাপড়া করিয়াছে। উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য প্রবাসে আসিয়া এক মেসে থাকে, হয়ত একই কলেজের ছাত্র হয়। উভয়েই হয়ত ওকালতি, ডাক্তারি বা এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। শেষে এক বন্ধু (ধরুন—যিনি নিষ্ক্রিয়, ভৌগিক) বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইল। বিশেষ বাছিয়া, পূর্বরাগ ও কোর্টশিপের ফলে একটি উচ্চশিক্ষিতা বর্ষিয়সী মেয়েকে বিবাহ করিতে দিতে অবিবাহিত বন্ধুটি প্রায় ক্ষেত্রেই নারাজ হয়। কারণ তাহার মনে আশঙ্কা জন্মে যে, এমন ভার্যা লাভ করিলে, সে বন্ধুকে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিবে—কালক্রমে তাহাকে ভুলিয়াই যাইবে।

জননীরাও অনেক সময় এইরূপ বিবাহে আপত্তি করেন—ঠিক ঐ কারণেই। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া দেখিবেন, কামিক বা সক্রিয় সমমেহী প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ভৌগিক সমমেহীর মাতার প্রতিকল্পরূপে কার্য করে—কতকটা অভিভাবকেরও। সাধ্যাতীত না হইলে, সক্রিয় সমমেহী বন্ধুকে খাটো করিয়াও এইরূপ বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে চাহে। হয়ত পাত্রীকে নিজের জন্য জয় করিবার একটা দৃঢ় প্রয়াস করে; কারণ তাহার মনে বিশ্বাস জন্মে যে,

সে এরূপ পত্নী পাইলেও বন্ধুকে ফেলা ত দূরের কথা, তাহাকে আরো ভালো করিয়া ভালবাসিতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে "গৃহদাহের" সুরেশের কথা স্বতঃই মনে পড়িয়া যায়। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বিনী বিদুষী অচলার সহিত যখন মহিমের বিবাহের সব ঠিকঠাক্, তখন অচলার নিকট সুরেশের নিন্দা করিতে আসিয়া সুরেশ বলিতেছে, 'তার সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সমস্তই তার একার। স্বার্থপর!··· এই নিয়ে কত দুঃখ সে যে ছেলেবেলা থেকে আমাকে দিয়ে এসেছে, বোধ করি তার সীমা নেই!...আমার ভয় হয়, যে পাষাণকে নিয়ে আমি কখনো সুখ পাইনি, তাকে নিয়ে আপনিই কি সুখী হ'তে পারবেন?'···বলিতে বলিতেই অকস্মাৎ তাহার চোখ দুটো অশ্রুজলে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল।

ইহার পরের কয়েকটি পংক্তিও অনুধাবনযোগ্য।···তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া, জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, 'দেখুন, আমার বাইরেটা ভারি শক্ত দেখ্‌তে, কিন্তু ভিতরটা তেমনি দুর্বল। মহিমের ঠিক্ তার উল্টো। তবুও আমাদের মত বন্ধুত্ব সংসারে বোধ করি খুব কমই ছিল।'···বলা বাহুল্য, সুরেশ ছিল কামিক সমকামী, মহিম ছিল ভৌগিক। শরৎচন্দ্র পারিভাষিকভাবে মনোবিজ্ঞানিক না হইয়া, একপ্রকার নিজের অজ্ঞাতসারেই সুরেশ, অচলা ও মহিমকে লইয়া প্রেমের এক পরিপাটি বিজ্ঞানসম্মত ত্রিকোণক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।...

জানিয়া রাখুন যে, সচরাচর মনোবিজ্ঞানের ত্রিকোণক্ষেত্র প্রস্তুত হয় একজন স্বামী, তাহার স্ত্রী ও তাহার বন্ধুকে লইয়া। সাধারণের চক্ষে শুধু এইটুকুই ধরা পড়ে—স্বামী ও বন্ধু দুইজনেই প্রায় সমভাবে স্ত্রীলোকটিকে ভালবাসিতেছে। ভালবাসার প্রতিযোগিতায় অনেক ক্ষেত্রে বন্ধুটিই অগ্রবর্তী হইতেছে এবং স্ত্রীলোকটি অপরের ধর্মপত্নী হইয়াও বন্ধুটির দিকে বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইহাদের চক্ষে আর একটা মহাসত্য ধরা পড়ে না যে, সমকামী স্বামীপ্রবর নিজের বন্ধুটিকে যতখানি ভালবাসেন, তাহার তুলনায় স্ত্রীকে ভালবাসেন অল্প। স্ত্রীকে বরং কিছুদিন না দেখিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু বন্ধুকে যেন একদণ্ড না দেখিলে তিনি দিশেহারা হইয়া পড়েন। নিউ থিয়েটার্সের "পরিচয়" নামক

চিত্রনাট্যে দেখিতে পাই, সংবাদপত্রের মালিক মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার স্ত্রী সতীকে বলিতেছেন, "দেখ, কবি অনন্তকে আমি ক্রমে ক্রমে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছি। মনে হয়, তাকে এক দণ্ড ছেড়ে আমি থাকতে পারি না।" ইহাকে নির্জ্জাত ও আধ্যাত্মিক সমকামিতার লক্ষণ ছাড়া আর কি বলিব? কেহ জেরা করিলে কিন্তু পতিপ্রবর সর্বদাই আন্তরিকভাবে ঘোষণা করেন যে, তিনি বন্ধুর চেয়ে স্ত্রীকে অনেক বেশী ভালবাসেন।...সত্যই স্ত্রীকে খুশী করিবার জন্য তিনি অজস্র অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিতে প্রস্তুত থাকেন।

বিবাহিত আধ্যাত্মিক সমকামী তাহার অবিবাহিত (অথবা বিবাহিত) সমকামীকে মনে মনে ভালবাসে বিবাহিতা পত্নীর মতোই; যদিও সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পত্নীর উপর অনেকটা ভালবাসা চালান্ করিয়া দেয়—প্রধানতঃ পত্নীকে খুশী রাখিবার জন্য এবং সে যে সমকামী নহে—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সেই বিশ্বাসকে বলবান করিবার জন্য। পত্নী যখন দেখে যে, স্বামী তাহাকে উপেক্ষা করিয়া দিনরাত বন্ধুকে লইয়াই প্রমত্ত, বস্তুতঃ দুর্নিবার বন্ধুটি তাহার একচ্ছত্র রাজ্যের অনেকখানিতেই ভাগ বসাইয়াছে, তখন সে কতকটা কৌতূহলের বশে ('দেখি না, বন্ধুর মধ্যে এত কি মিষ্টত্ব আছে!') ও কতকটা প্রতিশোধের অভিপ্রায়ে, বন্ধুটিকে স্বামীর নিকট হইতে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে। শেষে ভাবে-ভঙ্গিতে-ছলে-কৌশলে তাহার মনোহরণ করিয়া, তাহার নিকট আত্মনিবেদন করিয়া বসে।

অনেকক্ষেত্রে ব্যাপার এতদূর বাড়াবাড়ি হয় যে, বাটীর সকলে ও পাড়ার সকলে এ কলঙ্ক জানিয়া ফেলিল, কিন্তু স্বামী জানিতে পারেন না। মনোবিজ্ঞানিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, স্বামী এই ব্যভিচারের কথা জানিয়াও জানিতে চাহেন না, অজ্ঞতার ভাণ করেন। ইহাতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঘৃণা চরমে উঠে। ওই অবৈধ প্রণয়-লীলা যেদিন একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া যায় অর্থাৎ পারিবারিক বা সামাজিক পরিবাদের চাপে প্রত্যক্ষভাবে আবিষ্কার করিতে হয়, সেদিন স্বামীটি তাঁহার বন্ধু ও স্ত্রীকে একসঙ্গে হারান্। স্ত্রীর প্রতিশোধ-ব্রত সেইদিনই উদ্‌যাপিত হয়। বলা বাহুল্য, ইহার পর স্বামীর

জীবন বিড়ম্বনাপূর্ণ, বিষময় হইয়া উঠে। এমনি করিয়া সমকামী তাহার অস্বাভাবিক ও নির্জ্জাত কামেচ্ছার নিমিত্ত নিজের উপর শাস্তি টানিয়া আনে।

এমন দৃষ্টান্তও বাস্তব জগতে এবং বাংলা দেশে উচ্চশিক্ষিত পরিমণ্ডলের মধ্যে পাওয়া যাইবে—যেখানে একজন আধ্যাত্মিক সমকামী তাহার অন্য এক সমকামী বন্ধুর বাহুযুগলের মধ্যে তাহার স্ত্রীকে ঠেলিয়া দিয়াছে; এবং এক টেবিলে বসিয়া যেমন করিয়া দুই বন্ধু উপাদেয় ভোজ্য আহার করে, তেমনি করিয়া একজনের স্ত্রী উভয়ে অবসর মতো সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবেই এক শয্যায় উপভোগ করিতেছে। স্ত্রী যেন তাহাদের মিলনের রমণীয় রজ্জু অথবা বন্ধুত্বরক্ষার এক প্রলোভনময় টোপ্। স্বামী তাহার স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসিয়াই মনে করে—বন্ধুর ন্যায় গুণী, বিদগ্ধ ও কামকর্মিষ্ঠ পুরুষকে তাহার উপভোগের জন্য ছাড়িয়া দিয়া, তাহাকে ধন্য করিল; অন্যদিকে বন্ধুকে ভালবাসিয়া সে মনে করে—আপন স্ত্রীরত্নের ন্যায় দুষ্কুলাদপি উপহার দিয়া সে তাহার প্রেমের চরম নিদর্শন দেখাইল!

এইরূপ ক্ষেত্রে প্রায় শতকরা ৯৯টি স্থলে স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণ শান্তি ও সুখ থাকে না। সে স্বামীর প্রতি উষ্মা-অবজ্ঞা ও মুখে হাসি লইয়া সংসারে টিঁকিয়া থাকে, অথচ স্বামীর বন্ধুটিকেও গভীর ও পরিপূর্ণভাবে ভালবাসিতে পারে না।

এইস্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রণয়ী বন্ধুর স্ত্রটি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পটভূমিকার প্রায়ান্ধকারে মিশিয়া থাকে। সে বেচারী স্বামীর ভালবাসা পুরা চাহিয়া পায় না—বন্ধুর ভালবাসা সে উপেক্ষাভরে চায় না।...

একজনের স্ত্রীকে মধ্যস্থলে উপলক্ষ রাখিয়া এই-যে দুইটি সমকামী বন্ধুর প্রগাঢ় প্রেমের প্রবর্তন, ইহাকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ *Kandaules-motive* বা "Third line motive" নাম দিয়াছেন। গ্রীক পুরাবিৎ হোরোডোটস্ পৌরাণিক যুগের একজন রাজার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাঁহার নাম ছিল ক্যান্দাউলিস্। এই রাজার এক লাবণ্যললামভূতা তরুণী পত্নী ছিলেন। তাঁহার দেহরক্ষী সৈন্যদলের নেতার নাম গাইগেস্। গাইগেস্‌কে রাজা যেমন বিশ্বাস করিতেন, তেমনি ভালবাসিতেন। তিনি প্রায়ই এই বিশ্বস্ত সেনাধ্যক্ষের সমক্ষে সগর্বে তাঁহার স্ত্রীর বিভিন্ন অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনা করিতেন। একদিন রাজা ক্যান্দাউলিস্, গাইগেস্‌কে বহু কষ্টে রাজি করিয়া, তাঁহার শয়ন-কক্ষে চুপিচুপি টানিয়া লইয়া গেলেন। দরজার আড়ালে তাহাকে লুকাইয়া থাকিতে বলিয়া, তিনি রাণীকে শয়ন-কক্ষে ডাকিয়া আনিয়া, তাহাকে বিবস্ত্রা করিয়া ফেলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গাইগেস্‌কে তাঁহার স্ত্রীর নগ্ন লাবণ্য সন্দর্শন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

গাইগেস্ সেই স্বপ্নাবেশ-ভরা রূপস্থষমা অবলোকন করিয়া, বিস্মিত প্রশংসায় একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন রাণী গাইগেসের উপস্থিতি জানিতে পারিয়া লজ্জায় তাড়াতাড়ি কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। পরদিন রাণী নিভৃতে গাইগেসকে অন্দরমহলে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার স্বামীর নির্বুদ্ধিতায় তুমি আমাকে বিবস্ত্রা দেখেছ। স্বামী ছাড়া স্ত্রীর গোপনাঙ্গ আর কারো দেখা বিধিসঙ্গত নয়। দু'টি উপায়ের একটি উপায় তোমায় গ্রহণ করতে হবে। হয় তুমি আমার স্বামীকে হত্যা ক'রে আমাকে বিবাহ কর, নচেৎ নিজের মৃত্যুর জন্য এই মুহূর্তে প্রস্তুত হও।" গাইগেস অবশ্য প্রথম উপায়টিই বাছিয়া লইয়াছিল।...ত্রিকোণক্ষেত্রের একটি কোণ এখনো অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে এমনি-নৃশংস উপায়ের মধ্য দিয়া খসিয়া যায়!

কায়িক সমকামিতার অদ্ভুত উদাহরণ

সম্প্রতি কয়েকটি আসল কায়িক সমমেহীর বিবাহিত জীবনের সকরুণ ইতিহাস আমার দপ্তরে সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত লোকশিক্ষাকর ও একটু অসাধারণ রকমের বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এক ভদ্রলোক কোন মফস্বল শহর হইতে ছদ্মনাম দিয়া দুইজন সমকামীর অতীত ও বর্তমান জীবনকাহিনী আমার নিকট বিবৃত করিয়া, কোন কোন বিষয়ে আমার সদুপদেশ চাহিয়াছেন।.....

আমার বিশেষ পরিচিত দুই ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব-ভাব। কাল্পনিক নাম একজনের রাম ও অপরের শ্যাম। রামের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর, স্বাস্থ্য ভাল। শ্যামের বয়স প্রায় আটত্রিশ বৎসর, স্বাস্থ্য ভাল নয়। বয়সের এই পার্থক্য হইলেও পূর্ব হইতে উভয় পরিবারের ভিতর একটা ধর্ম-সম্বন্ধ থাকায় জন্য রাম অতি শৈশবকাল হইতে শ্যামের সাহায্য

লাভ করিয়া আসিতেছে। রাম শ্যামের নিকট হইতেই যৌন জীবনের শিক্ষা ও স্বাদ পাইয়াছে। বাল্যকালে শ্যাম রামের উপর সমমেহন করিয়াছে এবং রাম একটু বয়স্ক হইলে কচিৎ শ্যামের উপরও ঐ ক্রিয়া করিয়াছে। এইভাবে উভয়ের ভিতর একটা আকর্ষণ জন্মিয়া থাকে।

তারপর উনিশ বৎসর বয়সে শ্যাম একটি এগার-বারো বৎসর বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করে। পত্নীর প্রতি তাহার যথেষ্ট ভালবাসা ছিল ও আছে। ছয়টি সন্তানও হইয়াছে। প্রথমটির বয়স প্রায় চৌদ্দ-পনের বৎসর।

রামের বিবাহ হয় তাহার সতের বৎসর বয়সে। সে-ও এক এগার বৎসর বয়স্কা বালিকার পাণিগ্রহণ করে। পত্নীর প্রতি তাহার ভালবাসা যাহাকে বলে দাম্পত্য প্রণয় তাহা পূর্ণরূপে জন্মে নাই। পত্নীর প্রতি একটা আকর্ষণ—যাহা থাকা স্বাভাবিক—তাহা নাই। অথচ তাহার পত্নী গৌরবর্ণা, দেখিতেও বিশ্রী নয়। রামের স্বভাব—মেয়েদের অঙ্গ-সৌষ্ঠবের খুঁৎ বাহির করা; ওর চোখে খুব কম মেয়েই সুন্দরী বলিয়া প্রতীয়মান হয়! রাম তাহার মায়ের ঝগড়াটে স্বভাব পাইয়াছে। সে বেশ ক্রোধী এবং কোন কিছু তাহার মতবিরুদ্ধ হইলেই ক্রোধসঞ্চার হয় অতি সহজে। পত্নীর প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ নাই। সে বলে, তাহার পত্নীর মুখাবয়বের একটি অংশ শুভদৃষ্টির সময়ই তাহার চোখে বিতৃষ্ণার সঞ্চার করিয়াছিল; ফলে পত্নীকে সে পূর্ণরূপে ভালবাসিতে পারে নাই। অথচ বরাবর সে বন্ধু শ্যামকে সর্বদা কাছে কাছে পাইবার জন্যে লালায়িত। এমনও বলে, সে যদি শ্যামকে ইচ্ছামত কাছে পায় এবং শ্যাম যদি তাহার উপর বিযোনি-মৈথুন করে, তাহা হইলে সে খুবই তৃপ্ত হয় এবং পত্নীর সংস্রব না রাখিলেও সে অসুবিধা বোধ করে না।

নববিবাহিত যুবক যেমন পত্নীকে সর্বদা কাছে পাইতে চায় এবং আলিঙ্গন, চুম্বনাদিতে অস্থির করিয়া তুলে, রামও অদ্যাপি শ্যামকে তেমনি ভাবে চায় এবং শ্যামের অনিচ্ছাকে সে আমল না দিয়া বুকে জড়াইয়া চুম্বনাদিতে অস্থির করিয়া তুলে! তাহার পত্নীর সাক্ষাতেই এরূপ করে। এই তিনটি নরনারীর ভিতর অবাধ মেলা-মেশা চলে।

শ্যামের সাক্ষাতে রাম তাহার পত্নীর সহিত রতিক্রীড়া করিতেও দ্বিধা করে না। রামের কয়েকটি সন্তান হইয়াছে।

শ্যাম স্ত্রী-সহবাসের আস্বাদ পাইবার পর হইতে রামের সহিত সমমেহন, হস্তমৈথুন প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায়ে রেতঃপাত করিবার হাত সাধ্যমত এড়াইয়া চলে। কিন্তু রাম নাছোড়বান্দা হইয়া মধ্যে মধ্যে শ্যামের দ্বারা নিজের উপর রতিক্রড়া করাইয়া ছাড়ে। ইহাতে সে অপূর্ব তৃপ্তি পায়; স্ত্রীর সহিত সহবাসে বিশেষ কিছুই পায় না! শ্যাম বাল্যকাল হইতে রামকে ইচ্ছামত পাওয়ার ফলে তাহার প্রতি শ্যামের একটা ভালবাসা জন্মিয়াছে বলিয়া রামের আব্দার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পূরণ করে। সময়ে সময়ে শ্যাম যদি রামের ইচ্ছা পূরণ না করে, তবে রাম রাগ করে বটে, কিন্তু বেশী দিন থাকিতে পারে না। দুই-চারি দিন কথা বন্ধ করিয়া রাম যাচিয়া শ্যামের সহিত কথা বলিয়া আবার আলিঙ্গন-চুম্বনাদিকে ব্যস্ত করিয়া তুলে।

আমার ধারণা ছিল, পুরুষ স্ত্রী-সহবাসের আস্বাদ পাইলে অস্বাভাবিক উপায়ে রেতঃপাত করিতে চায় না, কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা ভুল। তদুপরি পুরুষ নিজের উপর অপর পুরুষ দ্বারা মৈথুন করাইয়া তৃপ্তি পায় কি কারণে বুঝি না। যে পুরুষ মৈথুন করে, তাহার না হয় রেতঃ-পাতের দ্বারা কিছু আনন্দ আসে; কিন্তু যাহার উপর মৈথুন করা হয়, সেই বেশী তৃপ্তি পায় কেন? এই অদ্ভুত যৌনক্ষুধার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া জানাইলে পরম বাধিত হইব।

আর একটা সমস্যা! রামের স্ত্রী শ্যামকে ভালবাসে। কতদিন হইতে ভালবাসে জানি না। তবে শ্যামের নিকট শুনিয়াছি, রামের স্ত্রী আজকাল শ্যামকে দেখিতে না পাইলে অধীর হইয়া উঠে! এখানে শ্যামের স্বভাবের কথা বলি।—শ্যামের স্বভাব কোমল, সে রামের বর্তমানেই রামের স্ত্রীকে নির্দোষ স্নেহ ও আদর করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে রাম স্ত্রীকে সোহাগ আদর করে না বলিলেই হয় এবং সাংসারিক সামান্য ব্যাপারে ঝগড়া ও মারপিট চালায়। পূর্বেই বলিয়াছি রাম সহজেই ক্রোধান্বিত হয়।

যাহা হউক, শ্যামও রামের স্ত্রীর প্রতি বেশ আকৃষ্ট হইয়াছে,—ইহা মোহ কিনা জানি না। শ্যামের পক্ষে মোহ হইলেও রামের স্ত্রীর

পক্ষে শ্যামের প্রতি আকর্ষণ মোহ নয় বলিয়াই মনে হয়। কারণ রামের স্ত্রী শ্যামের আদর-সোহাগ-চুম্বনের জন্য লালায়িত এবং শ্যামকে দেহ-দানও করিয়াছে। রাম জানে যে, তাহার স্ত্রী শ্যামকে ভালবাসে এবং শ্যামও তাহার (রামের) স্ত্রীকে ভালবাসে; কিন্তু তাহা যে চুম্বন, আলিঙ্গন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত দেহদানে পর্যবসিত হইয়াছে, তাহা মোটেই সন্দেহ করে না। স্বামীও যাহার জন্য লালায়িত, স্ত্রীও তাহার জন্য লালায়িত! এই রহস্যের সন্ধান দিলে আনন্দিত হইব।

[এই পত্র পাওয়ার পর আমি কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর চাহিয়া পত্র-প্রেরকের নিকট একখানি পত্র লিখি। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উত্তর পাই। উহার প্রায় সর্বাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—]

১। রামের বাল্যকালে মেয়েলি আচার ছিল, এক্ষণে বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। গোঁফ-দাড়ি যেমন পুরুষের থাকা দরকার, তেমনি বাহির হইয়াছে। পূর্বে মাথায় খুব ঘন চুল ছিল, ২।৩ বৎসর হইতে চুল উঠিয়া উঠিয়া এক্ষণে খুব পাতলা হইয়াছে। ওষ্ঠ পুরু; চেষ্টা করিলে শিষ্ দিতে পারে। গলার স্বর মোটা; কথাবার্তা নীচু গলায় বলিতেই পারে না এবং একটু রাগের ভাব হইলে স্বর ক্রমশঃ উপরের পর্দায় উঠিতে থাকে। রাগী স্বভাব। দাস্তের ধাত একটু কড়া। স্তন-বৃন্ত কোনরূপ অস্বাভাবিকভাবে উন্নত নহে। লিঙ্গের দৈর্ঘ্য বয়স অনুপাতে একটু কম মনে হয়, প্রস্থ স্বাভাবিক। শিশ্নমুণ্ড সর্বদা খোলা অবস্থাতেই থাকে, ঢাকা যায় না। দাড়ি কামায়, গোঁফ কামায় না। রামের বর্ণ নিকৃষ্ট শ্যামবর্ণ।

২। রাম যে পরিবারে জন্মিয়াছে, তাহা গোঁড়া বৈষ্ণব। রামের পিতা পৈতৃক দেববিগ্রহের সেবা করিয়া আসিলেও তাঁহার স্বোপার্জিত সমস্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য পুত্রদ্বয়কে সেবাইত করিয়াছেন। যে কোনরূপ মাংস, ডিম্ব ভক্ষণ করিবে বা মদ্য পান করিবে, সে সেবাইতের অনুপযুক্ত হইবে। রাম ছোট বেলা হইতেই মাংস, ডিম, পিঁয়াজাদি খায় না; ধূমপান করে না বা তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবরা উহা করিলে পছন্দও করে না। রামের স্বভাব কতকটা

রক্ষণশীল। মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখান ও বেশী বয়সে বিবাহ দেওয়া পছন্দ করে না। তার চোখে সুন্দরী মেয়ে পাওয়া কঠিন। যে কোন মেয়েকে মুহূর্তের জন্য দেখিলেই তাহার কোন্ অঙ্গের কি দোষ বা খুঁৎ তাহা ধরিয়া ফেলে ও বিশ্লেষণ করিতে ভালবাসে; অর্থাৎ মেয়েদের দোষত্রুটি দেখায় খুব পটু। রামের বাপমার স্বভাবের মধ্যে উভয়েই ক্রোধী; স্বর সপ্তমে তুলিয়া কথা বলেন। রামের মা খুব ঝগড়াটে স্বভাবের এবং রাগিলে অশ্লীলভাষায় কথা বলিতে কসুর করেন না। রামও মায়ের মেয়েলি ধাঁজের কথাগুলি আয়ত্ত করিয়াছে। রামের পিতা স্ত্রী ব্যতীত যৌবনে আরও বহু নারী-সহবাস করিয়াছেন। তাঁহারা পুরোহিত ও গুরুগিরি ব্যবসা করেন—জমিদারি, জোতদারিও আছে।

রাম বাল্যকালে প্রথমে মেয়েদের সহিত খেলা করিত, বেড়াইত। রামের পিতা এক মেয়ে স্কুলে মাস্টারি করিত, তজ্জন্য রাম বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথমে অধ্যয়ন করে। বাল্যকালে মেয়েদের মত কাপড় পরিতে ভালবাসিত। পুরুষ সাথীরা খেপাইত, সে কাঁদিয়া ফেলিত। পুরুষ সাথীর সহিত কোন খেলায় যোগ দিলে হারিয়া যাইত। মেয়েদের সহিত মিশিয়া খুব সরফরাজি করিত। রাম যাত্রা-থিয়েটার কোনদিন করে নাই।

৩। রাম এতাবৎকাল শ্যাম ব্যতীত আরও ২।১ জনের উপর বিযোনি-মৈথুন করিয়াছে বটে; তাহা কচিৎ ২।৪ দিনের জন্য। কিন্তু শ্যাম ব্যতীত অন্যের দ্বারা সমমেহন করায় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। যদি করাইয়া থাকে ত সে এক-আধ দিনের জন্য। শ্যামের নিকট কোন প্রেমপত্র রাম কোনদিন লিখে নাই। স্ত্রীর নিকটও কোন পত্র লেখে নাই, কারণ স্ত্রী লেখাপড়া জানে না বলিলেই হয়। কোন রকমে ছাপার বই পড়িতে ও এক-আধটু লিখিতে পারিলেও চিঠি লিখিতে ও পড়িতে তাহার রীতিমত সময় লাগে।

রাম বিবাহের পূর্বে কোন নারী-সহবাস করে নাই। করার ইচ্ছাও ছিল না ও এখনো নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। রাম ম্যাট্রিক ২য় বিভাগে পাশ করিয়া পরে সংস্কৃতের আদ্য মধ্য পড়িয়াছিল। এক্ষণে বহু বৎসর হইতে পুরোহিত ব্যবসায় ও জোতজমির খাজানা-ফসলাদি আদায় করিয়া

থাকে। বন্ধুবান্ধবকে সে জিনিষপত্র দিতেই ভালবাসে, লইতে চাহে না—সঙ্কোচবোধ করে। কিন্তু তাঁহার গোঁয়ার্তুমির জন্য বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকে অসন্তুষ্ট হয়। সে মনে করে, সে যাহা বুঝে, তাহা চূড়ান্ত, এবং অতি সহজেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বসে। শ্যামের সহিত রামের প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়; হয়ত ইহার জন্য উভয়ের মধ্যে কথা বন্ধ হইল। শ্যামের এজন্য বিশেষ কিছু ক্ষোভ হয় না। কিন্তু রাম শ্যামের সহিত উঠাবসা, কথাবার্তা, চুম্বন-আলিঙ্গনাদি না করিতে পারিলে অধীর হইয়া উঠে এবং শেষ পর্যন্ত রামই কথা বলিতে আরম্ভ করে।

রাম মাতৃহারা নহে, মা জীবিতা। বাপও জীবিত। রামের বাপ ২য় বার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহারই সন্তান রাম।

৪। রামের স্ত্রী স্বামীর দ্বারা যে কোনদিন পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে—তাহা মনে হয় না। বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে এইটুকু জানা গিয়াছে যে, রামের স্ত্রীর চরমানন্দ (orgasm) কোনদিনই উদিত হয় নাই। রামের উত্তেজনা হইলে স্ত্রীতে উপগত হয় বটে, কিন্তু স্খলনও হয় যেমন শীঘ্র, তাহাতে আন্তরিকতাও থাকে তেমনি অল্প। সঙ্গমের পূর্বে যোনি-প্রদেশে হস্ত-দ্বারা মর্দন বা সোহাগ-চুম্বনাদি সে কোনদিনই করে না।

শ্যাম ম্যাট্রিক পাশ, চাকুরি করে। জ্ঞানে রামের চেয়ে একটু বেশী অগ্রসর। তাহার আর্থিক অবস্থা ভাল নহে, মধ্যবিত্ত। রামের চেয়ে শ্যামের বর্ণ একটু নিরেস। গ্রামের মধ্যে সকলেই শ্যামের সরল ও নম্রনীয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট। সে খুব সেবাপরায়ণও বটে। রামের স্বভাব কর্কশ, শ্যামের স্বভাব কোমল। রামের সাক্ষাতে শ্যাম রামের স্ত্রীকে ঠাট্টাচ্ছলে সোহাগ-আদরের কথা বলিলে বা জড়াইয়া ধরিলেও রাম অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করে না। শুধু সঙ্গম ব্যতীত ভালবাসার সর্বপ্রকার বাহ্যিক ভাব প্রকাশ করিলে আপত্তি নাই, এইরূপ সে বলে। রামের সংস্কার এই যে, সঙ্গমই চরিত্রহীনতার একমাত্র লক্ষণ।

রাম শ্যামের স্ত্রীকে কখনও উপভোগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই বা তাহার প্রতি আকৃষ্টির ভাব দেখায় নাই, যদিও উভয়ে শিশু-কালে খেলাধূলা করিয়াছে, একই স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছে। বড় হইয়া বিবাহিত হইলে, পরস্পরের মধ্যে সংযত ঠাট্টা-তামাসা চলিয়া

থাকে মাত্র। কারণ একই গ্রামে উভয়ের বাড়ী, অর্থাৎ শ্যামের স্ত্রীর পিতার ও স্বামীর বাড়ী এবং রামের বাড়ী একই গ্রামে। রাম যদি জানে যে, শ্যাম তাহার স্ত্রীকে উপভোগ করিতেছে, তাহা হইলে রামের ক্ষোভের কারণ একটু থাকিবে; কিন্তু সেজন্য শ্যামকে একেবারে ছাড়িবে না। সে আরও বলে যে, স্ত্রীকে সে ভালবাসিতে পারে না, ভাল লাগে না।

৬। শ্যামের স্ত্রী শ্যামকে মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসে। শ্যাম একদিন রামকে কথাচ্ছলে বলিয়াছিল যে, সে তাহার (শ্যামের) স্ত্রীকে উপভোগ করিতে পারে; ইহাতে রাম অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। রাম প্রায় প্রত্যহই শ্যামকে ডাকিয়া বা জোর করিয়া নিজের বাটীতে টানিয়া লইয়া যায় এবং নিভৃত কক্ষে ভালবাসার গল্প, চুম্বন, লিঙ্গ-মর্দন প্রভৃতিতে রত থাকা পছন্দ করে। এই সঙ্গে রামের স্ত্রী মধ্যে মধ্যে যোগ দিলে ভালই হয় এবং দিয়াও থাকে। রাম এখনও শ্যামকে দিয়া মাসে অন্ততঃ ২।৩ বার যৌনসংযোগ করায় —অবশ্য শ্যামের ঘোরতর অনিচ্ছা সত্ত্বেও। শ্যাম খুব জোর আপত্তি না করিলে মাসে ১০।১২ দিনও চলিতে পারে। শ্যাম পুনঃপুনঃ আপত্তি করিতে থাকিলেও রাম জোর করিয়া শ্যামের সাধনযন্ত্রকে মর্দন-দ্বারা উত্থাপিত করিয়া, স্বয়ং যথাস্থানে প্রবিষ্ট করাইয়া, বিযোনি-মৈথুনে সক্রিয়ভাবে প্ররোচিত করে।

৭। রাম ও শ্যামের স্ত্রী কেহই জানে না যে, রাম ও শ্যাম পরস্পর সমমেহনে আসক্ত। * * রাম যাহাতে শ্যামকে দিয়া এইভাবে অস্বাভাবিক মৈথুন না করায়, তাহার কোন উপায় আছে কি? রাম ও রামের স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা জন্মানোর কি কোন পথ নাই? * * *

প্রথম প্রশ্নের উত্তর,—আছে, কিন্তু তাহা অতিশয় কষ্টসাধ্য। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর,—কোন পথই নাই। সত্যকার কায়িক সমমেহী দুশ্চিকিৎস্য।

দেখুন, এখানেও এক বিষময় প্রেমের ত্রিকোণক্ষেত্র রচিত হইয়াছে!

২০।৬।৪১

নৃপেন্দ্র

পাপিয়া পাবলিশার্স